নদীর পারে খেলা | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

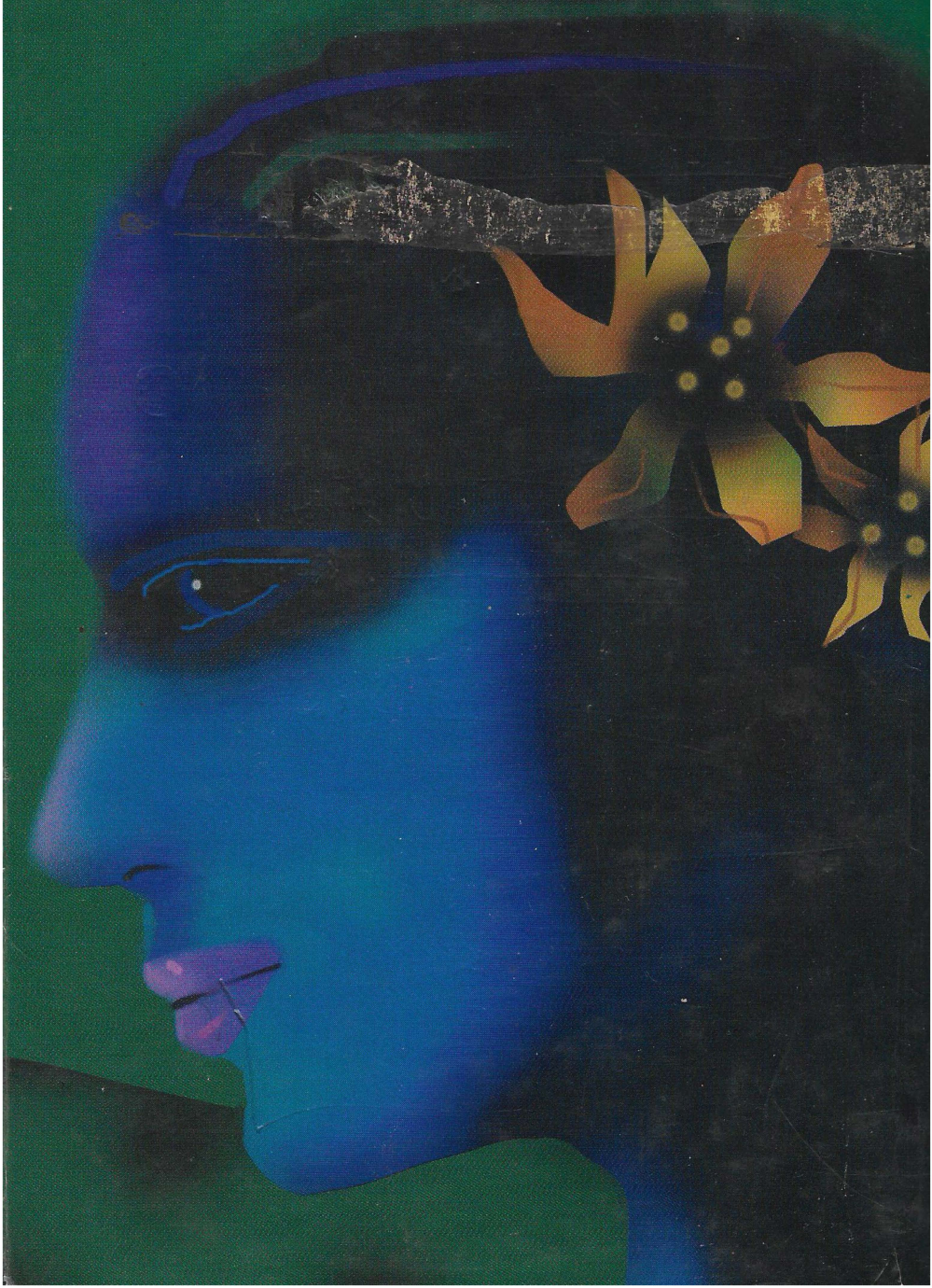

নদীর পারে খেলা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিকাশ গ্রন্থ ভবন
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

Nadir Pare Khela
by
Sunil Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০০১

প্রকাশ করেছেন :
ভারতী আচার্য ও ব্রতী আচার্য
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

বর্ণযোজনা ঃ
রেজ ডট কম
৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ছেপেছেন :
স্বপন কুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ সুনীল শীল

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র

কণিকা ও মনোতোষ গোস্বামীকে

N

বাদলের ঠিক কোনো কাজ ছিল না তখন। খানিকটা উদ্দেশ্যহীন ভাবেই সে দাঁড়িয়েছিল বিডন স্ট্রিটের মোড়ে। একটু খালি ট্রাম-বাস পেলে উঠে পড়বে, কিন্তু তার কোনো তাড়া নেই। একটু আগেও রোদ্দুরে ঝকঝক করছিল, হঠাৎ ঝুপ করে নেমে এসেছে সন্ধ্যা, বাতাস বেশ ভারি, রাস্তা-ঘাট অল্প অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু আকাশ এখনও স্পষ্ট দেখা যায়।

বাদলের দৃষ্টিশক্তি বেশ ভালো, ঘাড় ঘুরিয়ে সে এদিক-ওদিক দেখছিল অন্য মনস্কভাবে। পেট্রোল পাম্পের বিজ্ঞাপনের আলো হঠাৎ জ্বলে উঠলো, কোণের সাদা রঙের বাড়িটার তিন তলার জানলায় একটি শিশু এসে দাঁড়ালো, পার্কের রেলিংয়ে একদল যুবক হঠাৎ হল্লা করে উঠলো কি কারণে যেন, একটা অলস ষাঁড়ের একেবারে সামনে এসে কর্কশ শব্দে ব্রেক কষলো ডবল্ ডেকার বাস—বাদল এই সব কিছুই দেখছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়তেই তার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে গেল। তার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগলো, হাতের পাতা ঘেমে উঠলো, খানিকটা অভিমান মেশানো রাগ ছড়িয়ে পড়লো তার শিরায় শিরায়। বাদল মেয়েটির দিকে এক পলক তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল। পরক্ষণেই আবার তাকালো। আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার তাকালো। খুবই অস্ফুট ভাবে, বাদল শুধু নিজেকে শুনিয়েই ফিসফিস করে বললো, মল্লিকা!

মেয়েটি একটু দূরে, একই ফুটপাথে, ট্রাম আর বাস স্টপের মধ্যে যতখানি দুরত্ব থাকে—ততটা দূরে দাঁড়িয়ে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিল। মেয়েটির বয়েস একুশ কি বাইশ, সাধারণ মেয়েদের চেয়ে একটু বেশী লম্বা, হাল্কা গোলাপী রঙের শাড়ি পরে আছে, তার ফর্সা মুখ ও ঘন গোছকরা কালো চুলের সঙ্গে শাড়ির রংটা মানিয়েছে সুন্দর, তার ঠোঁটে হাসি ও স্বাস্থ্যের দীপ্তি । মেয়েটির হাতে একটা গানের খাতা, বাদলের দিকে সামান্য পাশ ফিরে মেয়েটি মগ্ন ভাবে সেই প্রৌঢ়টির সঙ্গে কথা বলছে, প্রৌঢ়টির মুখভর্তি পান, পোশাকে একটা সস্তা বড়লোকের চিহ্ন।

বাদলের শুধু দৃষ্টি বিভ্রমই হলো না, তার সময়ের জ্ঞানও চলে গেল। তার এখন একত্রিশ বছর বয়েস, সে উনিশ শো আটষট্টি সালের এক সন্ধ্যেবেলা বিডন স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ সব ভুলে গিয়ে সে যে পাঁচ বছর আগে ঠিক এখানে

মল্লিকার গানের স্কুলে যাবার পথে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতো—সেইসব দিনে ফিরে গেল। তার মনেও পড়লো না যে পাঁচ ছ বছর পর, ঠিক সেই একই জায়গায় সেই একই মেয়েকে একই চেহারায় দেখতে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। তবু বাদল সেই তখনকার এক পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবকের মতো উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে উঠলো।

বাদল একবার ভাবলো, মল্লিকার সঙ্গে চোখাচোখি হবার আগেই তার চলে যাওয়া উচিত। মল্লিকা যদি ভালো বাদল তারই সঙ্গে দেখা করার জন্য লোভীর মতন এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে? বাদলের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। তার বয়ে গেছে মল্লিকার জন্য অপেক্ষা করতে! মানিকতলার কাছে এক বন্ধুর বাড়িতে সে একটু কাজে এসেছিল, ট্রাম-বাস ফাঁকা থাকলে সে অনেক আগেই এখান থেকে চলে যেত।

গত তিন চার মাসে মল্লিকার কথা তার একবারও মনে পড়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু মল্লিকাকে দেখে সে ভয় পেয়ে চলেই বা যাবে কেন? তার আর মল্লিকার জীবনের পথ দু'দিকে চলে গেছে, কিন্তু তা বলে কি আর জীবনে কোনোদিনই তারা এক রাস্তায় অচেনা মানুষের মতন দাঁড়াতে পারবে না? কলকাতার রাস্তায় কে কখন কার মুখোমুখি পড়ে যাবে, কে বলতে পারে? মল্লিকা ঐ বাজে চেহারার লোকটার সঙ্গে কি এত গল্প করছে?

বাদলের মনে পড়লো, পাঁচ বছর আগে ঠিক এই রকমই এই সন্ধ্যেবেলা মল্লিকার প্রতীক্ষায় সে এখানে দাঁড়িয়েছিল। শনিবার মল্লিকার গানের ক্লাস শেষ হতো সাড়ে ছ'টায়, তারও পনেরো মিনিট আগে থেকে বাদল দাঁড়িয়েছিল। এক একটা মিনিট এক-এক দণ্ডের মতন দীর্ঘ, বাদলের খুব অস্বস্তি লাগছিল। তার মনে হচ্ছিল—রাস্তার সব লোক বুঝি তার দিকে চেয়ে হাসছে। সে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে আর ব্যাকুলভাবে বিডন স্ট্রিটের দিকে তাকাচ্ছে—এতেই সব লোক বুঝে ফেলেছে তার মতলব। কিন্তু তার যে কোনো উপায় ছিল না ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে—অথচ যতবারই তাকায়, মনে হয় যেন ঘড়ির কাঁটা এক জায়গাতেই থেমে আছে। তার দৃঢ় ধারণা মানুষকে কষ্ট দেবার জন্যই মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা অলস ভাবে হেলে দুলে চলে।

মল্লিকা এসেছিল ঠিক সাতটার সময়—সঙ্গে আরও দু'তিনটি মেয়ে ও একজন পুরুষ। ঐ লোকটাই বোধ হয় গানের মাস্টার। বাদল যেখানে দাঁড়িয়েছিল—ভ্রূক্ষেপও করেনি মল্লিকা, বাস স্টপে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা আর সঙ্গিনীদের সঙ্গে অন্তহীন গল্প চালিয়ে যাচ্ছিল। গল্প ফুরোয়ই না। চলেছে তো চলেছেই। চঞ্চল হয়ে,

পা বদলাবদলি করে দাঁড়িয়ে, শেষটায় বাদল রেগে উঠছিল। মল্লিকা জানতো, বাদল আসবে—অথচ, একবারও সে বাদলকে খুঁজে দেখেনি, সে এসেছে কিনা জানতে চায়নি, সঙ্গিনীদের সঙ্গেই গল্পে মত্ত। ঠিক আছে, ওদের সঙ্গে গল্প করতেই যদি মল্লিকার শুধু ভালো লাগে, তবে তাই করুক, বাদল বাধা দেবে না!

যে মুহূর্তে অভিমান করে বাদল চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মল্লিকা পিছন ফিরে ওকে ডেকে বলেছিল, এ-ই কোথায় যাচ্ছেন? দাঁড়ান? বাব্বাঃ একটুতেই রাগ! অর্থাৎ মল্লিকা প্রথম থেকেই তাকে লক্ষ্য করেছিল! মেয়েরা যে কখন কি দেখে কিছুই বোঝা যায় না!

আজ সব কিছুই বদলে গেছে, আর মল্লিকার জন্য প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে নেই, আজ সে তার সঙ্গে দেখা করতেও চায় না। কিন্তু সেদিনকার মতন আজও কি মল্লিকা তাকে দেখেছে? মেয়েদের মাথার পিছন দিককার অদৃশ্য চোখ দিয়ে আগাগোড়াই লক্ষ্য করছে? না, মল্লিকা সম্পর্কে বাদলের আজ আর কোনো দুর্বলতা নেই। তবু, মল্লিকা আজও তাকে দেখেছে কিনা শুধু এইটুকু না জানতে পারলে যেন তার জীবনটাই মূল্যহীন হয়ে যাবে—বাদল সেই রকম উদগ্রীব হয়ে উঠলো।

গানের খাতা হাতে মেয়েটি তখনও সেই প্রৌঢ়ের সঙ্গে গল্প করছিল, একই রকম ভাবে বাদলের দিকে পাশ ফিরে। বাদল আর একটা সিগারেট ধরালো। এখান থেকে সে ওদের একটি কথাও শুনতে পাচ্ছে না, কথার মাঝে মাঝে মল্লিকা হেসে উঠছে—তা বোঝা যায় তার ঠোঁটের ভঙ্গি ও চোখ দেখে, কিন্তু সে হাসির শব্দও ট্রাম-বাসের গোলমাল ভেদ করে এতদূর পৌঁছুচ্ছে না। শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে মল্লিকা কপালের টিপও পরেছে গোলাপী রঙের! একটু বাদে সেই প্রৌঢ় লোকটি হাত তুলে একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সি থামালো, দরজা খুলে অনুরোধ করলো মেয়েটিকে উঠতে। বাদলের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। মল্লিকার সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই ঠিকই, কিন্তু ঐ রকম একটা বাজে চেহারার লোকের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা সে একা একা ট্যাক্সিতে বেড়াব—এটা সে সহ্য করতে পারলো না! কিন্তু সে কি করবে? সে যদি বাধা দিতে যায়, মল্লিকা হয়তো রূঢ়ভাবে বাদলকেই অপমান করে বসবে।

বাদল খর চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। মেয়েটি ট্যাক্সিতে উঠলো না, তার ব্যবহারে অবশ্য ভয় পাবারও কোনো চিহ্ন নেই, প্রচুর হেসে হেসে সে প্রৌঢ়টিকে কি যেন বোঝাতে লাগলো, প্রৌঢ়টি অগত্যা একাই ট্যাক্সিতে উঠলো, জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির হাতে কি যেন একটা কাগজ দিল—পুলিশের হাত উঠতেই ট্যাক্সি চলে গেল।

বাস স্টপে মল্লিকা এখন একা, বাদল অনায়াসেই এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা

বলতে পারে। না, বাদল তা পারে না। আগেকার সে দিন আর নেই। বাদল কথা বলতে চায়ও না। কিন্তু মল্লিকা একবারও তার দিকে চোখাচোখি হলে মল্লিকা নিজে থেকে কোনো কথা বলে কিনা সেটা জানার জন্যে সে কৌতূহলে ছটফট করছিল। মল্লিকা কথা বলতে এলে হয়তো বাদল নিজেই তার সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করতো, দু-একটা কাটা-কাটা উত্তর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেত।

মেয়েটি একবারও এদিকে তাকাল না, একটা ট্রাম আসতে সেদিকে এগিয়ে গেল। রীতিমত নিরাশ হয়ে উঠল বাদল। কিছুই ঘটল না; একেবারে কথা না বলার বদলে মল্লিকা যদি তাকে দু-একটা অপমানজনক কথাও বলতো, তা হলেও সে বোধ হয় দুঃখিত হতো না। ট্রামের দরজার কাছে এত বেশী ভিড় যে মেয়েটি চেষ্টা করেও উঠতে পারলো না, আবার ফিরে আসতেই বাদলের দিকে সোজা তার চোখ পড়লো। মেয়েটির দৃষ্টি এক পলক স্থির হয়ে রইলো, সামান্য হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে, তার মুখে চোখে যেন সামান্য দ্বিধা, তবু দ্বিধা কাটিয়ে ফেলে সে ডাকলো, বাদলদা।

সেই মুহূর্তে বাদল নিজের ভুল বুঝতে পারলো। সে বুঝতে পারলো, সত্যিই মাঝখানে পাঁচ-ছ বছর কেটে গেছে, তার বয়েস এখন পঁচিশ-ছাব্বিশ নয়—এখন তার বয়স একতিরিশ। বহুদিন সে আর বাস স্টপে কোনো মেয়ের জন্য প্রতীক্ষা করে না। পাঁচ বছর পরে একই রাস্তায়, ঠিক সেই একই রকম চেহারায় বিশেষ একজনকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

মেয়েটি মল্লিকা নয়, তার ছোট বোন বল্লরী। পাঁচ বছর আগে মল্লিকার বয়েস ছিল একুশ-বাইশ, তখন ঠিক এই রকমই চেহারার ছিল তার। মল্লিকা নিশ্চয়ই এখন অনেক বদলে গেছে, যেমন বাদল নিজেও বদলেছে অনেক। বল্লরী তখন ছিল প্রায় কিশোরী—আজ সে মল্লিকার মতন একই গানের স্কুলে গান শিখতে যায়। বাদল চকিতে চারপাশে দেখে নিল—আগেকার দিনের বাদলের মতন, বল্লরীর এখনকার কোনো প্রেমিক আশেপাশে দাঁড়িয়ে নেই তো!

বল্লবী বাদলের দিকে এগিয়ে এসে সহজ গলায় বললে, বাদলদা, আপনি? বাব্বা, কদ্দিন বাদে! এতদিন কোথায় ছিলেন?

বাদলের সহজ হয়ে উঠতে একটু দেরি লাগলো। মিটমিটে গলায় বললো, এখানে কোথায় এসেছিলে। তোমাকে প্রথমে আমি ঠিক চিনতেই পারিনি।

বল্লরী একটু হেসে বললো, চিনতে না চাইলে চিনবেন কেন? আমি এখানে গান শিখি—বুধবার আর শনিবার—আপনি এতদিন কোথায় পালিয়ে ছিলেন! আর আসবেন না আমাদের বাড়ি—

বাদল ভাবলো, মেয়ের কি সব সময়ই অভিনয় করে? বল্লরী তো তখন নেহাত ছোট ছিল না, পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা তার ভুলে যাওয়ার কথা নয়। বল্লরী সবই জানে, কেন বাদল আর কোনোদিনই ওদের বাড়িতে যাবে না—তবু কি রকম সহজ ভাবে অনুযোগ জানাচ্ছে। পাঁচ-ছ বছর আগে বল্লরী তখন সদ্য কিশোরী থেকে যুবতী হচ্ছে, কি শিশুর মতন সরল আর পবিত্র ছিল তার মুখের ভাব। এখন বল্লরী পূর্ণ যুবতী, আগের চেয়ে সে আরও সুন্দরী হয়েছে, নাকেরর তীক্ষ্ণতা দেখে তাকে একটু অহংকারী মনে হলেও মুখ চোখে এখনও সারল্য মাখানো আছে—কিন্তু বল্লরী এখন অভিনয় শিখেছে। সব জেনেও সে অনায়াসে বলতে পারে, এতদিন কোথায় পালিয়ে ছিলেন? আর আসেন না কেন আমাদের বাড়িতে—। বাদলের ইচ্ছে হলো বলে, বল্লরী, তোমার সঙ্গে তোমার দিদি মল্লিকার চেহারার আশ্চর্য মিল আছে—আমি আগে লক্ষ্য করিনি! কিন্তু বাদল বললো না। সে ঠিক করলো, বল্লরী নিজে থেকে না বললে সে মল্লিকার নাম উচ্চারণও করবে না।

বল্লরীও দিদির প্রসঙ্গ তুললো না। হাল্কা কৌতুকের সুরে বললো, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলেন? কারুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন বুঝি?

বাদল অন্যমনস্ক ভাবে বললো, কার জন্য?

একটু দুষ্টুমির সুরে বল্লরী বললো, তা আমি কি জানি!

বাদল এবার খানিকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করলো। সেও এককটু হেসে বললো, হ্যাঁ অপেক্ষা করছিলুম, তোমার জন্য! হঠাৎ দেখলুম, তুমি একটা বিচ্ছিরি চেহারার লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছো, তাই আমি—

—ইস্, আমার জন্য না আরও কিছু! আমি যার সঙ্গে কথা বলছিলুম তার মোটেই বিচ্ছিরি চেহারা নয়!

—বল্লরী, তুমি এখন কি পড়ছো?

—পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়ছি, সিক্সথ্ ইয়ার!

—এম. এ. পড়ছো? ওরে-ব্ বাবা, এত বড় হয়ে গেছো এর মধ্যে?

—আমি কি ইচ্ছে করে বড় হচ্ছি নাকি! আমাকে জোর করে বড় করা হচ্ছে!

—কের জোর করছে?

—সময়!

দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে হাসলো। বাদল বললো, খুব স্মার্ট কথা বলতে শিখেছো তো! চলো, কথাও বসি একটু। চ খাবে নাকি?

—না।

—খাবে না? সময় নেই?

—তা নয়, চা খাবো না। শরবত খাওয়ালে খেতে পারি—তার আগে যদি চিংড়ির কাটলেট খাওয়ান।

এ সেই আগেকার বল্লরীর মতন কথা। যখন তখন এসে বাদলের গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে ফিসফিস করে বলতো, বাদলদা, বন্ধুরা আপনার নামে কি বলে জানেন তো?

বাদল সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করতো, কি!

চোখ সরু করে গোপন কথা বলার মতন সুরে বল্লরী জানাতো, যা তা বলে আপনার নামে।

—কি বলে?

—শান্তাদি, মায়াদিরা বলে, বাদলবাবুটা ভারী কিপ্টে। শুধু মল্লিকাকেই সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়। একদিন তো বল্লরীকেও সঙ্গে নিলে পারে! বল্লরীকে কিছুই খাওয়ায়ও না।

এ কথা বলেই হো-হো করে হেসে উঠতো বল্লরী। সেই বল্লরী। আজ আর শব্দ করে হেসে উঠলো না। কিন্তু সেই রকমই দুষ্টুমীর ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে। অথচ বল্লরী সবই জানে। সে নিশ্চয়ই এটুকুও বুঝেছে যে, চা খাওয়ার কথাটা তুলতেই বাদল দ্বিধা করছিল।

একটা রেস্তোরায় ঢুকে ক্যাবিনে বসবে না বাইরে এই নিয়ে ইতস্তত করছিল বাদল। বল্লরী নিজেই গিয়ে ঢুকলো একটা ক্যাবিনে, বসলো বাদলের মুখোমুখি। বাদল এবার সোজাসুজি তাকালো বল্লরীর দিকে। সত্যিই মল্লিকার সঙ্গে তার চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে, বাদল আগে কখনো তেমন খেয়ালই করেনি। অবশ্য দুজনের চেহারায় অমিল আছে কিছু কিছু, একটু ভালো করে দেখলেই বোঝা যায়, বল্লরীর নাকটা একটু বেশী তীক্ষ্ণ, চিবুকও কিছুটা অন্যরকম। দুজনকে যে ভালো ভাবে চেনে— সে কখনো ভুল করবে না—কিন্তু গানের খাতা হাতে মল্লিকার পাঁচ বছর আগেকার চেহারাই বাদল ভাবছিল বলে ভুল করেছে। বল্লরীর কথা তার একবারও মনে আসেনি।

বাদল জিজ্ঞেস করলো, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে? অতক্ষণ ধরে—

—কতক্ষণ? আপনি বুঝি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন? উনি তো গৌতম রায়।

—কে গৌতম রায়?

—আপনি নাম শোনেননি? উনি তো বিখ্যাত—

—গৌতমবুদ্ধ ছাড়া আর ঐ নামের কোনো বিখ্যাত লোকের কথা আমি শুনিনি।

উনি কি জন্য বিখ্যাত?

—তার মানে আপনি আর গান-বাজনার কোনো খবর রাখেন না। আপনি 'অকাল বৃষ্টি' বলে যে বইটা হচ্ছে, সেটা দেখেছেন?

—না দেখিনি।

—দেখেননি? খুব ভালো হয়েছে।

আজকাল আর সিনেমা দেখা হয় না, সে যাক্ গে। ঐ সিনেমাটায় কি আছে?

—ঐ বইতে গৌতম রায়ের তিনটে গান প্লে-ব্যাক আছে। তার মধ্যে একটা বাউল গান যা আছে না, দারুণ! আমার খুব ভালো লাগে ওঁর গান—উনি আগামী দুটো বইতে মিউজিক ডাইরেক্টর হচ্ছেন!

—উনি তোমাকে ট্যাক্সি করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বল্লরী একটু মুচকি হেসে চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, উনি আমাকে সিনেমায় চান্স দিতে পারেন।

—তুমি সিনেমায় পার্ট করবে?

—উনি অবশ্য আমাকে একটা কোরাস গানে নেবার কথা বলছিলেন, কিন্তু আমার ইচ্ছে পার্টই করা। একবার ওখানে সবাইকার সঙ্গে চেনাশুনো হয়ে গেলে তারপর—

—তুমি সিনেমায় নামবে? তোমার বাবা—

—বাবা মারা গেছেন গত বছর জানুয়ারিতে।

বাদল চুপ করে গেল। রাসবিহারীবাবুর মৃত্যু সংবাদ সে একেবারেই শোনেনি। গত বছর জানুয়ারিতে সে দিল্লী গিয়েছিল, সেইখানেই ছিল দু'মাস। রাসবিহারীবাবু মারা যাওয়ার পর বল্লরীদের বাড়িতে নিশ্চয়ই অনেক ওলোটপালোট হয়েছে, সে সব কথা জানার জন্য হঠাৎ খুব কৌতুহল বোধ করলো বাদল, কিন্তু প্রশ্ন করতে পারলো না। বল্লরী নিজে থেকে না বললে, সে ওসব কিছুই জিজ্ঞেস করবে না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বাদল ছুরি-কাঁটা দিয়ে কাটলেট টুকরো টুকরো করতে লাগলো।

অপ্রত্যাশিত ভাবে বল্লরী জিজ্ঞেস করলো, বাদলদা, আপনি বিয়ে করেছেন? বাদল মুখ তুলে বললো, না—

—কেন?

—এমনিই!

—আপনি ও রকম গম্ভীর গম্ভীর হয়ে কথা বলছেন কেন? বলুন না বিয়ে করেননি কেন?

বললুম তো, এমনিই। আমাদের অফিস থেকে হয়তো আমাকে একবার বিলেত

পাঠাবে—সেই রকম শুনছিলে তা যদি হয়, তা হলে এখন আর—

—ও, আপনি বিলেত ফেরত পাত্র হতে চান। দাম বেড়ে যাবে তখন আপনার। দেখবেন যেন, বিলেত থেকে আবার মেম-টেম বিয়ে করে ফেলবেন না!

—যদি আনিই, তাতে তোমার আপত্তি কিসের?

—না, আমার আবার আপত্তি কি! কিন্তু মেমের সঙ্গে সব সময় ইংরিজিতে প্রেম করা—

বল্লরী ছেলেমানুষের মতো হেসো উঠলো। বাদল জিজ্ঞেস করলো, বল্লরী, তুমি প্রেম-ট্রেম করছো না?

বিনা দ্বিধায় বল্লরী উত্তর দিলে, হুঁ-উঁ।

—কার সঙ্গে?

—এক একদিন এক একজনের সঙ্গে।

—খুব ফাজিল হয়েছো তো তুমি!

—বাঃ, যা সত্যি কথা তাই বললুম!

আগেকার দিন হলে বাদল এখন বল্লরীর মাথায় একটা ছোট্ট গাঁট্টা মারতো, কিংবা বেণী ধরে হ্যাঁচকা টান দিতো। বল্লরীর কানও মুলে দিয়েছে কয়েক বার, কিন্তু বেণী ধরে টানলেই বল্লরী বেশী রেগে যেতো। কিন্তু এখন আর বাদল তা পারে না। এমন কি টেবিলের ওপর ছড়ানো আছে বল্লবীর একটা হাত, নরম সরু সরু আঙুল। নোখের মধ্যে গোলাপী রঙের আভা—কব্জিতে একটা সাদা ব্যাণ্ডের ছোট্ট ঘড়ি—আগেকার দিন হলে অবলীলাক্রমে সে বল্লরীর এই হাতটা নিজের মুঠোয় তুলে নিতে পারতো, অনায়াসে তার আঙুলগুলো মটকে দিতে পারতো বিনা দ্বিধায়।—কিন্তু বল্লরীর হাতের সঙ্গে নিজের হাত যাতে ছোঁয়া না লেগে যায়—তাই বাদল নিজের বাঁ হাতটা টেবিলের ওপর থেকে সরিয়ে নিচ্ছে বারবার। তক্ষুনি আর বলার মতন কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বাদল বললো, দেখি তোমার গানের খাতাটা—এখন কি গান শিখছো?

বল্লরী যেন বাদলের প্রত্যেকটি ভঙ্গি, মুখের রেখা ও শরীরের নড়াচড়া পর্যন্ত লক্ষ্য করছে—এই ভাবে তাকিয়ে আছে। বাদল ওর চোখের দিকে ঠিক চাইতে পারছে না—কি রকম যেন একটা অপরাধ বোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যুবতী হলেই কি মেয়েরা রাজরাজেশ্বরী হয়ে যায়? এই তো সেদিনও বল্লরী ছিল তার কাছে নেহাত ছেলেমানুষ, আর আজ সে বল্লরীর কাছে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না।

বল্লরীর গানের খাতার পাতা ওল্টাতে লাগলো। অধিকাংশই রবীন্দ্র সঙ্গীত—

'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কি এনেছিস বল—', কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে…', এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি…', মল্লিকার খাতাতেও এই সব গানই প্রায় ছিল। একই লোকের কাছে গান শেখে বল্লরী, এই পৃথিবীতে গত পাঁচ বছরে অনেক কিছুই বদলেছে, কিন্তু ঐ লোকটির গানের বদল হয়নি। বাদল ভেবেছিল একবার বল্লরীকে বলবে, তুমি কি রকম গান গাও? এখদিন তোমার গান শুনতে হবে তো। —কিন্তু বলতে গিয়েও বললো না। একথা বলার মানেই হলো—আমার সে বল্লরীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। কিন্তু বাদল সে কথা নিজে থেকে কিছুতেই বলবে না।

হাতে একগাছিও চুড়ি নেই বল্লরীর, বালা নেই, ফর্সা সুডৌল হাত দুখানি সম্পূর্ণ নিরাভরণ, এক হাতে শুধু ছোট একটা ঘড়ি, কানেও দুল পরেনি, নরম কানের লতি দুটো ফাঁকা থেকেও সুন্দর দেখাচ্ছে, গলায় শুধু একটা সরু সোনার হার, তার মাঝখানে বড় সাইজের একটা পান্না বসানো লকেট।

টেবিলের ওপর একটি ঝুঁকে আছে বল্লরী, পাতলা ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটি নিটোল স্তন, বাদলের মনে হলো এক জোড়া সাদা ফুটফুটে পায়রা যেন জাল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দুই স্তনের ঠিক মাঝখানে রয়েছে লকেটটা। সেদিকে দু-এক পলক তাকিয়ে কি যেন একটা ব্যথায় বাদলের শরীর শিরশির করতে লাগলো। বল্লরী এখন কত দূরে চলে গেছে, অনেক দূরে, পাঁচ বছর আগে সে নিজেই একটা সাঙ্ঘাতিক ভুল করে ওদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বাদল বুঝতে পারলো, হালকা ধরনের সাধারণ কথা যে-টুকু বলার কথা তা সবই বলা হয়ে গেছে, এখন সে আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না, এখন কথা বলতে হলে পাঁচ বছর আগেকার সেই ইতিহাসের সূত্র টেনে আনতে হয়। বল্লরীর সেই প্রতীক্ষাই করছে?

বাদল বললো, বল্লরী, তুমি দারুণ সুন্দরী হয়েছো কিন্তু!

বল্লবী খিলখিল করে হেসে বললো, এতক্ষণে বাদে?

—তার মানে?

—তার মানে; অনেকদিন পর দেখা হলে ও কথাটা প্রথমেই বলতে হয়।

—আমি প্রথম থেকেই বলবো বলবো ভাবছিলুম—

—শেষ পর্যন্ত সাহস করে বলে ফেলেছেন তো, ব্যস তবে আর কি!

—তুমি বুঝি এ কথাটা অনেকের কাছ থেকেই শোনো—

—রোজ—দু' বেলা! শুনতে শুনতে এখন আর কোনো নুতনত্ব পাই না! তবে, আমি অপেক্ষা করছিলুম কখন আপনি বলবেন। না বলেল বুঝতুম, আপনি আমাকে পাত্তাই দিচ্ছেন না!

—তোমাকে পাত্তা দেবো না, আমার সাধ্য কি এমন—

—ঠিক আছে, এবার উঠুন!

সবে মাত্র কথার ধারা অন্তরঙ্গতার দিকে যাচ্ছিল, বল্লরী আকস্মিক ভাবে সেটা ভেঙে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো, অনেক দেরি হয়ে গেছে, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। গৌতমবাবুর গানটা প্র্যাকটিস করতে হবে, কাল রিহার্সাল আছে—

বাস স্টপ পর্যন্ত প্রায় নিঃশব্দেই এলো এরা পাশাপাশি। বল্লরীর সঙ্গে এক বাসে উঠতে চায় না বাদল। বল্লরীকে আগে তুলে দেবার জন্য দাঁড়ালো। একটা বাস যখন প্রায় এসে গেছে, তখন বল্লরী বাদলের দিকে কৌতুকের সুরে বললো, এতক্ষণ ধরে যে-কথাটা জিজ্ঞেস করবেন ভাবছিলেন, সেটা জিজ্ঞেস করে ফেললেই পারতেন।

কি কথা?

—দিদির কথা!

—না, তোমার দিদি সম্পর্কে আমি মোটেই—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

টপ করে বল্লরী বাসে উঠে পড়লো এবং ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল—পিছন ফিরে তাকাবার সুযোগও পেল না। বাসটা যেই ছেড়ে গেল, তক্ষুনি বাদলের মনে হলো, এতক্ষণ যে ব্যাপারটা ঘটে গেল—সেটা যেন সম্পূর্ণই অবাস্তব। সত্যিই কি সে এতক্ষণ বল্লরীর সঙ্গে কথা বলছিল, রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি বসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছিল? এ রকম তো কথা ছিল না। মল্লিকা কিংবা বল্লরীর সঙ্গে আর কোনোদিনই তার দেখা হওয়ার কথা ছিল না। দৈবাৎ দেখা হলেও দু-একটা শুকনো ভদ্রতার কথা ছাড়া আর কিছুই না! কিন্তু জীবন কোনো নিয়ম মানে না। প্রতিটি মুহূর্তের ভাগ্য প্রতিটি মুহূর্তে ঠিক হয়।

॥ দুই ॥

মনোহর পুকুর বাদলদের পুরনো আমলের বাড়ি। ঘরে ঘরে এক কালে ঝাড় লণ্ঠন জ্বলতো, সিঁড়িতে এখনো আংটা লাগানো আছে—যাতে বোঝা যায় এক সময় কার্পেট পাতা থাকতো সিঁড়িতে। সেসব অবশ্য বাদল কখনো, দেখেনি, কিংবা খুব ছেলেবেলায় দেখলেও তার মনে নেই। ঠাকুমা বেঁচে থাকতে তাঁর মুখে গল্প শুনেছে। এখন অবশ্য বাড়ি ভাগ হয়ে গেছে, তিন কাকাদের সঙ্গে ভাগাভাগির ফলে বাদলরা পেয়েছে চারখানা মাত্র ঘর।

বাদলের বাবা মারা গেছেন অনেক দিন আগে, দাদা বৌদির সঙ্গে থাকে বাদল,

মা আছেন কাশীতে—বছরে একবার করে ঘুরে যান। দোতলায়—রাস্তার পাশে ঘরখানা বাদলের নিজস্ব, সেখান থেকে পাশের বস্তি দেখা যায়। ঠাকুমার মুখে শুনেছে, তাদের বাড়ির ঝি-চাকর-নাপিত-গয়লা-গাড়োয়ানদের থাকার জন্যই ঐ বস্তি তৈরি হয়েছিল। এখন ওদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই, ওরা বাদলদের গ্রাহ্যই করে না—দিনরাত ওখানে হৈ-হট্টগোল লেগেই আছে। প্রত্যেক রাত্তিরে জানলায় দাঁড়িয়ে বস্তির জীবন লক্ষ করা বাদলের বহুদিনের অভ্যেস। আজ আর বাদল তা করলো না, আজ বস্তির দিকের জানলাটা বন্ধ করে দিল। খাওয়ার পর একটা সিগারটে ধরিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

মল্লিকা কিংবা বল্লরীর কথা বাদল গত চার বছর ধরে প্রাণপণে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো ভুলে যাওয়া যায় না। যত ভুলতে চেয়েছে, তত বেশী মল্লিকার মুখ এসে উপস্থিত হয়েছে তার স্মৃতিতে, মল্লিকার জ্বলন্ত ক্রুদ্ধ মুখ। বাদল মনে মনে অনবরত সেই মুখের সামনে তর্ক করেছে, নিজের অসংখ্য না-বলা যুক্তি উদ্ধার করেছে। কখনো কখনো সে আর সামলাতে না পেরে ব্যাকুল ভাবে বলছে—মল্লিকা, আমাকে ক্ষমা করো, তুমি কি কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করতে পারো না?

এই রকম চলেছে প্রতি রাত্রে, স্মৃতির সঙ্গে যুদ্ধ। মল্লিকাকে ভোলার জন্য বাদল দিনের পর দিন নাইট শো-তে সিনেমা দেখেছে একা একা, ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেছে। তখন ওতে কোনোই কাজ হয়নি, মল্লিকার ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত মুখ তাকে নিষ্কৃতি দেয়নি। কিন্তু স্মৃতিরও নিজস্ব একটা হিসেব আছে। আসলে, শরীরে যাকে কাছে পায় না, স্মৃতি তাকে বেশীদিন ধরে রাখে না। ইদানীং কয়েক মাস মল্লিকার কথা বাদলের প্রায় মনেই পড়েনি। ক্বচিৎ কখনো মনে এসেছে কোনো অনুষঙ্গে, মাস কয়েক আগে দূর থেকে এক পলকের জন্য মল্লিকাকে দেখে দিনকতক ফের কষ্ট পেয়েছিল, কিন্তু সে যন্ত্রণাও অনেকখানি নিস্তেজ।

আজ আবার সেই সব কথা ফিরে এলো। সেই দেউলটি নামের একটা ছোট্ট গ্রাম, সেই রূপনারায়ণ নদী, নদীর পার দিয়ে ছুটে যাচ্ছে মল্লিকা, হাওয়ায় উড়ছে তার শাড়ির আঁচল, তার চুলগুলো লরেন্স গাছের পাতার মতন হাওয়ায় ভাসছে, হা-হা-করে হাসতে হাসতে তার পেছন পেছন ছুটছে বাদল, সাদা রঙের প্যান্ট আর সার্ট পরা উঁচু পারের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বল্লরী, সে চিৎকার করে ডাকছে দিদি-ই-ই-ই, দিদি-ই-ই, বাদলদা-আ—। স্পষ্ট কানে আসছে সেই স্বর। বল্লরী তখন স্কার্ট পরতো। সাহেবী স্কুলের ছাত্রী ছিল বল্লরী, স্পোর্টসে ফার্স্ট হতো, তবু নদীর উঁচু পাড় থেকে লাফ দিতে গিয়ে তার পা মচ্‌কে গেল—বাদল তখন মল্লিকাকে প্রায়

ছুঁয়ে ফেলেছে ছুটতে ছুটতে, এই সময় বল্লরীর চিৎকার আর কান্না শুনে সে ফিরে দাঁড়ালো, আরও তীব্র বেগে ছুটে এসে সে বল্লরীকে তুলতে গেল মাটি থেকে, মল্লিকা তখনও ছুটছে।

বর্ষার রূপনারায়ণ তখন অশান্ত উদ্দাম, ছলাৎ ছলাৎ করে উঠছে পড়ছে ঢেউ, ওপার প্রায় দেখাই যায় না। স্মৃতির এই ছবির মধ্যে মল্লিকা ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থেমে মুখ, ফেরালো, তার মুখ থেকে হাসি মুছে গেল—বাদল চেঁচিয়ে বললো, না, না, মল্লিকা এখন নদীতে নেমো না—এখানে পাড় ভাঙতে পারে যে-কোনো সময়! মল্লিকা হিংস্র ভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, আমি জানতাম, তুমি নীচ, তুমি অভদ্র, তোমার মনের মধ্যে নরক—বাদল অসহায় ভাবে বললো, না, না, না। মল্লিকার মুখটা বদলে হয়ে গেল আজকে দেখা বড় বয়েসী বল্লরীর মুখ, মল্লিকায় আর বল্লরী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসছে—দুজনের চেহারা অবিকল একরকম—

ঘুমোবার আগে বাদল ঠিক করে নিল, আজ বল্লরীর সঙ্গে দেখা হলেও—সে আর কখনো বল্লরী কিংবা মল্লিকার সঙ্গে দেখা করবে না। ও অধ্যায়টা শেষ হয়ে গেছে।

বন্ধুরা বলে, বাদলের তো সংসারের চিন্তা নেই, তাই সে যখন খুশী চাকরি ছাড়তে পারে। সত্যি অফিসের ব্যাপারে বাদল বেশ খুতখুঁতে। বাদল এ পর্যন্ত তিনবার চাকরি ছেড়েছে। বাদল এমনিতেই লাজুক ও শান্ত ধরনের মানুষ। সহজে রাগ করে না, কিন্তু একবার রেগে গেলে তার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। বাদল কখনো কারুর মনে আঘাত দিয়ে কিংবা অপমান করে কথা বলে না এবং অন্যদের কাছ থেকেও সে এইরকম ব্যবহারই আশা করে। বন্ধুরা অবশ্য এইজন্য বাদলকে বলে, ও হচ্ছে একটা ছিঁচকে বদমাইস, এমনিতে দেখতে ভিজে বেড়ালটি, কিন্তু যখন ফোঁস করে—।

অফিসে বাদল মন দিয়ে কাজ করে, ফাঁকি দিয়ে মাইনে নিতে তার সম্মানে বাধে। আসলে তাদের পরিবারে বাদলই প্রথম চাকরি করতে এসেছে—তার বাবা কাকারা পরের চাকরি করার কথা কখনো কল্পনাই করেননি। এক সময়ে ওদের জমজমাট চায়ের ব্যবসা ছিল, এখন তার অবস্থা খুবই পড়ন্ত, বাদলের দাদা এখনো সেটা আঁকড়ে আছেন। বাদলকে তিনি ডেকেছিলেন, কিন্তু ব্যবসার ঝঞ্ঝাটের চেয়ে নিরিবিলি চাকরিই তার পছন্দ। কিন্তু ওপরওয়ালাদের কেউ একবারও যদি তার সঙ্গে অন্যায্যভাবে রুক্ষ স্বরে কথা বলে, বাদল তক্ষুনি সে চাকরি ছেড়ে দেয়। চার্টার্ড অ্যাকাণ্টান্সি পাশ করে রেখেছিল বলে বাদলের চাকরি পেতে তেমন অসুবিধেও হয় না।

বাদলকে একজন সুখী মানুষ বলা যায়। সে প্রায় হাজারর দেড়েক টাকা মাইনে পায় এবং সত্যিই তার সংসারের চিন্তা নেই। তাকে বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না। প্রতি মাসে কাশীতে মায়ের জন্য দু'শো টাকা পাঠায় শুধু। দাদার সংসারে থাকে —দাদার ব্যবসার অবস্থা ভালো না হলেও নিজের আভিজাত্যবোধ থেকে তিনি ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে কোনো খরচ নেবেন না কিছুতেই। বাদল লুকিয়ে লুকিয়ে বৌদির হাতে কিছু টাকা দেয়। তবুও বাদলের অনেক টাকা থাকে। এই টাকা বাদল কিভাবে খরচ করবে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। বাদল মদ খায় না, বন্ধুদের সঙ্গে দু-একবার চেখে দেখেছে—কিন্তু ঐ কৃত্রিম উত্তেজনা তার পছন্দ হয়নি। তাছাড়া, বাদলের এক জ্যাঠামশাই প্রচণ্ড মদ খেতেন ও শরীরের ওপর অকথ্য অত্যাচার করতেন, মাত্র ৪১বছর বয়েসে এক রাত্রে তিনি সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে মারা যান—সেই থেকে ওদের পরিবারে মদ সম্পর্কে একটা ভীতি আছে। বাজারের স্ত্রীলোকদের নিয়ে ফুর্তি করতে বাদলের রুচিতে বাধে। বছরে একবার দু'বার বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়ে তার কিছু টাকা খরচ হয়, বাকি টাকা ব্যাঙ্কে জমে। অথচ ভবিষ্যৎ নিয়ে বাদলের কোনো পরিকল্পনা নেই।

সকালবেলা ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ঠিক সময় বাদল অফিসে আসে। কোনোদিনও সে ময়লা কিংবা ভাঁজ-ভাঙা পোশাক পরে না। সারাদিন নিবিষ্ট ভাবে কাজে করে। আর সন্ধ্যেবেলা—তার সামনে এক বিশাল শূন্যতা পড়ে থাকে। তখন তার কিছুই করার থাকে না। প্রত্যেকদিন সিনেমা দেখতে কারুর ভালো লাগে না। কোনো ক্লাবে টেলাবে গিয়ে নাটকের রিহার্সাল দিতেও ইচ্ছে হয় না বাদলের। অথচ কলকাতা শহরে এছাড়া সময় কাটাবার আর কোনো উপকরণও তো নেই। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেও ভালো লাগে না, বৌদি তাকে পেলেই সঙ্গে নিয়ে বাজারে বেরুতে চান—সেটা বাদলের তেমন পছন্দসই কাজ নয়। কাশী থেকে প্রত্যেক চিঠিতে মা বাদলকে বিয়ে করার জন্য মাথার দিব্যি দেন। কিন্তু কোনো কাজ নেই বলেই বিয়ে করতে হবে—এটা বাদল ভাবতেই পারে না। কিন্তু এক সময়, যখন তার জীবনে মল্লিকার অধ্যায় এসেছিল, সে সময় বাদল এক মিনিটও ফুরসত পেতো না, সময় কোথা দিয়ে উড়ে যেতো সময়ের অভাবে বাদলের কত কাজ বাকি পড়ে থাকতো। সে পর্বটা শেষ হয়ে গেছে। এখনও বাদল সাংসারিক অর্থে একজন সুখী মানুষ—কিন্তু ভবিষ্যৎজোড়া শূন্যতা। অনেকে প্রেম-ট্রেম করে সময় কাটায়। কিন্তু বাদলের বয়েস এখন একত্রিশ, এখন তার পক্ষে নতুন করে প্রেম শুরু করা সহজ নয়। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলেরাই কলকাতার সব মেয়েদের যেন দখল করে আছে। বাদলের একটু লাজুক স্বভাব—এখানে সেখানে মেয়েদের সঙ্গে তার মাঝে পরিচয় হয়—

কিন্তু বাদল বেশী দূর এগোতে পারে না; কিংবা মেয়েরা বোধহয় বাদলের ঠাণ্ডা ব্যবহার দেখে ধরেই নেয়, একতিরিশ বছর বয়েস হয়েছে যখন, তখন নিশ্চয়ই বাদলের মন কারুর কাছে ইতিমধ্যেই বাঁধা পড়েছে। কিন্তু বাদল আর কোনো দিনই মল্লিকার কাছে ফিরে যাবে না। তা বলে বাদল বিরাগী সন্ন্যাসীও হতে চায় না। আবার কোনো মেয়ে যদি নিজে থেকে তার জীবনে আসে, বাদল নিশ্চয়ই তাকে গ্রহণ করবে, বাদল সেই প্রতীক্ষায় আছে।

এখন বাদল একটা ব্রিটিশ টাইপরাইটার কোম্পানিতে চাকরি করছে। এ অফিসটাও তার তেমন পছন্দ নয়। বাদল ছাড়বে ছাড়বে করছিল, কিন্তু এই সময়েই কানাঘুষো উঠলো—তাকে শিগগিরই বিলেত পাঠাবার কথা ভাবছে কোম্পানী। বিলেত সম্পর্কে বাদলের কোনো মোহ নেই, বরং সে ইংরেজ জাতটাকে অপছন্দই করে—বিলেতে আজকাল ভারতীয়দের সঙ্গে যে বিশ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে—তার ফলে বিলেত সম্পর্কে তার আর উৎসাহ নেই-ই বলা চলে। তবু বাদল ভেবেছিল, এখানে যে তার হৃদয়জোড়া শূন্যতা, হয়তো বিদেশে গেলে সেটা যাবে। বিলেত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দেশ ঘোরা হবে—দেখাই যাক্ না।

দুপুরে কেরানীরা টিফিন কৌটো খুলে ঠাণ্ডা পরোটা আর আলুর তরকারি খায়, কিংবা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ফুটপাত থেকে ঘুগনি কিংবা ঝালমুড়ি কিংবা কাটা শশা দিয়ে খিদে মেটায়। কিন্তু অফিসারদের ও রকম ব্যবহার করতে নেই, তাদের লাঞ্চ খেতে হয়। বাদলের অফিসে অফিসারদের জন্য লাঞ্চরুম আছে, বাদলকেও আসতে হয় সেখানে। অফিসে এই সময়টাই তার সবচেয়ে অসহ্য লাগে। লাঞ্চরুমে যে সমস্ত গল্প হয় তার কোনোটাতেই যোগ দেবার উৎসাহ পায় না সে। অথচ আগাগোড়া চুপচাপ বসে থাকাটাও অভদ্রতা। তাই বাধ্য হয়ে দু-একটা হুঁ-হ্যাঁ দিয়ে বাদল কোনো বই হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করে।

তাদের অফিসে শিগগিরই একটা সোস্যাল ফাংশন হবে—সেদিন লাঞ্চরুমে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ক্রেডিট সেকশানের প্রেমনাথবাবু—যিনি অফিসের কাজে সবচেয়ে বেশী ফাঁকি মারেন—তাঁরই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ। প্রেমনাথবাবুই সরবে বিভিন্ন প্রস্তাব তুলছিলেন—বাদল সেদিকে একটুও মনোযোগ না দিয়ে খবরের কাগজে চোখে বোলাচ্ছিল। হঠাৎ একটা নাম তার কানে আসতেই কি রকম যেন খট্‌কা লাগলো। গৌতম রায়? গৌতম রায়—এ নামটা যেন শিগগিরই কোথাও শুনেছে। কোথায়? কার কাছে? ও হ্যাঁ, বল্লরীর কাছে, বল্লরী যে-লোকটার সঙ্গে গল্প করছিল, মুখ ভর্তি পান, পোশাকে শস্তা বড়লোকির চেষ্টা, যে বল্লরীকে সিনেমায় চান্স দেবে।

বাদল প্রেমনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি গৌতম রায়কে চেনেন? প্রেমনাথবাবু বললেন, চিনি না? কি বলছেন মশাই! এতক্ষণ তা হলে বললুম কি? কসবায় আমাদের বাড়ির মাত্র সাতখানা বাড়ি পরে থাকে—আমাদের সোস্যালে ওকে তো আমিই নিয়ে আসছি—আর বললে আড়াই শোতে রাজী হয়ে যাবেন—অন্য জায়গায় পাঁচশো এক টাকা নেন্।

—লোকটা কেমন?

—কেমন মানে? আপনি গান শোনেননি গৌতম রায়ের!

—সে কথা না, জিজ্ঞেস করছি লোকটা কেমন?

—তা আপনি যদি ওর সঙ্গে বোনের বিয়ে দিতে চান—

—না, না, আমার কোনো বোন নেই।

—ঐ হলো কথার কথা, আপনার যেমন বোন নেই, তেমনি গৌতম রায়েরও বিয়ে করার উপায় নেই, অলরেডি দুটো হয়ে গেছে—কিন্তু ঐ সেন্সে জাজ করলে বলতে হয় লোকটা একেবারে থার্ড ক্লাস! মাতাল, জোচ্চোর মানে কোনো গুণে ঘাট নেই। কিন্তু গানের ব্যাপারে জিনিয়াস—তা মানতেই হবে, এই অল্প বয়সেই তিনটে ছবির মিউজিক ডাইরেক্টর হবার কন্ট্রাক্ট পেয়েছে একসঙ্গে।

—খুব অল্প বয়েসে তো নয়। আমি দেখেছি, আমার তো মনে হয়েছে পঁয়তাল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ।

—থার্টি এইটের একদিনও বেশী নয়, আমি লিখে দিচ্ছি আপনাকে। চেহারা ঐ রকম হয়েছে, তা হবে না! আমার পাশের বাড়ি, আমি জানি তো—দুটো পান দোষ, সব সময় জর্দা পান আর মদ্য পান, তারপর আলুর দোষ—কচি কচি মেয়েদের সিনেমায় চান্স দেবার নাম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এনে—

বাদলের আঙুলের ডগাগুলো শিরশির করে উঠলো, হঠাৎ ভয় পেলে বুকের ভেতরটা যে-রকম খালি খালি লাগে, সেই রকম মনে হলো। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, সত্যি? আপনি ভালো করে জানেন?

প্রেমনাথবাবু বললেন, জানি না মানে! আমি কেন, সারা বাংলাদেশের লোক জানে। মেয়েদের ব্যাপারে গৌতম রায় একটি খাঁটি নেকড়ে বাঘ। তবে আমি মশাই ওর তেমন দোষ নিই না, আর্টিস্ট লোক—একটু তো মানে ইয়ে হবেই, আর যে রকম ভাবে সব উঠতি বয়েসের মেয়েরা ওর পেছনে লেগে থাকে—তাতে আমরাই মাথার ঠিক রাখতে পারতুম না, আর ও তো আর্টিস্ট।

বাদল তক্ষুনি খাবার টেবিলে ছেড়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো। ফাইল খুলে কাজে মন বসাবার চেষ্টা করলো। যে-সব জটিল অঙ্ক আগে মেলাতে পারেনি

সেগুলো মেলাবার চেষ্টা করলো এখন। অঙ্কের মতন এমন সরল জিনিস আর হয় না। কতগুলো সংখ্যা— কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই, কোনো রকম মতান্তর হবার সম্ভবনা নেই, একটি মাত্র উত্তরই জানে। কিন্তু বাদল, কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। তার মন দ্বিধায় দুলছে। বল্লরী ঐ গৌতম রায়ের খপ্পরে পড়বে? কিন্তু তাতে বাদলের কি আসে যায়? প্রেমনাথবাবুই তো বললেন, কত মেয়েই গৌতম রায়ের ছিনিমিনি খেলার সামগ্রী হতে আসে—বাদল কি তাদের সবাইকে বাঁচাতে পারবে? শুধু বল্লরীর জন্যই বা তার মাথা ব্যথা কেন? বা গৌতম রায়কে শায়েস্তা করার কোনো শক্তি তার নেই, আর বল্লরী, সে-ই বা বাদলের কথা শুনবে কেন? মল্লিকা আর বল্লবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক একদিন সে চুকিয়ে দিয়ে এসেছে। ওদের নামও আর মনে আনবে না ঠিক করেছিল। তার নিষেধ শুনে বল্লরী যদি হেসে উঠে বলে, আপনি একথা বলার কে?

অফিস থেকে বেরিয়েও বাদল ছটফট করতে লাগলো। বল্লরীকে সে ভালোভাবেই জানে। ঐ জ্বলন্ত আগুনকে গৌতম রায়ের সংস্পর্শে যেতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। বল্লরী সিনেমায় নামতে চাইছে—একথা কি মল্লিকা জানে? মল্লিকার মতন তেজী মেয়ে নিশ্চয়ই এসব সহ্য করবে না! কিন্তু ওদের বাবা রাসবিহারীবাবু মারা গেছেন—হয়তো অনেক বদল হয়ে গেছে ওদের পরিবারের। মল্লিকার কথাই যে বল্লরী শুনবে, তারও হয়তো কোনো মানে নেই। হঠাৎ নিজেকে খুব অসহায় মনে হল বাদলের। অনেকক্ষণ একা একা ঘুরলো—ময়দানের মধ্যে দিয়ে, ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে—অন্যরা এখানে বেড়াতে এসেছে জোড়ায় কিংবা দল বেঁধে—তাদের উৎফুল্ল কণ্ঠ তার কানে আসে কিন্তু সে নিঃসঙ্গ—তাই তার গম্ভীর মুখ, একা একা তো মানুষ হাসতে পারে না! বল্লরীর মতন অমন সরল সুন্দর একটা মেয়ে চলে যাবে গৌতম রায়ের মতন একটা লম্পটের খপ্পরে, সেখান থেকে সিনেমার নোংরা রাজ্যে—সেখানকার তারকা হবার বদলে এঁটো শালপাতা হতে পারে বল্লরী। সেই বল্লরী, রূপনারায়ণ নদীর ধারে মানস হংসীর মতন ছুটে বেড়িয়েছিল যে কিশোরী—সে শেষ পর্যন্ত যাবে ঐখানে? কিন্তু বাদল সে সব অধিকার হারিয়েছে।

বাদল মনঃস্থির করে ফেললো। পারুক না পারুক সে, চেষ্টা করবেই! বল্লরীকে সে ফেরাবার চেষ্টা করবেই। জীবনে একবার অপরাধ করলে কি মানুষ আর ভালো হতে পারে না? বল্লরীদের বাড়ি যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, সেখানে মল্লিকার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস নেই। কিন্তু বল্লরীর সঙ্গে কোথায় দেখা করবে? বল্লরী উইনিভার্সিটিতে সিক্সথ ইয়ারে পড়ে বলেছিল, কিন্তু সেখান থেকে ওকে খুঁজে বার করা মুশকিল। অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে থাকবে বল্লরী, সেখানে ওকে ডাকলে

ও যদি সবার সামনেই বাদলকে অপমান করে ফিরিয়ে দেয়? সেদিন বল্লরী তার সঙ্গে ভালো ভাবেই কথা বলেছে, তার সঙ্গে রেস্তোরায় পর্যন্ত গিয়েছিল—হয়তো সবটাই খেলাচ্ছলে। বাদলের সঙ্গে এর পর দেখা হলেও যে সে ভালো ব্যবহার করবে তার কোনো মানে নেই। নিরিবিলিতে বল্লরীর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। বল্লরী ওর গানের ক্লাস কবে কবে বলেছিল? শনিবার আর বুধবার নয়? শনিবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—পরশু বুধবার—

মাঝখানের একটা দিন চাপা উত্তেজনার মধ্যে কাটল বাদলের। মনের মধ্যে সব সময় দ্বিধা, বল্লরী তার কথার কোনো গুরুত্ব দেবে কিনা। গৌতম রায় বল্লরীকে সিনেমায় চান্স দিতে চেয়েছে—তার বদলে বাদল বল্লরীকে কি দিতে পারে? কিছুই না। গৌতম রায় মেয়েদের কি করে সে কথা কি বাদল মুখ ফুটে বলতে পারবে? সে যাই হোক, বল্লরী, তুমি এত সুন্দর, তোমাকে আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারি না।

বুধবার অফিস থেকে বেরিয়েই সোজা বিডন স্ট্রীটের মোড়ে সে জায়গাটায় চলে এলো বাদল। বল্লরীর গানের ক্লাস কখন শুরু কখন শেষ তা সে কিছুই জানে না। তা হোক, যতক্ষণ দাঁড়াতে হয় বাদল দাঁড়াবে। গলা থেকে টাইটা খুলে কোটের পকেটে রাখলো, জামার একটা বোতাম খুলে দিয়ে একটু হাল্কা হলো। চায়ের দোকানে ঢুকে একটু চা খেয়ে নেবার সাহসও হলো না তার—যদি বল্লরী এর মধ্যে চলে যায়! গানের ক্লাসে যাবার পথে দেখা হয়ে গেলেই ভালো হয়।

অপেক্ষা করতে করতে বাদল রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়লো। বল্লরী যদি আজ গানের ক্লাসে না আসে? তা হলে আবার সেই শনিবার? একসময় ঠিক এইখানে সে মল্লিকার জন্য দাঁড়াতো—আজ সে বল্লরীর জন্য দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মল্লিকার জায়গায় বল্লরীকে বসানো কিছুতেই সম্ভব নয়। তবু, মল্লিকার জন্য দাঁড়াবার সময় সে যতখানি অধীরতা বোধ করতো, আজ অধীরতা তার চেয়ে অনেক বেশী আর কারণ কি এই যে, এর মধ্যে তার ছ' বছর বয়েস বেড়ে গেছে। সাড়ে ছটা-সাতটা বেজে গেল, সিগারেট টেনে টেনে বাদলের বুক ভারী হয়ে এসেছে, তবু বল্লরীর দেখা নেই। বল্লরী আজ আর আসবেই না মনে হচ্ছে।

—এ কি বাদলদা, আপনি আজ আবার?

চমকে কেঁপে উঠলো না বাদল, আস্তে আস্তে পেছন ফিরে তাকালো। এই রকমই হয় তার, যখন সে খুব তীব্রভাবে কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তখন প্রথম দিকে খুব ছটফটানি ও অস্থিরতা বোধ করলেও তীব্রতা যত বাড়ে—বাইরের দিকে ক্রমশঃ তা শান্ত হয়ে আসে। বল্লরীর দিকে ফিরে বাদল মৃদুকণ্ঠে বললো,

আজ শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছি।

বল্লরী আজ একটু বেশ সাজ পোশাক করে এসেছে। আজ তাকে আর মল্লিকা বলে কোনোক্রমেই ভুল হয় না। মল্লিকা কোনোদিনই খুব বেশী ঝলমলে পোশাকে প্রসাধনে সাজেনি, অন্তত বাদল কখনো দেখেনি। সেদিন বল্লরীর কানে দুল ছিল না, হাতে সোনার অলংকার ছিল না—কিন্তু সেই নিরাভরণ রূপে তাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। আজ বল্লবীর কানে মুক্তোর দুল, গলায় মুক্তোর মালা, দু'হাতে অনেকগুলো সোনার চুড়ি। মেরুন রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে বল্লরী। ঠোঁটে আলতো করে লিপস্টিক ছুঁইয়েছে—আজও বল্লরীকে কম সুন্দরী দেখাচ্ছে না, কিন্তু একটু উগ্র একটু চোখ ধাঁধানো!

বল্লরী বললো, আমার জন্য! কি সৌভাগ্য আমার! কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন?

বলা যায়, সেই সোমবার দুপুর থেকে!

—ওরেব্ বাবা! এতখানি টান—হঠাৎ কি হলো আপনার?

—বল্লরী, তোমাকে আমি দু-একটা কথা বলতে চাই, একটু সময় হবে?

বল্লরী একটু চঞ্চল ভাবে এদিক ওদিক তাকালো, তারপর বললো, আজ নয়, অন্য একদিন। আজ আমার এক জায়গায় যাবার কথা আছে।

বাদল বললো, বেশীক্ষণ সময় লাগবে না। আমার কথাটা খুব জরুরী!

—আমার সঙ্গে জরুরী কথা? খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মনে হচ্ছে! কিন্তু আজ যে আমার সত্যিই সময় নেই। সাড়ে সাতটার মধ্যে এক জায়গায় যেতে হবে—এমনিতে দেরী হয়ে গেছে, একটা ট্যাক্সি না পেলে—

—তুমি কোথায় যাবে?

বল্লরী একটু ইতস্ততঃ করলো, তারপর বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলে বললো, কি ব্যাপার বলুন তো বাদলদা? আপনি ওরকম সিরিয়াস মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন! কী এমন কথা আমার সঙ্গে।

সত্যিই, একুশ-বাইশ বছরের ছেলেরা প্রথম কোনো মেয়েকে প্রেম জানাতে গেলে যে রকম ভয়ে কাঁপে, বাদল সেই রকম নার্ভাস হয়ে পড়েছে! অথচ তার বয়েস একতিরিশ, আর এই বল্লরীকে সে এত ছেলেমানুষ অবস্থায় দেখেছে যে, সে অনায়াসে তাকে তুই বলেও ডাকতে পারতো। বল্লরীকে তো সে প্রেম জানাতেও আসে নি! শুধু তার ভয়, বল্লরী যদি হঠাৎ বলে ওঠে, আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না, আপনি কেন আমায় বিরক্ত করছেন? যান্, আমার চোখের সামনে থেকে সরে যান্!—একথা বলার অধিকার বল্লরীর আছে।

বাদল তবু বললো, বল্লরী, তুমি এখন কোথায় যাবে? যদি আপত্তি না থাকে...

—আমি একটু ল্যান্সডাউন রোডে যাবো আমার গানের রিহার্সাল আছে, সেই যে সেদিন বলছিলাম—সিনেমায়।

—সেই গৌতম রায়?

—হ্যাঁ।

—বল্লরী, শোনো, ঐ ব্যাপারেই আমার কিছু বলার ছিল ।

—আমার গানের ব্যাপারে? আপনি কি আমাকে অন্য কোথাও চান্স পাইয়ে দেবেন নাকি?

—না, তা নয়।

ঠিক কি ভাবে শুরু করবে, বাদল বুঝতে পারলো না। গৌতম রায় লোকটা ভালো নয়—এই ভাবে সোজাসুজি বলা যায়? গৌতম রায়ের বাড়ি কসবায়, ল্যান্সডাউন রোডে বল্লরীকে যেতে বলেছে, সেখানে আবার কি?

বল্লরী চঞ্চল হয়ে বললো, বাদলদা, আমি সত্যি আজ আর দেরী করতে পারছি না। এই যে একটা ট্যাক্সি।

—বল্লরী, তোমাকে আজ যেতেই হবে?

—হ্যাঁ, সিনেমায় এই সব একটা চান্স পাচ্ছি—সেটা কেন ফক্সাই বলুন।

বাদল সঙ্গে সঙ্গে মনঃস্থির করে নিয়ে বললো—বল্লরী, আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই, তোমার আপত্তি আছে?

বল্লরী রীতিমত অবাক হয়ে বললো, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? আপনি সেখানে গিয়ে কি করবেন? আপনার ভালো লাগবে না।

—না, না, আমি ভেতরে যাবো না। আমি বাইরে কোথাও অপেক্ষা করবো —তোমার হয়ে গেলে, তারপর কোথাও বসে-টসে—

—আপনি আমার জন্য এতটা সময় নষ্ট করবেন? আমার কতক্ষণ লাগবে, কে জানে!

—আমার তো কোনো কাজ নেই এখন। আমার হাতে অনেক সময়।

—ঠিক আছে, চলুন। ভালোই হলো, ট্যাক্সি ভাড়াটা আপনার ঘাড় দিয়ে যাবে।

ট্যাক্সিতে উঠে একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাদল জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোন্ ছবিতে গান গাইবে? সে ছবির শুটিং আরম্ভ হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, প্রায় শেষ, বইয়ের নাম 'আকাশের রং', আমি শুধু একটা কোরাস গানে চান্স পেয়েছি, অবশ্য, আমার গলা আলাদ করে চেনাই যাবে না হয়তো।

—তুমি কন্ট্রাক্টে সই করেছো?

—না সই-টই তো কিছু করায়নি? একশো টাকা মোটে পাবো—টাকার জন্যে নয়, আমি চাইছি একটু চেনাশুনো হলে এর পরের কোনো বইতে যদি পার্ট পাই।

—গৌতম রায়ের সঙ্গে তোমার কি করে আলাপ হলো?

—আমাদের যিনি গান শেখান—প্রভাসদা, উনি তাঁর বন্ধু। একদিন আমাদের গানের স্কুল এসেছিলেন মেয়ে খুঁজতে—আমাকেই পছন্দ হয়ে গেল—

বাদল আস্তে আস্তে বললো, আমি শুনেছি, গৌতম রায় খুব মিথ্যে কথা বলে। গৌতম রায় লোক ভালো নয়।

—লোক ভালো কি খারাপ তাতে আমার বয়েই গেল! অমার চান্স পেলেই হলো!

—কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে তোমাকে ঠকায়?

—আমাকে ঠকিয়ে ওঁর লাভ কি?

—তুমি ছেলেমানুষ—

—খুব ছেলেমানুষ নই, একুশ বছর বয়েস হয়েছে, এম.এ.পড়ছি, এখনও যদি নিজের ভালোমন্দ বুঝতে না পারি!

—সিনেমায় নামার এত ঝোঁক কেন তোমার? যাদের টাকা-পয়সার অভাব থাকে—তারাই সিনেমায় এসে ভাগ্য ফেরাতে চায়। কিন্তু তোমাদের তো—

—টাকার জন্য নয়! টাকার জন্য নয়! আমার টাকার লোভ নেই! আমি কি চাই জানেন! আমি চাই সিনেমায় আমি নায়িকা হবো—আমার কাছ থেকে কণ্ট্রাক্ট পাবার জন্য প্রডিউসাররা আমার বাড়িতে ধর্ণা দেবে, হাজার হাজার লোক আমাকে একটু দেখার জন্য পাগল হবে, আমি যাকে যা ইচ্ছে হুকুম করবো।

—তোমার বুঝি মানুষকে হুকুম করতে খুব ভালো লাগে।

—খুব! খুব!

—তুমি যে সিনেমায় নামার চেষ্টা করছো, তোমার দিদি একথা জানে? বল্লরী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো। অনর্গল হাসির দমকে তার সারা শরীর এমন কাঁপতে লাগলো যে বাদল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বল্লরীর পিঠে হাত ছোঁয়াতে গিয়েও হাত তুলে নিয়ে বাদল দুর্বল গলায় গিজ্ঞেস করলো, একি, এত হাসছো কেন? হাসির কথা তো কিছু বলিনি!

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বল্লরী বললো, হাসবো না কেন? তবু দিদির কথা একবার উচ্চারণ করলেন মুখ দিয়ে। সেদিন আপনি এমনভাবে কথা বলছিলেন, যেন আমার কোনো দিদিই নেই, কিংবা আমার দিদির সঙ্গে আপনার জীবনেও দেখা হয়নি।

বাদল মুখ নিচু করে বললো, মল্লিকা কেমন আছে? ওর বিয়ে হয়ে গেছে?

—ভালোই আছে। বিয়ে হলে নেমন্তন্নর চিঠি পেতেন। আমি নিজে গিয়ে আপনাকে নেমন্তন্ন করে আসতুম। আমরা আপনার মতন এত অভদ্র নই।

—আমি অভদ্র! বল্লরী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি আমাকে জীবনে কখনো ক্ষমা করতে পারবে না?

বল্লরী সরাসরি বাদলের দিকে ঘুরে বিচিত্র ভাবে তাকালো। চোখ দুটো ইষৎ কুঁচকে ঝাঁঝালো গলায় বললো, বাদলদা, আপনি তো আগে এরকম ন্যাকা ছিলেন না। হঠাৎ এত ন্যাকা হলেন কেন?

—বাঃ, ন্যাকামির কি করলুম?

—ন্যাকামি নয়। ছেলেদের মুখে ক্ষমা-টমা চাওয়ার কথা শুনলে আমার অসহ্য লাগে। এসব বাংলা সিনেমায় মানায়। আপনিও কি সিনেমায় নামবেন নাকি?

—না, সিনেমা-টিনেমা না, শোনো।

তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বল্লরী ঠাট্টার সুরে বললো, নামুন না, বেশ ভালো হবে তা হলে। বেশ আপনি আর আমি একই বইতে হিরো আর হিরোইন হবো। তখন আপনি প্রাণ ভরে ক্ষমা-টমা চাইবেন—

বাদল টের পেল, বল্লরী তার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে দিচ্ছে, একটা কচি মেয়ের কাছে সে বারবার বোবা হয়ে যাচ্ছে। তাই নিজেকে ফের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় সে খানিকটা ধমকের সুরে বললো, ছেলেমানুষি করো না। যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও। তোমার দিদি তোমার সিনেমায় নামার ব্যাপারে আপত্তি করেনি?

—দিদির আপত্তির প্রশ্নই তো আসে না। আমি কি করবো না করবো তা ঠিক করার অধিকার আমার নিজেরই আছে।

—আপত্তি করেছে কিনা, আমি সেটাই জানতে চাইছি। তুমি তার আপত্তি মানবে কিনা—সেটা পরের ব্যাপার—

—দিদিকে বলিনি। বাড়িতে কাউকেই বলিনি, হঠাৎ একদিন চমকে দেবো।

—দিদিকে তোমার প্রথমেই বলা উচিত ছিল। মল্লিকা তোমাকে এত ভালোবাসে।

—অনেক সময় বেশী ভালোবাসে অত্যাচারের মতন হয়ে দাঁড়ায়। বেশী ভালোবাসা মানুষকে পরাধীন করে দেয়। আমি কারুর কাছে থেকে অত বেশী ভালোবাসা চাই না।

ট্রাক্সি ল্যান্সডাউন রোডে ঢুকে ছুটেছে, পৌঁছোতে আর বেশী দেরী হবে না। বল্লরী বাড়িগুলোর নম্বর দেখার চেষ্টা করছে। এক্ষুনি বল্লরী বাদলের কাছ থেকে দূরে চলে যাবে।

বাদল অবাক হয়ে বল্লরীর দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বললো—তুমি অনেক বদলে গেছ। যে-বল্লরীকে আমি পাঁচ বছর আগে চিনতাম, তার থেকে তুমি একেবারে অন্য রকম।

রাস্তার দিকে চোখ রেখে বল্লরী বললো, পাঁচ বছরে সবারই জীবন বদলায়। আপনিও অনেক বদলে গেছেন। এই যে, এই বাড়িটা, এসে গেছি—

বাড়িটার সব ঘরে আলো জ্বলছে। দোতলার একটা ঘর থেকে মানুষ-জনের কলকণ্ঠ ও সেতার-তানপুরার আওয়াজ আসছে। বারান্দায় কয়েকজন নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে। গানের রিহার্সালের ব্যাপারটা অন্তত গৌতম রায় মিথ্যে বলেনি। এত লোকজন রয়েছে, সুতরাং বল্লরীর হয়তো তেমন বিপদের আশঙ্কা নেই। বাড়িটাতে ঢুকে যাবার আগে বল্লরী বলে গেল, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসবার চেষ্টা করবো। আপনি কাছেই থাকবেন তো?

কাছেই পদ্মপুকুর, সেখানে ঢুকলো বাদল। একটা ও বেঞ্চ খালি নেই, রেলিং এ হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। এখান থেকেও বাড়িটা দেখা যায়। ঝলমলে আলো ও সুরের উৎসব—ছায়ামূর্তির মতন মানুষজন এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাতায়াত করছে। ওখানে সবাই হাল্কা খুশীতে মত্ত। বাদল এখানে অন্ধকারে একা। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে ঐ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বাদলের খেয়াল হলো, সে কেন ওদিকে তাকিয়ে আছে? সে তো অন্ধকার জলের দিকে তাকাতে পারে? সে তো অন্ধকার জলের আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখতে পারে স্মৃতির প্রতিচ্ছবি?

সেই বাড়িটার থেকে চোখ ফিরিয়ে বাদল যেই জলের দিকে তাকালো, অমনি বাদলের চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠলো। সেটা কিন্তু স্মৃতি নয়, একটা দুঃস্বপ্ন বলা যায়। বাদল দেখতে পেল, বল্লরীকে দেখা মাত্রই আনন্দে চিৎকার করে উঠলো গৌতম রায়। মদের ঝোঁকে টলছে গৌতম রায়, পানের পিক পড়েছে তার সস্তা সিল্কের পাঞ্জাবিতে, তাড়াতাড়ি উঠে এসে গৌতম রায় বল্লরীর পিঠে হাত রাখলো, বল্লরীর খুব কাছাকাছি তার মুখ, রক্তবর্ণ লোভী চোখ... ধুৎ, কি সব যা-তা জিনিস ভাবছি আমি, কোনো মানেই হয় না—এই ভেবে বাদল ছবিটাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো।

ছলছল শব্দ হচ্ছে জলে, পাড়ের খুব কাছাকাছি একটা মাছ খলাৎ করে উঠলো, একটু দূরেই একটি ছেলে আর একটি মেয়ে খুব নিবিড় হয়ে বসে আছে—তবু সেই ছবিটা বাদলের চোখে আবার ফিরে এলো। গৌতম রায় বল্লরীর হাত ধরে ফিস ফিস করে বলছে, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা কথা আছে, পাশের ঘরে এসো। পাশের ঘরে নিয়ে গেল বল্লরীকে। সেই ঘরটা নির্জন অন্ধকার। বল্লরীর

মুখের কাছে গরম নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে গৌতম রায় বললো, আঃ, এত সুন্দর তোমার গানের গলা, এত সুন্দর চেহারা, আমি মেহের চাঁদজীকে বলেছি, আগামী ছবিতে তোমাকে হিরোইন..... হিরোইনের চারখানা গান....কাননদেবীর পর তুমিই বাংলা দেশের বেস্ট হিরোইন হতে পারো—শুধু আমাকে একটু ভালোবাসবে, একটু ভালোবাসা... ব্যাকুল হাতে বল্লরীর মুখ ঘুরিয়ে গৌতম রায় তার লালাসিক্ত ঠোঁটে চুমু খেল, বল্লরীর বুকে ওর হাত, ব্যস্ত ভাবে ব্লাউজের বোতাম খুলতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে বোতাম—বল্লরীর স্তন—সাদা পায়রার বুকের মতন নরম—সেখানে গৌতম রায়ের নোংরা হাত—বল্লরী কি করছে। বল্লরী কি বাধা দিচ্ছে? বল্লরী—।

বাদল চকিতে মুখ ফিরিয়ে দেখলো—না, ঐ বাড়িতে কোনো অন্ধকার ঘর নেই, সব ঘরে আলো, সব ঘরেই মানুষ, ওখানে ওরকম ব্যাপার ঘটার কোনো সম্ভাবনাই নেই—তবু বাদল দুঃস্বপ্নের ছবিটাকে তাড়াতে পারছে না। গৌতম রায় পাগলের মতন জোর করে আলিঙ্গন করছে বল্লরীকে, বল্লরীর শাড়ি খুলে যাচ্ছে, একটা ঝটপটানি... সেই সময় অন্ধকার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাদল গম্ভীর গলায় বলে উঠলো, সাবধান! সাবধান, আমি এসেছি—

দূর ছাই! বাদল ছবিটাকে মুছে ফেলে একটু হাসলো! আমি কি পাগলের মতন এসব ভাবছি? অত লোকজনের মধ্যে বল্লরী গেছে গানের রিহার্সাল দিতে—ওরকম সুন্দরী মেয়ে, অনেকেই হয়তো একটু ফষ্টিনষ্টি করার চেষ্টা করবে। তার বেশী..... তা ছাড়া বল্লরী খুব দুর্বল মেয়ে না, তাছাড়া.....। কিন্তু বল্লরীর শুভ্র পবিত্র যৌবনকে সে রক্ষা করবে—এই প্রহরীর দায়িত্ব বাদলকেই বা কে দিয়েছে? বল্লরী তো নিজেই বলেছে একটু আগে, সে কি করবে না-করবে তা সে নিজেই ঠিক করবে। বাদল কে? বাদলের কোনো অধিকার নেই!

আবার জলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বাদল কিছুক্ষণের জন্য বল্লরীকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলো। সে কিছুই ভাববে না, শুধু জলের দিকে তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু কালো জলে আস্তে আস্তে ভেসে উঠলো মল্লিকার মুখ। রূপনারায়ণ নদীতে এক বুক জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্লান্তস্বরে মল্লিকা একদিন বলেছিল, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমার এখন মরে যাওয়াই ভালো। বাদলে বলেছিল, না, না, তুমি ভুল করছো মল্লিকা, আমি দোষ করেছি ঠিকই—আমি শুধু তোমাকেই.....

ছোট্ট একটা গ্রাম দেউলটি, বর্ষার দিনে রাস্তায় কি কাদা কি কাদা! কাদার মধ্যে চটি হারিয়ে গিয়েছিল মল্লিকার, বাদল বিনাদ্বিধায় সেই কাদার মধ্যে হাত ডুবিয়ে খুঁজে এনেছিল চটি। কিন্তু টেনে তুলতে গিয়ে চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গিয়েছিল, তবু

সেই ছেঁড়া চটিই শূন্যে তুলে বাদল ছেলেমানুষের মতন চেঁচিয়ে উঠেছিল, পেয়েছি, পেয়েছি..... হাসিতে একেবারে লুটিয়ে পড়তে পড়তে মল্লিকা বলেছিল, সত্যিই, অসাধ্য সাধন করেছো তুমি, এটাকেও একটা, 'জুতা আবিস্কার' বলা যায়! বাদল বলেছিল, নিশ্চয়ই, এজন্য কি পুরস্কার দেবে বলো! মল্লিকা চোখ পাকিয়ে কৃত্রিম চিন্তার ভঙ্গি করে বলেছিল, আচ্ছা, পুরস্কারের কথাটা ভেবে দেখতে হবে! তার আগে ঐ কাদা-মাখা হাতটা ধুয়ে এসো তো। গা গুলোচ্ছে আমার!

কিছুই দেখার ছিল না সেই গ্রামে। কাছেই দেবানন্দপুর, যেখানে শরৎ চাটুজ্যে থাকতেন। আছে শুধু একটা নদী, রূপনারায়ণ, অন্য সময় শুকিয়ে থাকে—কিন্তু বর্ষায় টইটম্বুর ভরা। ওপারে কোলাঘাট। ইলিশ মাছ ধরা জেলে ডিঙিগুলো ভাসছে নদীতে। সেই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে মল্লিকা আবৃত্তি করেছিল, রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম—জানিলাম—এ জগৎ স্বপ্ন নয়। অথচ স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকারই দিন ছিল তখন, কি বিশুদ্ধ আনন্দের দিন, বাদল নিজেই সে জীবন হারিয়েছে—

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে ফিরলো বল্লরী, পার্কের মধ্যেই বাদল থাকবে, ওকে বলে দিয়েছিল। বাদল তন্নতন্ন চোখে দেখলো বল্লরীকে। সেই দুঃস্বপ্নের ছবিটা চকিতে আবার ভেসে উঠলো কিন্তু বল্লরীর পোশাক একটুও বিশ্রস্ত হয়নি, খোঁপা ভাঙেনি, ব্লাউজের বোতাম ছেঁড়েনি, কপালের টিপও মোছেনি; শুধু বল্লরীর মুখ খানা একটু গম্ভীর ঐ রকম আনন্দ উচ্ছল পরিবেশ থেকে আসার পর এ রকম গাম্ভীর্য যেন তাকে মানায় না।

বাদল জিজ্ঞেস করলো, কি রকম হলো তোমার গান?

—ভালোই!

—আরো রিহার্সাল হবে?

—না, পরশু রেকর্ডিং হবে।

—তোমাকে একটু গম্ভীর মনে হচ্ছে? কি ব্যাপার?

—কই গম্ভীর না তো!

বল্লরী চেষ্টা করে একটু হাসলো। তারপর বললো—জানেন, একটা মজা হয়েছে। রিহার্সালের পর দু'তিনজন আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে চাইছিল, একজনের গাড়ি আছে—কিন্তু সবাই অবাক হয়ে গেল, যখন আমি কারুর সঙ্গে না গিয়ে এক এসে পার্কে ঢুকলাম।

বাদল হঠাৎ খুব আহত ও অপমানিত বোধ করলো। তীব্র গলায় বললো, তা হলে তুমি ওদের সঙ্গেই গেলে না কেন? ভালো ভালো লোকেরা যখন তোমাকে গাড়িতে পৌঁছে দিতে চাইছিল—

—বাঃ, আপনি যে বললেন আপনার দরকারী কথা আছে?

—আমার দরকারী কথার কিই বা মূল্য আছে! ঠিক আছে, তুমি এখন যাও না, এখনও যদি তারা চলে না গিয়ে থাকে।

—পাগলামি করবেন না।

—না। আমি সত্যিই বলছি, আমার কথা আর এখন তেমন জরুরী নেই। পরে বললেও চলবে—তোমার বন্ধু যদি এখনো চলে গিয়ে না থাকে, তুমি ওদের সঙ্গেই যাও, আমি রাগ করবো না!

—আবার ছেলেমানুষি শুরু করেছেন! ওরা আমার বন্ধু নয়! আমার ইচ্ছে হয়নি বলেই ওদের সঙ্গে যাইনি, ইচ্ছে হয়েছে বলে এখানে এসেছি। ব্যাস!

বাদল চুপ করে রইলো। বল্লরীও চুপ। একটু বাদে বল্লরীই আবার বললো, চলুন কোথাও বসি। কোনো বেঞ্চি—টেঞ্চি খালি নেই?

পুকুরের চারপাশ ঘুরে একটা বেঞ্চ অতিকষ্টে খালি পাওয়া গেল। সেখানে বসেও বাদল চুপ করে রইলো। কি বলবে বল্লরীকে? গৌতম রায় সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে এখন বোকার মতন শোনাবে না? আসলে গৌতম রায় সম্পর্কে বাদল কি জানে? অফিসের প্রেমনাথবাবু যা বলেছেন সেইটুকু, প্রেমনাথবাবু তো বানিয়েও বলতে পারেন। হয়তো গৌতম রায় লোকটা খারাপ নয়, সিনেমা লাইনেও কি দু-একজন ভালো লোক নেই; নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাহলে বাদল ঐ দুঃস্বপ্নটা দেখলো কেন? বল্লরীর গায়ে কেউ হাত ছোঁয়াচ্ছে—এটা ভাবলেই বাদলের রক্ত টগবগ করে উঠেছে কেন? পাঁচ বছর আগেকার একটা পুরনো অপরাধ-বোধ বাদলের বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠলো।

বল্লরী বললো, কি, চুপ করে বসে আছেন কেন? বলুন।

—কিভাবে বলবো তাই ভাবছি।

—জানেন বাদলদা, আজ গান গাইতে গাইতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ছিলুম! আপনার কথাই ভাবছিলুম।

—আমার কথা?

—হ্যাঁ। ভাবছিলুম পাঁচ বছর আগে ভীতু কাপুরুষের মতন আপনি পালিয়ে গিয়েছিলেন, আর ভুলেও আমাদের বাড়ির দিকে পা বাড়াননি—আজ হঠাৎ এতদিন বাদে কি এমন জরুরী কথা বলতে এসেছেন আমার কাছে!

—আমি পালিয়ে যাইনি বল্লরী। মল্লিকা আমাকে যে-কথা বলেছিল তারপর আর আমার পক্ষে তোমাদের দুজনের সঙ্গে দেখা করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। বিশেষত তোমার সঙ্গে দেখা করা আরও অসম্ভব ছিল।

—দিদি কি বলেছিল আপনাকে?

—তুমি জানো না?

—না।

—সত্যিই জানো না? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—না, দিদি আমাকে কিছুই বলেনি। আপনি বলুন।

—তোমার দিদি আমাকে বলেছিল, তোমাকে বিয়ে করতে!

—আমাকে?

—হ্যাঁ। সেই ব্যাপারটার পর, মল্লিকার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলুম...আমি সত্যিই খুব অনুতপ্ত হয়েছিলুম...ওটা তো মুহূর্তের ভুল...কিন্তু তোমার দিদি বলেছিল, আমাকে ক্ষমা করতে পারে একটি মাত্র শর্তে, যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি।

—আমাকে? আপনি!

বল্লরী খিল্‌খিল্ করে হাসতে হাসতে একেবারে সারা শরীর কাঁপিয়ে ফেললো। দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে হাসির দমকে দুলে দুলে নিচু হয়ে পড়তে লাগলো—আশেপাশের লোকেরা যে তার ঐ রকম হাসিতে অবাক হয়ে তাকাবে—সেদিকেও কোনো খেয়াল নেই। এই রকমই পাগলাটে ধরনের হাসি ওর। বাদল বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো, কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে সে খুবই দ্বিধা করছিল, কিন্তু বল্লরী যে এমন হেসে উঠবে ভাবতেও পারেনি। বরং পুরনো কথা মনে পড়ায় বল্লরী রেগে উঠবে—এই রকমই আশা করেছিল। বল্লরীকে থামাবার চেষ্টা করে বাদল দুর্বল ভাবে বললো, বল্লরী, শোনো, এ—ই, কি হচ্ছে, এত হাসির কি আছে, শোনো, শোনো।

বল্লরী অতিকষ্টে নিজেকে একটু সামলে নিল। অত হাসিতে তার খোঁপা আলগা হয়ে গেছে, টিপ লেপ্টে গেছে কপালে, দু'চোখ ভর্তি তখনও হাসি—বল্লরী বললো, যাই বলুন, আপনি আর দিদি দুজনেই যেন বড্ড বেশী বোকা বোকা, দিদিকে তো জানিই, আপনিও যে এই রকম তা জানতুম না—আমার তখন ষোলো বছর বয়েস, আর আপনারা আমার বিয়ের কথা নিয়ে.....

—আমিও তো সেই কথাই তোমার দিদিকে বলেছিলাম। ওটা একটা অসম্ভব কথা...আমার পক্ষে তোমাকে....

—তাছাড়া, আমার বিয়ের ব্যাপারে আমার বুঝি কোনো মতামত নেই? দিদি বলবে, আর আপনি রাজী হবেন—তাহলেই বুঝি হয়ে যেতো?

—সে তো বটেই! তাছাড়া, আমার দিক থেকে ও কথা ওঠেই না, সেই জন্যই মল্লিকাকে আমি বলেছিলুম...কিন্তু মল্লিকা আমাকে ক্ষমা করেনি—মল্লিকা আমাকে

বলেছিল, তোমাকে যদি আমি বিয়ে না করি—তাহলে যেন আমি আর কোনোদিনই তোমাদের বাড়িতে না যাই, আর কোনোদিনই মল্লিকা বা তোমার সঙ্গে দেখা না করি!

—সেইজন্যই আপনি আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করলেন?

—তাছাড়া আর কি করবো!

—দিদির কথাটা আপনার হেসে উড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আপনারা দুজনেই খুব ছেলেমানুষ।

মল্লিকা আর বাদলের চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট বল্লরী, তবু অনায়াসে ওদের দুজনকে সে ছেলেমানুষ বলে ঠোঁট উল্‌টে হাল্কা ভঙ্গি করলো। বাদল তবুও বয়সোচিত গম্ভীর হয়ে বল্লরীকে ধমক দিতে পারলো না, কিংবা নিজের ব্যক্তিত্ব ফোটাতে পারল না। অপরাধীর মতন বললো, মল্লিকার কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারতাম, যদি না সেই ব্যাপারটা ঘটতো—

বল্লরী একটুও দ্বিধা না করে তক্ষুনি বললো, সেই ব্যাপারটাও হেসে উড়িয়ে দেওয়া যেতো!

—সেটাও হাল্কা সাধারণ ব্যাপার বলতে চাও?

—তা ছাড়া আর কি!

বাদল পাশ ফিরে বল্লরীর মুখের দিকে সম্পূর্ণভাবে তাকালো। বল্লরীর নির্লিপ্ত সুন্দর মুখখানা দেখতে দেখতে সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো।

।। তিন ।।

প্রেসিডেন্সি কলেজে চার বছর মল্লিকা আর বাদল একসঙ্গে পড়েছে। তারপর বাদল চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়ার জন্য একটা ফার্মে আর্টিক্‌লড্ হলো, মল্লিকা গেল এম.এ. পড়তে, কিন্তু তখনও প্রত্যেক বিকেলে দেখা হতো ওদের দুজনের।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় মল্লিকাকে সবাই চিনতো—সমস্ত অধ্যাপক ও ছাত্ররা। মল্লিকা রূপসী মেয়ে, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী রূপসী মেয়ে আরও ছিল কলেজে, তবুও মল্লিকা ছিল সবার থেকে আলাদা। অধিকাংশ ছেলেই মল্লিকাকে খানিকটা ভয় কিংবা সম্ভ্রমের চোখে দেখতো। মল্লিকার সামনে কিংবা আড়ালে কেউ কোনোদিনই কোনো ফোক্কুড়ি কিংবা খারাপ মন্তব্য করেনি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে মল্লিকা খুব গম্ভীর বা কড়া মেজাজের মেয়ে—বরং হিস্ট্রি অনার্সের অতসী চ্যাটার্জি ছিল সেই রকম—খুব বড়লোকের মেয়ে, দেখতেও দারুণ সুন্দরী—সেই অহংকারে অতসী সব সময় জ্বলজ্বল করতো—কলেজের ছেলেদের

যেন মানুষ বলেই গণ্য করতো না—ওদের বাড়ির গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো কলেজের গেটে, ক্লাস শেষ হলেই সোজা গাড়িতে উঠে চলে যেত, বারান্দা দিয়ে হাঁটার সময় দু'পাশের কারুর দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করতো না— সেই অতসীকেও ছেলেরা রেয়াৎ করেনি, তার নাম দিয়েছিল মিস্ ফটাসী—অহংকারে একদিন ফটাস্ করে ফেটে যাবে—অতসীকে দেখলেই তারা চেঁচাতো, সরে যা, সরে যা, মিস্ ফটাসী যাচ্ছে!—কিংবা বাংলা অনার্সের বাসন্তী। তাকে দেখতে তেমন সুন্দর ছিল না—কিন্তু তার ধারণা ছিল সব সময়ই বুঝি ছেলেরা তার সঙ্গে প্রেম করতে চাইছে এবং তাদের শাসন করার জন্য সে মুখিয়ে থাকতো, যখন তখন সে ছেলেদের কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিত, একটু কিছুতেই সে প্রিন্সিপ্যালের কাছে নালিশ করার ভয় দেখাতো—তবু ছেলেরা অনবরত ঠাট্টা ইয়ার্কি করতো তার সঙ্গে, তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করতেও ছাড়তো না।

কিন্তু মল্লিকার ওসব কিছুই ছিল না—সে কখনো কারুর সঙ্গে চড়া সুরে কথা বলেনি, সবার সঙ্গেই সে হেসে হেসে কথা বলতো, তবু ছেলেরা সমীহ করতো মল্লিকাকে। এমন কি ফিজিক্স-এর দিবাকর ভালো ছাত্র হয়েও যার মতন কুৎসিত খিস্তি ও বখামি প্রেসিডেন্সি কলেজের আর কোনো ছাত্র নাকি কখনো করতে পারেনি, বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে যে-কোনো মেয়ের বুকে কুনুই দিয়ে ঠেলা মারা যার প্রধান খেলা—সেও কোনোদিন মল্লিকার ধার ঘেঁষেনি। তার একমাত্র কারণ, মল্লিকার অদ্ভুত সারল্য। পৃথিবীর এই সময়ের কোনো মেয়ের এমন সরলতা দেখার কথা কেউ যেন আশাই করেনি।

ছিমছাম পোশাক পরে আসতো মল্লিকা, কোনোদিন তাকে বেশী সাজগোজ করতে দেখা যায়নি, কোনোদিন কেউ তাকে ম্লান বা দুঃখিত দেখেনি। অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর খুশিতে সব সময় সে ঝলমল করছে। মিশতে গিয়ে ছেলেমেয়ের কোনো ব্যবধান তার ছিল না, সবার সঙ্গে হাসছে, গল্প করছে, কফি হাউসে গিয়ে তর্ক করছে। সব সময় মল্লিকার মাথায় নানারকম পরিকল্পনা গজ্‌গজ্ করতো, ওয়াল পেপার থেকে শুরু করে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সপ্তাহে একদিন গ্রামে গিয়ে চাষাদের লেখাপড়া শেখানো—দল মিলে ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসা কিংবা ব্যাণ্ডেল চার্চে পিকনিক—এইসব নিয়ে সে মশগুল। নিজেই উদ্যোগী হয়ে এর জন্য দল তৈরী করতো, কিন্তু মল্লিকা মোটেই পুরুষালি স্বভাবের মেয়ে নয়। একটা নরম, ফুরফুরে মেয়ে—পৃথিবীতে কোথাও যে কোনো অসৎ বা কুৎসিত ব্যাপার কিছু আছে, তাই যেন সে জানে না।

একবার চার-পাঁচটা ছেলে লাইব্রেরির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিল,

মল্লিকা যে কাছেই দাঁড়িয়ে, ওরা দেখতে পায়নি। একটা ছেলে তার বন্ধুকে ডাকার জন্য আদর করে একটা অত্যন্ত কুৎসিত খিস্তি উচ্চারণ করেছিল। মল্লিকা সেটা শুনতে পেয়ে ভারী অবাক হয়ে যায়। সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, হেমন্ত, তুমি এই মাত্র কি বললে? ও কথাটার মানে কি? মানে না জেনে মল্লিকা সেই কুৎসিত কথাটা উচ্চারণ করলো পর্যন্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজের বারান্দায় আর কোনোদিন কোনো মেয়ের মুখে ঐ রকম শব্দ শোনা যায়নি। মল্লিকা বারবার বলতে লাগলো, হেমন্ত, বলো না, কথাটার মানে কি? আগে কখনো শুনিনি! অন্য কোনো মেয়ের মুখে এরকম প্রশ্ন শুনলে সবাই ভাবতো ন্যাকামী। কিন্তু সবাই জানে, মল্লিকা সত্যিই কিছু বুঝতে পারছে না! যে-সব ছেলেরা অনবরত ঐ সব কথা উচ্চারণ করে—তারাও মল্লিকার মুখে ঐ কথাটা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো, যে-যার পালাতে পারলে বাঁচে। বাদলও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সে নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিল মল্লিকাকে।

অনেক শিশু যেমন দেরিতে কথা বলে, কিংবা ঠিক সময় হাঁটতে শেখে না—অনেক মেয়ের মধ্যেও ভালোবাসার তৃষ্ণা কিংবা শরীরের জ্বালা অনেক দেরিতে আসে। মল্লিকাও সেই রকম, ছেলেদের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে তার কোনো আড়ষ্টতা ছিল না—কিন্তু কোনো ছেলের সঙ্গে আড়ালে নিভৃতে দেখা করার ব্যাপারেও তার কোনো আগ্রহ ছিল না। ছেলেরাও বুঝেছিল, মল্লিকার সামনে যেমন অসভ্য ইঙ্গিত করা যায় না, তেমনি ওকে ভালোবাসাও যায় না। মল্লিকা বড় বেশী দূরের মানুষ। আর সব ছাত্রী-ছাত্রীদের থেকে মল্লিকার দূরত্ব অনেকখানি।

বাদল খুব আস্তে আস্তে মল্লিকার কাছাকাছি এসেছিল। ছেলেবেলা থেকেই বাদলের একটু এক-একা থাকা স্বভাব। খুব ছেলেবেলাতেই সে বাবাকে হারিয়েছে, দাদাদের সঙ্গে তার বয়সের দূরত্ব অনেক। সুতরাং তাদের বিশাল বাড়িতে সে ঘুরেছে একা-একা। তার কোনো বিশেষ বন্ধুবান্ধবও ছিল না। তার চোদ্দ পনেরো বছর বয়েসের সময় তার একটা কঠিন অসুখ হয়। ভয়ংকর ধরনের টাইফয়েডে সে একেবারে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, যদি বা সেরে উঠলো, তবুও শরীর-মনে একটা বড় চিহ্ন রেখে গেল। বাদলের পা দুটো এমন দুর্বল হয়ে পড়লো যে সে আর দাঁড়াতে পরতো না, স্মৃতিশক্তিও এমন দুর্বল হয়ে পড়লো যে বাদল কোনো কথাই বেশীক্ষণ মনে রাখতে পারতো না সে-সময়। তখনও কাকাদের সঙ্গে বাড়ি ভাগাভাগি হয়নি, ছোটকাকা বাদলকে যত্ন করে তাঁর মিহিজামের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন শরীর সারাবার জন্য। বাড়ির সবাই আশংকা করেছিল, বাদল সারা জীবন একটা অশক্ত জড় হয়ে পরের বোঝা হিসেবে বেঁচে থাকবে। অন্যের

সাহায্য ছাড়া সে উঠে দাঁড়াতে পারে না, সকালে কি খেয়েছে বিকেলে ভুলে যায়। স্কুলে বাদল ভালো ছাত্র ছিল, কিন্তু পড়াশুনো সব ঘুচে গেল।

অবিশ্বাস্য ভাবে বাদল আবার আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠতে লাগলো। পায়ে আবার জোর পেল, স্মৃতি তীক্ষ্ণ হতে লাগলো ক্রমশ। প্রায় তিন বছর বাদে যখন আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দাঁড়ালো, তখন তার চেহারা আগের চেয়েও অনেক সবল আর সুন্দর, তার মস্তিষ্ক আগের চেয়েও মেধাবী। আবার পড়াশুনো শুরু করলো, স্কুল ফাইন্যালে ফিফথ স্ট্যাণ্ড করে সে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলো।

কিন্তু স্ট্যাণ্ড করা ছেলে হয়েও বাদল সেজন্য কখনো গর্ব বোধ করতে পারতো না। বরং অন্য ছাত্রদের চেয়ে সে বয়েসে খানিকটা বড় বলে সব সময় লজ্জা বোধ করতো। কলেজেও তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়নি, নানান ছাত্র দলের সঙ্গে মিশে সে নিজেকে ওদের সমান করতে চাইতো, ক্রমশ সে মল্লিকার সংস্পর্শে চলে এলো। মল্লিকার আনন্দে উদ্ভাসিত মুখ, সব রকম কাজে দারুণ উৎসাহ—এই অদম্য প্রাণশক্তিই টেনেছিল বাদলকে। মল্লিকার সঙ্গে তার একটাও ভালোবাসার কথা হয়নি। কোনোদিনই গাঢ় স্বরে আলাপ হয়নি নিরালায়, তবু একদিন দেখা গেল, একদল ছাত্রছাত্রী মিলে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে—কখন যেন মল্লিকা আর বাদল খানিকটা আলাদা হয়ে গেছে—ওরা দুজনে কি গল্পে যেন বিভোর, মল্লিকাই বেশী কথা বলছে, বাদল শুনছে। এক সময় মল্লিকা বললো, এই ডানদিকের রাস্তায় আমাদের বাড়ি, আসবেন আমাদের বাড়িতে? আসুন না—

তখনও শরীরের তৃষ্ণা জাগেনি মল্লিকার, প্রথমে শুধু ভালোবাসা জাগলো। বাইশ বছর বয়সে একটি মেয়ের প্রথম ভালোবাসার বোধ—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিল মল্লিকাকে। এতদিন ছিল সকলের মধ্যে ছড়ানো—এখন সে শুধু বাদল ছাড়া আর কিছুই জানে না। একটু ক্ষণের জন্যও সে ছেড়ে থাকতে পারে না বাদলকে, বাদল যেন তার পুতুল খেলার পুতুল, দাড়ি কামাতে গিয়ে কোনো দিন বাদলের গাল কেটে গেলে সে রেগে ওঠে, বাদলের জামায় একটু ময়লা লাগলে সে সহ্য করতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাদলের সঙ্গে বসে আবোল-তাবোল বকে যায়—কোনোদিন সে বাদলের শরীরের সঙ্গে ঘনিষ্ট হতে চায়নি, কোনোদিন বাদলের ঠোঁটে ঠোঁটে ছোঁয়াতে চায়নি। বাদলও চায়নি।

মল্লিকাকে পেয়ে বাদল যেন তার জীবনের এবং বেঁচে থাকার একটা উদ্দেশ্য পেয়ে গিয়েছিল। এতদিন তার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, সে লেখাপড়া শেষ করবে, চাকরি করবে, অর্থ উপার্জন করবে, দাদাদের মতন একদিন বিয়েও হবে, সন্তান হবে—শুধু এই, কিন্তু শুধু এইগুলোই যেন একটা জীবনের পক্ষে নিছক অর্থহীন।

অথচ এ ছাড়া আর কিভাবে জীবনটা পরিপূর্ণ করে তোলা যায়—বাদল ভেবে পেতো না।

মল্লিকা তার সমস্ত দ্বিধা-সংশয় একটানে উড়িয়ে দিল। বাদল বুঝতে পারলো, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে আনন্দ খুঁজে নিতে পারলেই বেঁচে থাকা সার্থক হয়ে ওঠে। আর সেই আনন্দ সবচেয়ে গ্লানিহীন হয়, যদি স্বার্থপরতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা যায়। অন্যদের আনন্দ দেবার কথা ভাবলেই নিজের আনন্দ সবচেয়ে গাঢ় হয়ে উঠতে পারে। মল্লিকা ঠিক তাই করতে চাইতো। বাদলও মল্লিকার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিল।

বিবেকানন্দ রোডের কাছাকাছি মল্লিকাদের বাড়ি। মল্লিকার বাবা রাসবিহারী সরকার একজন ব্যর্থ আদর্শবাদী। যথেষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিলেন, তার অনেকটাই উড়িয়েছেন আদর্শবাদের তাড়নায়। দেশ থেকে জাতিভেদের কুপ্রথা ঘোচাবার জন্য তিনি প্রতি সপ্তাহে একদিন মুচি, মেথর, মুসলমান, ডিমওয়ালাদের নেমন্তন্ন করতেন—সেই সঙ্গে ডাকতেন নিজের আত্মীয়-স্বজনদের—সকলের খাবার ব্যবস্থা একসঙ্গে—একটা হৈ হৈ কাণ্ড হতো এই নিয়ে। মুচি-মেথররাও বিব্রত হয়ে কিছুতেই বসতে চাইতো না। ভদ্রলোকেরা কেউ বসতেন, কেউ রাগারাগি করতেন—দু-তিন বছর এ রকম চলেছিল, তাতে জাতিভেদ প্রথার কিছুই সুরাহা হয়নি, কিন্তু লোকের বেশ একটা হাসাহাসির ব্যাপার হয়েছিল। গ্রামের চাষীদের জামা-কাপড় পরাবার পরিকল্পনা নিয়েও তিনি অনেক অর্থদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর ইঁটের কারখানা, ভারতীয়দের বেশী মাংস খাওয়া উচিত—এই আন্দোলন, কোনোটাই সফল হয়নি। লোকের কাছে তিনি পাগলাটে আর বাতিকগ্রস্ত লোক হিসেবেই পরিচিত হয়ে রইলেন।

রাসবিহারীবাবুর একটা দুঃখ ছিল তাঁর, কোনো ছেলে হয়নি। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি যে-সব কাজে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁর ছেলে হলে সেগুলো সার্থক করার ভার নিতে পারতো। তিন মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে একটি মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে—তারা দুজনেই এখন আছে ক্যানাডায়—কালেভদ্রে চিঠি লেখে। মেজ মল্লিকা অনেকখানি বাবার স্বভাব পেয়েছে। ছোট বল্লরী আবার অন্য রকম।

বাদল যখন মল্লিকার সঙ্গে প্রথম ওদের বাড়িতে যায়, তখন বল্লরী স্কার্ট পরে, মাঝে মাঝে শখ করে শাড়িও পরে দু-একদিন। সেই বয়েস থেকে বল্লরী একটু বেশী জেদি আর অহংকারী। এমনিতে খুব সরল মেয়ে, কিন্তু একবার জেদ ধরলে সে কারুর কথা শুনবে না। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জড়ো করে মল্লিকা যখন কবিতা আবৃত্তি শেখায়, বল্লরী তখন ছাদে উঠে ছেলেদের মতন ঘুড়ি ওড়াতে

ভালোবাসে। সাজ-পোশাকের দিকেও একটু বেশী মনোযোগ বল্লরীর, রেডিওতে ইংরাজী বাজনা শুনে শুনে নাচ অভ্যাস করে। মিশনারি স্কুল থেকে সে আরও অনেক কিছু শিখেছে। একদিন বাড়ি ফিরে বলেছিল, জানিস দিদি, আমি শিস দিতে শিখে গেছি, শুনবি? এবার থেকে ছেলেরা আমাকে দেখে শিস দিলে আমিও শিস দেবো। মল্লিকা অবাক হয়ে বলেছিল, সে কিরে! ছেলেরা তোকে দেখে শিস দেবে কেন? বল্লরী মুচকি হেসে বলেছিল, কি জানি! দেয় তো রোজই—

বাদল ঠিক বুঝতে পারতো না, একটি মেয়ের বন্ধু হিসেবে একটি ছেলে রোজই তার বাড়িতে আসতে পারে কি না! তার বন্ধুবান্ধবদের টুকরো টুকরো কথায় সে শুনেছে, বাংলাদেশে এটা ঠিক সম্ভব নয়! অথচ, মল্লিকাদের বাড়িতে তার কোনো অস্বস্তিই হয়নি কখনো। মল্লিকাদের বাড়িতে গিয়ে সে কারুকে ডাকতো না, সোজা উঠে যেত দোতলায়—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল সে সব। রাসবিহারীবাবুও বাদলকে খুব পছন্দ করতেন । দু-একদিন না গেলে তিনি নিজেই ব্যস্ত হয়ে খোঁজ করতেন বাদলকে। বল্লরী তার কাঁধ ধরে ঝুলে পড়ে বলেছে, বাদলদা, গ্রেগরি পেকের একটা বই এসেছে মেট্রোতে। দেখাবেন? দেখান না! মল্লিকার মায়ের ছিল হাঁপানির অসুখ। তাঁকে বাদল বরাবর বিছানার শুয়ে থাকতেই দেখেছে। ওদের এক পিসীমা—পিসেমশাই ও বাড়িতেই থাকতেন, বাদল তাঁদেরও কোনোদিনও মুখ ভার দেখেনি।

সুতরাং, এক বর্ষা ঋতুতে মল্লিকাদের বাড়ির সবাই যখন ওদের গ্রামের বাড়ি দেউলটিতে বেড়াতে যাচ্ছিল, তখন রাসবিহারীবাবু বাদলকেও যেতে বললেন, বাদল সেটা কিছুই অস্বাভাবিক মনে করেনি। তাছাড়া, মল্লিকাকে ছেড়ে পনোরো দিন কলকাতায় থাকার কথা সে ভাবতেও পারতো না।

আঃ, কি সুখের দিন ছিল তখন, বাদল কিনা সেটা নিজের হাতে নষ্ট করে দিল? অত আনন্দ সে আর কখনো পায়নি তার জীবনে, অত দুঃখও সে আর কখনো পায়নি!

দেউলটি গ্রামে মল্লিকাদের বাড়িটা ছিল বিশাল—তার অনেক অংশ ভেঙে পড়েছে, ভাঙা থাম আর খিলানের মধ্য থেকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে বট-অশ্বত্থ গাছ। একটা দিক এখনো বাসযোগ্য, সেদিকেও অন্তত ১৪-১৫টা ঘর, অধিকাংশ ঘরই বহুকাল খালি পড়ে আছে—এইসব বাড়ির আবহাওয়ার একটা রহস্যের মাদকতা আছে।

বাড়ি থেকে মিনিট সাতেক হেঁটে গেলেই নদী, বিশাল রূপনারায়ণ। তখন বর্ষাকাল, প্রায় এপার-ওপার দেখা যায় না। গ্রামে আর কিছুই দেখার নেই, সব রাস্তায় প্যাচপেচে কাদা, একদিন সেই কাদা ভেঙেই ওরা অদূরে সামতাবেড়ে

শরৎচন্দ্রের বাড়ি দেখে এসেছিল।

বেশীর ভাগ সময় ওরা নদীর পারেই কাটাতো। নদীর খাড়া পার যেখানে ঢালু হয়েছে সেখান থেকে অনেকখানি জায়গা এখনো জলে ডোবেনি—সেই জায়গায় ওরা সকাল-সন্ধ্যায় ছুটোছুটি করেছে তিনজনে, রাত্রে একটা বিশাল চাঁদ উঠলে ওরা কোরাসে গান গেয়েছে গলা মিলিয়ে। এখানে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়, এখানে চোখের সামনে এক স্বাস্থ্যবতী নদী, এখানে মন সব রকম বাধামুক্ত হয়ে যায় সহজেই। হঠাৎ ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামলে ওরা ছুটে গিয়ে বাড়ি পৌঁছুবার আগেই সম্পূর্ণ ভিজে জুবজুবে হয়েছে! এমন তেজী দুরন্ত বৃষ্টিও বুঝি বাদল আগে কখনও দেখেনি।

মল্লিকাদের বাড়ির পিছন দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে সাঁওতালদের বস্তী। এখানে সাঁওতাল থাকার কথা নয়, কিন্তু কবে হয়তো এরা রেলের লাইন বসাতে কিংবা রাস্তা বানাবার কাজে কুলিকামিন হয়ে এসেছিল, তারপরই এখানেই থেকে গেছে। কিছু ছাগল, মুর্গী, মোষ, শুয়োর নিয়ে মানুষগুলো থাকে—ডিম আর মাংস বিক্রিই ওদের পেশা, কখনো-সখনো মজুরের কাজও করে। গ্রামে এলেই রাসবিহারী বেশীর ভাগ সময় ওদের মধ্যে কাটান, এখন বয়েস হয়েছে তাঁর, তবুও আদর্শবাদের বাতিক ঘোচেনি। সকাল বেলা সাঁওতাল বস্তীতে ঢুকে রাসবিহারী হাঁক দেন, মধুয়া, এই মধুয়া—

বুড়ো মতন একজন সাঁওতাল বেরিয়ে আসে, লোকটার চুল সব পেকে গেছে, কিন্তু শরীরটা এখনো গড়া-পেটা, চেহারা দেখলে বোঝা যায়, ওর শরীর এক বিন্দু চর্বি নেই—অন্যান্য সাঁওতালদের তুলনায় লোকটা বেশ লম্বা, তাই একটু ঝুঁকে দাঁড়ায়। রাসবিহারীকে দেখে সে এক গাল হেসে, বলে, বাবু, আইছিস্! তু তো বহুৎদিন ইদিকে আসিস্ নাই। তুর বিটি দুটো তো বেশ ডাগর হইছে!

মোড়া পেতে বসেন রাসবিহারী। অনেক এসে ভিড় করে তাঁর চারপাশে। এদের জন্য প্রায়ই তিনি কিছু না কিছু জিনিস নিয়ে আসেন। একটা ছোট ছেলে মাটি থেকে কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে—হাতের ছড়ি তুলে সেই দিকে দেখিয়ে মল্লিকাকে বললেন, দেখেছিস, মিলু, দেড় বছর কি দু' বছরের ছেলে—কোনো যত্নআত্তি নেই—ধুলো ময়লা মুখে ভরছে, তবু স্বাস্থ্যখানি কি সুন্দর! আমাদের শহরের সব আধুনিক মায়েরা কত যত্ন করেন ছেলেপুলেদের, তবু সব কাঠি-কাঠি চেহারা—আর এরা বিনা যত্নেই এ রকম.....খাঁটি রক্ত তো—এর পর যদি আর একটু যত্ন পেতো—কত ভালো ভালো মানুষ বেরুতে পারতো এদের মধ্য থেকে! এই, আয় তো এদিকে, আয়, আয়—

বাদলও পাশে দাঁড়িয়েছিল। দেখলো, রাসবিহারী অবলীলাক্রমে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন. তারপর ছেলেটাকে আদর করতে বললেন, সবই ভালো, শুধু পেটটা বড় হয়ে গেছে, এর মা কোথায়? ডাক্ এর মাকে!

তারপর রাসবিহারী শিশু পালনের সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন ওদের। রাসবিহারীর চাকর পিছনে একটা থলি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল—খানিক বাদে সে থলি উপুড় করে দিতেই চারটে বড় বড় মুর্গী বেরুলো। কলকাতা থেকে আনা হয়েছে এই চারটি লেগ হর্ণ, ধবধবে সাদা স্বাস্থ্যবান মুর্গী—রাস বিহারীর ইচ্ছে সাঁওতালরা তাদের দিশি মুর্গীর সঙ্গে এগুলোকে মিলিয়ে নতুন জাতের মুর্গী তৈরী করুক—তাতে ওদের ডিম আর মাংসের উৎপাদন অনেক বেশী হবে!

বাদলের মনে পড়লো, তাদের নিজেদের বাড়ির পাশে যে বস্তী সেটা দেখে তার বহুদিনের মনে হয়েছে, সেখানে মানুষ আর পশুর জীবনযাত্রার কোনো প্রভেদ নেই। সে-সব দেখে বাদল লজ্জিত ও দুঃখিত বোধ করেছে। কিন্তু তাদের দুরবস্থা দূর করার কোনো উপায় সে নিজে ভেবে পায়নি। সে নিজে গিয়ে ওদের কোনো সাহায্য করবে, ওদের লেখাপড়া শেখাবে বা স্বাস্থ্যের নিয়ম বোঝাবে—এটা যেন অসম্ভব ব্যাপার। তার ধারণা ছিল, সে রকম করতে গেলে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এবং সেও নিজে ওদের জন্য বিশেষ কিছুই করতে পারবে না। অথচ, এখানে সে দেখলো, রাসবিহারীকে বেশ মানিয়ে গেছে, মনে হচ্ছে না বাড়াবাড়ি কিংবা পাগলামি—মনে হচ্ছে এতে এই সাঁওতালগুলোর সামান্য উপকার হলেও হতে পারে।

বিকেলবেলা নদীর পাড়ে বেড়াতে বেড়াতে মল্লিকা আর বাদল এই বিষয়েই আলোচনা করছিল। বল্লরী পাশে পাশে চুপ করে হাঁটছে। বর্ষার ভরা নদীর ঢেউ ভেঙে পড়ছে পাড়ে—একটা স্পিড বোট চলে যেতেই ঢেউ আরও অশান্ত হয়ে উঠলো। আকাশে নিকষ কালো মেঘ থমথম করছে। যে-কোনো মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে।

একবার থেমে বাদল বললো, ঝড় উঠতে পারে। আর এগুবে? মল্লিকা বললো, উঠুক না ঝড়, ঝড় তো আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে না! বাদল হাসতে হাসতে বললো, তা বলা যায় না, ঝড় যদি উড়িয়ে আমাদের নদীতে নিয়ে ফেলে? যা ঢেউ নদীতে—

মল্লিকা বললো, কেন, তুমি সাঁতার জানো না?

—তা জানি! কিন্তু তুমি জানো তো?

—না, আমি জানি না! তা হলেই বা, যদি নদীতে পড়ে যাই, তুমি তখন আমাদের

বাঁচাবে—খুকুও সাঁতার জানে না।

—কিন্তু, তোমাদের দুজনকে কি আর এক সঙ্গে বাঁচাতে পারবো?

বল্লরী হঠাৎ বললো, বাদলদা আপনি আর দিদি যান্, আমি বাড়ি ফিরে যাই।

বাদল জিজ্ঞাসা করলো, কেন?

বল্লরী একটু মুচকি হেসে বললো, আপনি আর দিদি একটু একসঙ্গে বেড়ান না—আমি বাড়িতে গিয়ে বাবার সঙ্গে গল্প করি—

বাদল হঠাৎ অনুভব করলো, এতক্ষণ সে আর মল্লিকা গল্পে একেবারে মশগুল হয়ে ছিল। বল্লরীর দিকে মনোযোগেই দেয়নি। বল্লরী তাই ওদের আলাদা হবার সুযোগ দিতে চাইছে। মল্লিকা সেটা খেয়াল করলো না, সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন, তুই চলে যাবি কেন? তোর ভালো লাগছে না?

—না, আমার বেড়াতে আর ভালো লাগছে না। হেঁটে হেঁটে পায় ব্যথা হয়ে গেল।

তুই এখান থেকে একা যাবি কি করে? চল্ তাহলে আমরা সবাই ফিরি—আমার কিন্তু বেড়াতে বেশ ভালোই লাগছে।

—তোমরা যাও না! আমি একা ঠিক যেতে পারবো!

বাদল বললো, না, না, একা যেও না—চলো তোমাকে আগে পৌঁছে দিয়ে আসি তারপর আমরা না হয় আবার বেরুবো—

—কোনো দরকার নেই।

বল্লরী আর কিছু না বলে পিছন দিকে দৌড়োতে শুরু করলো। সাদা ফ্রক পরা হালকা শরীরে বল্লরী যেন বাতাসের সঙ্গে উড়ে গেল ফুরফুর করে। সেদিকে কিছুক্ষণ ওরা তাকিয়ে থাকবার পর মল্লিকা বললো, খুকু ঠিক পৌঁছে যাবে, ও যা জোরে দৌড়োয়, স্কুলে স্পোর্টসে প্রত্যেক বার প্রাইজ পায়।

আবার হাঁটতে লাগলো ওরা দুজনে। গ্রাম শেষ হয়ে গেছে, চওড়া নদীর পার, পাশে ধান ক্ষেত, আস্তে আস্তে সন্ধ্যে নেমে আসছে। কোথাও কোথাও নদীর পাড় বেশ নরম, পা ডুবে যায়—কিন্তু মল্লিকার কোনো ভয় নেই। ঝড় আসি আসি করেও আসছে না—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে, প্রতিবার বিদ্যুতের খানিকটা পরে মেঘের গুরুগুরু আওয়াজ। যাতে হোঁচট খেয়ে না পড়ে যায় মল্লিকা, এই জন্য বাদল তার একটা হাত ধরে রেখেছে, নরম উষ্ণ হাত, হঠাৎ বাদলের শরীরটা শিরশির করে উঠলো। মল্লিকাকে তার এমন রমণীর আর প্রিয় মনে হলো—যেন এক্ষুনি মল্লিকার শরীরটা তার বুকের মধ্যে মিশিয়ে না নিলে সে কিছুতেই শান্তি পাবে না।

বাদল ব্যগ্রভাবে মল্লিকার মুখের দিকে তাকালো। সেখানে কোনো আহ্বান নেই। মল্লিকা যেন একটা শিশু—এই নদী, এই মন্থর সন্ধ্যা ও হু-হু করা বাতাস, এই

বিদ্যুৎচমক— এই সবগুলো সে এমনভাবে উপভোগ করছে যেন অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন আর তার নেই। অথচ বাদল এখন আর নদী দেখছে না, আকাশ দেখছে না, শুধু মল্লিকাকে দেখছে। এই প্রথম, শুধু মল্লিকার সারল্য বা অনাবিল কথাতেই মুগ্ধ না হয়ে মল্লিকার শরীরের জন্য একটা দারুণ টান অনুভব করল। কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো চিন্তা বা যুক্তি তার মাথায় এলো না, আস্তে আস্তে পরিকল্পনা করে যে সে মল্লিকার শরীরের দিকে এগুবে, সে চেষ্টাও করলো না। চট্ করে থেমে দাঁড়িয়ে ও মল্লিকার হাত ধরে সামান্য টান দিল। মল্লিকা ঝোঁক সামলাতে না পেরে ওর বুকের ওপর পড়ে গিয়ে অবাক হয়ে বললো, ও কি! ও কি করছো!

বাদল বললো, মল্লিকা, তোমাকে আজ দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে। আমার এত ভালো লাগছে, ইচ্ছে করছে, তোমাকে একটু আদর করি।

—কেন?

—কেন আবার কি? আদর করতে ইচ্ছে করছে এমনই, তোমাকে·····

—ধ্যাৎ পাগল!

মল্লিকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, আর বেড়াবে না? চলো, তাহলে ফেরা যাক্! বাদল যেন বুকে একটা আঘাত পেল। তার বলতে ইচ্ছে হলো—মল্লিকা, আমার কষ্ট হচ্ছে খুব বুকের মধ্যে, তুমি আমকে কষ্ট দিয়ো না। তুমি তো কারুকে কষ্ট দিতে চাও না!—কিন্তু একথা সে মুখ ফুটে বলতে পারলো না।

ফেরার পথে বাদল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। মল্লিকা কথা বলে যাচ্ছে—কিন্তু বাদলের তা আর শোনার দিকে মন নেই। বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতা সে কিছুতেই দমন করতে পারছে না। আলতোভাবে সে মল্লিকার কাঁধে একটা হাত রাখলো, তারপর তার অজান্তেই হাতটা একটু এগিয়ে মল্লিকার গাল ছুঁলো। এখন সন্ধ্যে বেশ গাঢ়, মেঘ ভেদ করে চাঁদ উঠতে পারেনি, চতুর্দিকে একটা নিবিড় ছায়া, নদীটাকেও দেখা যায় না শুধু শোনা যায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মল্লিকার মুখও বাদল দেখতে পেল না—কিন্তু তার কথা শুনে মনে হলো, বাদলের হাত তার গালে ছোঁয়াতেও তার কোনো ভাবান্তর হয়নি। বাদল আবার একটু কষ্ট পেল। মল্লিকা বললে, জানো বাদল, আমি আর্টস পুড়ে খুব ভুল করেছি। ডাক্তারি পড়লে খুব ভালো হতো। ইস্, বাবা কেন যে আমাকে ডাক্তারি পড়তে বলেননি—

মল্লিকার একথা বাদল যেন শুনলোই না—অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে উঠলো, মল্লিকা, তোমার সঙ্গে কখনো যদি আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তাহলে আমার জীবনটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে। আমি যে তখন কি করবো—

মল্লিকা অবাক হয়ে বাদলের দিকে ফিরে বললো, ছাড়াছাড়ি হবে কেন? একি পাগলের মতন কথা?

—যদি কোনো কারণে হয়।

—কেন হবে? তুমি ঝগড়া করতে চাইলেও আমি করবো না। তোমাকে আমি যেতেই দেবো না কখনো।

তুমি বিয়ে করবে না কখনো? যদি তোমার বিয়ে হয়ে যায়?

মল্লিকা খিলখিল করে হেসে বললো, বিয়ে? তুমি বুড়োদের মতন বিয়ের কথা ভাবতে আরম্ভ করছো বুঝি?

—বুড়োরাই বুঝি বিয়ে করে?

মল্লিকা আবার হাসতে হাসতে বললো, যাঃ, আমি বুঝি তাই বলেছি? বুড়োরা বিয়ে করবে কেন? কিন্তু বুড়োরাই তো অন্যদের বিয়ের কথা নিয়ে সব সময় ভাবে।

—আমি এক্ষুনি বিয়ের কথা বলছি না। কিন্তু কোনো একদিন তো তোমায় বিয়ে হবেই—তুমি তো চিরকাল আর এ রকম ছেলেমানুষ থাকবে না।

মা তাহলে ঠিকই বলেছিলেন।

—কি বলেছিলেন তোমার মা?

—মা একদিন বাবাকে বলেছিলেন, বাদল বিয়ের কথা কিছু বলে নি? বাবাও বললেন, হ্যাঁ, বাদলের সঙ্গে মিলুর বিয়ে হলে বেশ হয়। আমি তো শুনে হেসে বাঁচি না।

—তুমি শুধু হাসলেই। আর কিছু বলোনি?

—আমি বলেছি, না, আমি বিয়ে-টিয়ে করবো না কখনো।

—সত্যি?

—তা বলে, তোমাকেও বিয়ে করতে দেবো না কখনো। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে তা আমি সহ্য করতে পারবো না, কিছুতেই পারবো না তাছাড়া—

—তাছাড়া?

—না, সে কথা এখন বলবো না, যাও।

আকস্মিক ভাবে বাদলের বুকটা অদ্ভুত রকমের হাল্কা হয়ে গেল। পাতলা বাষ্পের মতন একটা আনন্দ যেন ছড়িয়ে পড়লো তার সারা দেহে। এতক্ষণ মল্লিকার শরীরটা খুব কাছে পাওয়ার জন্য যে ছটফটানি সে বোধ করছিল, সেটাও চলে গেল। খুব সহজেই মল্লিকার হাতটা শুধু ছুঁয়ে হাঁটতে বেশ ভালো লাগলো তার।

সাঁওতাল পল্লীতে রাসবিহারীর আদর্শবাদ এবারও বেশ ঘা খেলো। প্রতি বছরই বর্ষার সময় এখানে কলেরা হয়। দশ-বারো জন মারা যায়—সে সব ওদের গা-সহা। রাসবিহারী শুধু পরামর্শ দিয়েছিলেন কুয়োর জল ফুটিয়ে খেতে। তবু মধুয়ার বাড়ির সেই স্বাস্থ্যবান বাচ্চাটার কলেরা হতেই সবাই ফোটানো জলকেই দায়ী করে বসলো। একদিনের অসুখে মরে গেল ছেলেটা। মধুয়ার চেয়েও বেশী কাঁদলেন

রাসবিহারী নিজে। মুর্গী পলিকল্পনাও ভেস্তে গেল। টালিগঞ্জ পোলট্রির শৌখিন লেগ হর্ণ মুর্গী সাঁওতাল পাড়ার আবহাওয়া সহ্য করতে পারল না। দুটো মরে গেলেই পরদিনই—সুতরাং সাঁওতালরা চারটেকেই ধরে আগুনে ঝলসে একটা উৎসব করে ফেললো। এর পরেই রাসবিহারী নিজে জ্বরে পড়লেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন মল্লিকা উঠে পড়ে সাঁওতালদের সেবা করতে লাগলো। মিউনিসিপ্যালিটির লোক কলেরার ইঞ্জেকশান দিতে এলে সাঁওতালরা বেঁকে বসেছিল, মল্লিকা বোঝাতে লাগলে তাদের, ফিনাইল ছড়ানো এবং ওষুধ-পত্তর বেলানোর কাজে মল্লিকা একেবারে মেতে উঠলো—রাসবিহারীর চেয়েও মল্লিকাকে বেশী পছন্দ করে সাঁওতালরা। বাদল সাহায্য করতে লাগলো মল্লিকাকে, সব সময় সে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে—মাটির দাওয়ায় বসে মল্লিকা যখন কোনো শিশুকে দাঁত মাজতে শেখায়—তখন সেই দৃশ্য দেখে বাদল কৌতুক মেশানো অপূর্ব আনন্দের স্বাদ পায়। মনে মনে সে এখন বুঝতে পারে, এসব সত্যিই ছেলেমানুষী; এইভাবে কেউ কোনোদিন এসব লোকদের উপকার করতে পারেনি—এসব রোমান্টিক শখ ছাড়া আর কিছু না—তবু কেউ এর থেকে আনন্দ পাচ্ছে, সেটাই বা কম কি।

বল্লরী সাধারণত এসব জায়গায় যেতে চায় না। সাঁওতালদের পোষা শুয়োরগুলো দেখলেই সে কুঁকড়ে যায়, ঠিক ভয়ে নয়—তার বিষম ঘেন্না করে। সব সময় ফিটফাট পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে বল্লরী, তার সুঠাম কিশোরী শরীরে কোনো সময় মলিনতা থাকে না, মল্লিকার মতন টপ করে মাটির দাওয়ায় বসে পড়তেও পারে না সে। বাদল বুঝতে পারে, বল্লরী তো এখনো ছেলেমানুষ, তার খেলাধূলো আর ছোটোছুটিই বেশী ভালোলাগার কথা, সমাজ-সেবা-টেবার ব্যাপারে তার বেশী আকর্ষণ না থাকলে সেটাকে খুব অস্বাভাবিক বলা যায় না। তা ছাড়া, বাবার সঙ্গে মল্লিকার যতখানি মিল—বল্লরীর ততখানি নয়—এই বয়সেই তার চরিত্রে কি রকম যেন একটা রহস্য এসেছে। সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পরীক্ষা দিয়েছে বল্লরী, রেজাল্ট বেরুলেই সে কলেজে ভর্তি হবে, এর মধ্যেই তার একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে মনে হয়।

বাদল আর মল্লিকা যখন বেরিয়ে যায়, বল্লরী তখন অনেকটা একা হয়ে পড়ে। সে মিশনারি স্কুলে পড়ে, গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তার রুচিতে মেলে না একটুও। এই গ্রামের বাড়িতে ওদের এক দূর সম্পর্কের কাকা তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকেন, সেই কাকার ছেলেমেয়েরা সব সময় বল্লরীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে—তার বন্ধু হতে পারে না কিছুতেই। মল্লিকা ওদের কাছে অনায়াসই দিদি হয়ে যায় কিন্তু বল্লরী দূরে দূরে থাকে।

মল্লিকার কাকার কাছ থেকে একটা সাইকেল ধার করে বাদল স্টেশনে যাচ্ছিল

কয়েকটি জিনিস কেনার জন্য, বল্লরী ধরে বসলো সেও তার সঙ্গে যাবে। বাদল একটু ইতস্তত করে বললো, রাস্তায় যা জল কাদা, তোমাকে পেছনে বসিয়ে কি সাইকেল চালাতে পারবো? বল্লরী সঙ্গে সঙ্গে অভিমান করে বললো, নিয়ে যাবেন না তাই বলুন। দু'দিন বৃষ্টি হয়নি, রাস্তায় আবার কাদা কোথায়।

—কিন্তু গ্রামের রাস্তা তো, অনেকদিন আমার সাইকেল চালানো অভ্যেস নেই যে।

—তা হলে আপনি পেছনে বসুন, আপনাকে আমি ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছি। আমি ভালো সাইকেল চালাতে পারি!

—ইস্! তা হলে আর দেখতে হবে না, রাস্তার দুধারে ভিড় জমে যাবে! ঠিক আছে চলো, যদি আছাড় খাই একসঙ্গে, তা হলে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।

মেরুন রঙের সিল্কের স্কার্টটা পরে বল্লরী সাইকেলের পেছনে বসে বাদলের কোমর জড়িয়ে ধরলো। মোজার মধ্যে প্যান্ট ঢুকিয়ে পায়ে ক্লিপ আটকে বাদল রীতিমত তৈরি হয়ে নিয়েছে। দু'দিন বৃষ্টি না হলেও রাস্তায় একটু একটু কাদা রয়েছে, কিন্তু সাইকলে চালাতে খুব অসুবিধে হলো না।

তবে, একটু বাদেই বাদল টের পেল, রাস্তার লোকেরা সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে এবং নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছে। বাদলের অস্বস্তি লাগতে লাগলো। এটা গ্রাম হলেও খুব একটা এঁদো পাড়াগাঁ নয়, কলকাতা থেকে ট্রেনে মাত্র দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার রাস্তা, অনেকে এখান থেকেই কলকাতার অফিসে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। সুতরাং কলকাতার হাওয়া বেশ লেগেছে এখানকার জীবনে, তবু বল্লরীর মতন কোনো মেয়েকে কোনো যুবকের সঙ্গে সাইকেলে চড়ে যেতে কেউ দেখেনি আগে বোধহয়। বয়সের তুলনায় বল্লরীর শরীর অনেক বাড়ন্ত।

বাদল আর একটা জিনিসও টের পেল। সাইকেলটার গতি সাবলীল নয় বলে, সম্ভবত পড়ে যাওয়ার ভয়ে বল্লরী তাকে ভালো করে আঁকড়ে ধরেছে। প্রথমে বল্লরীর শরীরের উত্তাপ যতখানি ছিল, তার থেকে ক্রমশ বাড়ছে, বাদলের পেটের কাছে ধরা বল্লরীর হাত এখন গনগনে গরম, এবং মাঝে মাঝেই তার পিঠে এসে ঠেকছে বল্লরীর বুক। আগে বল্লরী তাকে কতবার পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরেছে, বাদল এসব কিছুই খেয়াল করেনি, একটা দুরন্ত শিশু হিসেবে বল্লরীকে সে আদর করেছে। কিন্তু দু'দিন আগেকার সেই সন্ধ্যেবেলা, মল্লিকার সঙ্গে আলাদা সন্ধ্যেবেলা, হাঁটবার সময় বাদল প্রথম শরীরের একটা তৃষ্ণা টের পেয়েছিল, কিছুক্ষণের জন্য সেই তৃষ্ণা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেও; পরদিন থেকে আবার সেটা জেগে উঠেছে, বুকের কাছে কারুকে আলিঙ্গন করার মাপের একটা শূন্যতা সে সব সময় অনুভব করে। আজও সাইকেল চালাতে চালাতে যতবাব বল্লরীর বুক এসে ছুঁতে লাগলো তার শরীর, ততবারই শিহরণ হলো—

কিন্তু প্রত্যেকবার মল্লিকার কথা মনে পড়তে লাগলো তার, মল্লিকাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করলো।

স্টেশনের কাছে একটা চায়ের দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিল ওরা দুজনে, বাদল সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, বল্লরী ওর মুখোমুখি—কয়েকটি ছেলে ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কয়েকটি কুৎসিত কথা বলে গেল। বেশ জোরে জোরেই বললো কথাগুলো, কোনোরকম লজ্জা কিম্বা ভয়ের ধার ধারে না। বাদল এসব ব্যাপারে খানিকটা অসাড়, পথে ঘাটে বখাটে ছেলেদের মুখে এসব গালগাল সে অনেক শুনেছে- কিন্তু কোনোদিন গ্রাহ্য করেনি, কোনোদিন প্রতিবাদ করেনি বা বা কান পেতে শুনতে চায়নি। আজ হঠাৎ তার কান লাল হয়ে গেল, সে রাগে উত্তেজিত হয়ে ছেলেগুলোর দিকে ঘুরে তাকালো। বাদল ঠাণ্ডা ধরনের ছেলে, কিন্তু রাগ হলে তার আর জ্ঞান থাকে না, তখন যা খুশী করতে পারে।

বাদল ছেলেগুলোকে কিছু বলার আগেই বল্লরী বললো, ইস্ এখানকার ছেলেগুলোও কলকাতার ছেলেদের সব অসভ্য কথা শিখে নিয়েছে! বিচ্ছিরি জায়গা! বাদল চমকে উঠলো। সেই মুহূর্তে তার মনে হলো, মল্লিকা হলে হয়তো বুঝতেই পারতো না ও কথাগুলো তার উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। কিংবা মল্লিকা থাকলে হয়তো ছেলেগুলো ওরকম কথা বলতোই না। কলকাতাতেও বাদল যে কদিন মল্লিকার সঙ্গে একা বেড়িয়েছে—কোনোদিন কোনো অচেনা ছেলের দলও তাদের উদ্দেশ্যে কোনো খারাপ কথা বলেনি। সত্যি, খুব আশ্চর্য তো ব্যাপারটা! অথচ বল্লরীর তুলনায় মল্লিকা কম সুন্দরী নয়। বাদল বললো, চলো, এখান থেকে এবার যাই, বল্লরী! আমারও গ্রামেরও থেকে কলকাতাই বেশী ভালো লাগে।

ফেরার পথে সত্যি সত্যি আছাড় খেয়ে পড়লো বাদল। চিটচিটে কাদায় সাইকেলটা আটকে আটকে যাচ্ছিল, তবু তার মধ্যেই জোরে প্যাডেল করতে গিয়ে হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। বল্লরী খুব স্মার্ট, মাটিতে পড়ার আগেই সে লাফিয়ে নেমে পড়েছে, বাদলের জামা-কাপড় একেবারে কাদায় মাখামাখি। বল্লরী তার হাত ধরে টেনে তুলতে গেল। শিশুর মতো একটানা হাসতে হাসতে বললো, ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, যেমন আসার সময় আমাকে ফেলে দেবার কথা বলছিলেন। আমার কিছু হলো না, আমায় কাদায় ফেলা এতসহজ নয়—আপনারই লাগলো! ওমা, আপনার গাল ভর্তি কাদা। বাদলের বাঁ হাতখানাও একেবারে কাদায় ডুবে গিয়েছিলো—কাদা মাখা হাতখানা তুলে সে হাসতে হাসতে বললো, তোমার জন্যই তো পড়ে গেলাম! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। বাদল জোর করে বল্লবীর গায়ে ছুঁয়ে দিল একটা কাদা মাখা আঙুল।

রূপনারায়ণের উপর দিয়ে নতুন ব্রীজ বানাবার কাজ শুরু হয়েছে। এখন কিছু

কিছু যাত্রী নৌকো এপার-ওপার করে। কিন্তু এই বর্ষার নদী এমন ভরাট যে ঢেউয়ের মাথায় মোচার খোলার মতন নৌকো দোলে। গত মাসে ঝড়ের মধ্যে একটা নৌকো উল্টে গেছে। এ সময় নৌকোয় চাপা নিরাপদ নয়—তবু বল্লরী একদিন আবদার ধরলো, চলুন বাদলদা, আমরা সবাই মিলে নৌকো চেপে কোলাঘাট বেড়িয়ে আসি। মল্লিকারও সমান উৎসাহ—বাদল ওদের দায়িত্ব নিতে একটু ইতস্তত করছিল। কিন্তু ওদের কাকার চেনা মাঝি খুব ভরসা দিল। দুপুর-দুপুর নৌকোয় চেপে বসলো ওরা। তিনজন জোয়ান মাঝি রয়েছে, বিশেষ ভয় নেই তবু মাঝ নদীতে যখন নৌকো বিষম দুলতে লাগলো—তখন বল্লরী আর মল্লিকা দুজনেই জড়োসড়ো হয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে বসলো বাদলের পাশে, দুজনে তার দু'হাত চেপে ধরলো। বাদলের হঠাৎ সব ভয় চলে গেছে, আজ আকাশে মেঘ নেই—মাথার উপর এই বিশাল চওড়া নীল আকাশ, চড়া রোদেও তেমন গরম লাগচে না। এই স্বাস্থ্যবান নদকে মনে হয় যেন সত্যিকারের জীবন্ত—বাদলের বুকের ভেতরটা অত্যন্ত পরিষ্কার লাগছে, কোনো গ্লানি নেই, কোনো ভয় নেই, জীবনটাকে এত নির্মল আর আগে কখনো মনে হয়নি তার। মল্লিকা বসেছে তার গা ঘেঁষে, মল্লিকার চুলের গন্ধ আসছে তার নাকে—মল্লিকার এত কাছাকাছি এল সে একটা পবিত্রতার স্বাদ পায়।

বল্লরী বললো, বাদলদা, নৌকোটা যা দুলছে, সত্যি যদি হঠাৎ উল্টে যায়?

মল্লিকা বললো, যদি যায় যাবে! কি সুন্দর পরিষ্কার টলটলে জল, এতে ভাসতে ভাসতে চলে যাবো—

বল্লরী বললে, ভ্যাট। সাঁতার না জানলে ভাসবো কি করে? ডুবে যাবে তো সঙ্গে সঙ্গে।

—ডুবে যাই যাবো, তারপর আবার তো ভেসে উঠবো।

—ততক্ষণে দম আটকে মারা যাবো না?

—এমন সুন্দর নদীতে ডুবে মরতেও আমার আপত্তি নেই। মরতে যখন একদিন হবেই—

বাদল বললো, সেই ভালো, আমরা সবাই মিলে এই নদীতে ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে চলে যাবো। তারপর সমুদ্র দিয়ে ভাসতে ভাসতে হয়তো আমাদের মৃতদেহ তিনটে জাপান কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ঠেকবে!

বল্লরী বললো, কিন্তু আপনি তো সাঁতার জানেন! আপনি মরবেন কি করে?

—আমি সাঁতার কাটবো না, হাত পা ছেড়ে তোমাদের সঙ্গেই ডুবে যাবো প্রথমে।

বল্লরী মাঝিদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললো, ওরা বাঁচাবে না আমাদের?

—আমরা বাঁচতে না চাইলে ওরা বাঁচাবে কি করে! তা ছাড়া, ওরাও নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত থাকবে।

যেন সত্যি সত্যি ওরা তক্ষুনি ডুবে যাচ্ছে এই ভাবে বল্লরী তার ছেলেমানুষী গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, না, ওসব বলবেন না। আমি মরতে চাই না! আস্তে আস্তে চালাতে বলুন।

মল্লিকা হেসে উঠে বললো, খুকুটা সত্যি কি ভীতু। তোর যে মুখ শুকিয়ে গেছে রে!

বাদল বললো, অথচ ওরই বেশী গরজ ছিল নৌকো চাপার! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা, আমি নৌকো এক্ষুনি উল্টে দিচ্ছি।

বাদল ইচ্ছে করে ঝাঁকুনি দিয়ে নৌকোটা দোলাতে লাগলে, মল্লিকা ভয়ে না পেয়ে হাসতে লাগলো খিলখিল করে। বল্লরী আর্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, না, না সত্যি ভালো হবে না কিন্তু, এই বাদলদা, এই, এই,—বল্লরী দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে বাদলকে, ভয়ে বাদলের শরীরের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে চাইছে।

কোলাঘাটে পৌঁছে, ফেরার সময় আর কিছুতেই নৌকোয় যেতে রাজী হলো না বল্লরী। ট্রেনে ছানা সে যাবে না। অগত্যা মাঝিদের বিদায় করে ওরা কিছুক্ষণ ঘুরলো কোলাঘাটে, বাদল এক জোড়া ইলিশ কিনে ফেললো। এখানকার অমৃত্তি খুব বিখ্যাত—রাসবিহারী খেতে ভালোবাসেন—মল্লিকা তাও কিনে ফেললো এক কিলো, তারপর স্টেশনে এসে ট্রেনে চাপলো।

ট্রেনের যে-কামরায় ওরা উঠল তার জানলার পাশে একটি উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে বসেছিল। ছেলেটি নিখুঁত সুটপরা। বেশ সুদর্শন, চুলের কায়দা ফিল্মস্টারদের মতন। ঠোঁটে একটা অহংকারী ভাব। বল্লরী তাকে দেখে বলে উঠলো, ওমা, দিদি দ্যাখ রঞ্জনদা। এই রঞ্জনদা, এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

ছেলেটি ওদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসি মুখে বললো, বল্লরী? প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! তোমরা এখানে! কোলাঘাটে!

মল্লিকা জিজ্ঞেস করলো, কে রে খুকু?

—দিদি তুমি ওকে চেনো না? যুঁই-এর দাদা! আমাদের ক্লাসে পড়ে যুঁই ব্যানার্জী—আমি তো ওদের বাড়িতে কতবার গেছি।

ট্রেনের কামরায় বেশ ভিড় ছিল, কিন্তু ওরা তো যাবে মাত্র এক স্টেশনে, তবু সেই ছেলেটি দাঁড়িয়ে মল্লিকাকে বসার জায়গা দিতে চাইল খুব বিনীত ভাবে। মল্লিকা কিছুতেই বসবে না—কিন্তু ছেলেটি এমন নিখুঁত সৌজন্যের সঙ্গে তাকে পেড়াপিড়ি করতে লাগলো যে শেষ পর্যন্ত বসতেই হলো। আলাপ পরিচয় হলো তিন জনের সঙ্গে। ছেলেটি মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরিজি শব্দ মিশিয়ে বাংলা বলে, আগাগোড়া সাহেবী স্কুল-কলেজে পড়েছে বোঝা যায়। ঠিক মাপা দুটি করে বাক্য বললো সে মল্লিকা ও বাদলের সঙ্গে, তারপর শুধু বল্লরীর সঙ্গেই কথা বলতে লাগলো। বল্লরী

বললো, এই তো দেউলটিতে আমাদের বাড়ি, একদিন থেকে যান না, রঞ্জনদা! ছেলেটি বললো, না, আমার বিশেষ কাজ আছে—

মল্লিকা বসে পড়ার পর চাপাচাপি করে আর একটু জায়গা করে নিয়ে বাদলকে বললো, তুমিও বসো না! দ্বিরুক্তি না করে বাদল বসে পড়লো। রঞ্জন আর বল্লরী গিয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে, বাইরে মুখ বার করে ওরা গল্প করছে। মল্লিকার এত কাছাকাছি বসে বাদল আবার সেই উন্মাদনা বোধ করলো। দুজনের ঊরুতে উরু লেগে আছে—বাদল ইচ্ছে করে সেখানে একটু চাপ দিল। বাদলের ইচ্ছে হলো গোপনে—রেল গাড়ির এত ভিড়ের মধ্যেও মল্লিকার ঊরুর সঙ্গে তার ঊরু, মল্লিকার হাতের সঙ্গে তার হাত পরস্পর কিছু কথা বলুক। শরীরের সঙ্গে শরীরের কথা বলার ব্যাপারটা বাদল আগে কখনো ভাবেইনি—কিন্তু এখন তার মধ্যে একটা দুর্নিবার ইচ্ছে হলো, মল্লিকা একটু সাড়া দিক্। মল্লিকা হেসে বললো, তোমার খুব ঠেসাঠেসি হচ্ছে, না? মল্লিকা আর একটু সরে বসে বাদলকে জায়গা করে দেবার চেষ্টা করলো।

ব্রীজের ওপর দিয়ে গাড়িটা পার হচ্ছে ঝম্‌ঝম্ করে—অনেক নিচে চক্‌চকে নদী, মল্লিকা বললো, দেখো। নৌকোগুলো কি রকম খেলনার মতন ছোট্ট ছোট্ট, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, না? জানলা দিয়ে বাঁকা রোদ এসে পড়েছে মল্লিকার মুখে—তার মুখখানা এখন অপরূপ উজ্জ্বল—এক গোছা চুল আঙুর লতার মতন দুলছে কপালে—সেই দিকে তাকিয়ে বাদল মনে মনে বললো, আমি এক্ষুনি মল্লিকার পায়ের কাছে বসে আমার জীবনটা ওকে দিয়ে দিতে পারি। মল্লিকার সঙ্গে আমার যে দেখা হয়েছে—এতটা ভাগ্য আমি এ জীবনে আশা করিনি।

তারপরই বাদল তাকালো কামরার দরজার দিকে। কি একটা ইয়ার্কির পর বল্লরী আর রঞ্জন পরস্পরকে কাঁধ দিয়ে ঠেলছে, যান্, বানিয়ে বানিয়ে বলছেন! আমি মোটেই ওরকম ভবে...! রঞ্জন বলছে, একটুও বানাইনি, নট ইভ্‌ন আ গ্রেইন অব সল্ট..তাকে থামাবার জন্য বল্লরী হাত তুলে তার মুখে চাপা দিতে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বাদলের মনে হলো, রঞ্জন ছেলেটার মুখ দেখলেই মনে হয়—ছেলেটা তেমন ভালো নয়—বল্লরীর ওর সঙ্গে বেশী মেশা উচিত নয় মোটেই। মল্লিকার উচিত ওকে বারণ করে দেওয়া। কিন্তু মল্লিকা সেদিকে একবারও চেয়ে দেখলো না।

ঠিক ছিল, পরদিন সকালেই কলকাতা চলে যাওয়া হবে, রাসবিহারীর জ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না। প্রথমে মনে হয়েছিল সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা, কিন্তু এখন প্রত্যেকদিনই জ্বর আসবার আগে তাঁর খুব শীতের মতন কাঁপুনি হচ্ছে বলেই একটু চিন্তার ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। জিনিসপত্র গোছগাছ চলছিল, কিন্তু আবার যাওয়া দু'দিন পেছিয়ে গেল—কারণ, বল্লরী তার পা মচ্‌কে ফেলে বিছানায় শুয়ে রইলো দুদিন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা ওরা অনেকক্ষণ নদীর পারে কাটিয়েছিল এক সঙ্গে। বল্লরী আর মল্লিকা দুজনে গলা

মিলিয়ে গাইছে, বাদলের গলায়, ঠিক সুর আসে না—কিন্তু এখানে কেউ প্রতিবাদ করার নেই বলে সেও গলা চড়াচ্ছিল আস্তে আস্তে। একটা মরা গাছের গুঁড়িতে, নদীর জলে পা ডুবিয়ে, বসেছে ওরা। ঢেউয়ের মাথায় চিক্‌চিক্ করছে জ্যোৎস্না। ওপরের মিটমিটে আলো দেয়ালির প্রদীপের সারির মতন সাজানো। কিছুক্ষণ গান গাইবার পর বল্লরী বললো, আয় দিদি, লুকোচুরি খেলি!

বাদল বললো, এই ফাঁকা জায়গায় আবার লুকোচুরি খেলা হবে কি করে?

—খুব হবে। আমরা স্কুলে খেলতাম। একজন এখানে বসে থাকবে আর দুজন লুকোবে—যে বসে থাকবে সে নদীর দিকে ফিরে বসে থাকবে—নদীতে একটা ঢিল পড়লেই সে উঠে খুঁজবে। যাকে আগে ধরতে পারবে, সে আবার—

—কে আগে হবে?

—আমি গুনছি, দশ-কুড়ি তিরিশ—

প্রথমবার হলো মল্লিকা। বল্লরী গিয়ে লুকোলো একটা গাছের আড়ালে, বাদল একটা বড় গর্তের পাশে বসে পড়লো। বল্লরী নদীতে একটা ঢিও ছুঁড়তেই মল্লিকা উঠে এলো। প্রথমে বাদলকে দেখতে পেয়েই সে তাড়া করলো—বেশ জোরে ছোটে মল্লিকা—বাদল এঁকে-বেঁকে ছুটেও বেশীক্ষণ পারলো না, মল্লিকা তাকে ধরে ফেললো—অবশ্য পাশের ঘাটটা পেরিয়ে সোজা ছুটলে মল্লিকা তাকে কোনোদিনই ধরতে পারতো না!

এবার বাদল বসেছে নদীর দিকে মুখ করে—জলে ঢিল পড়তে উঠে দাঁড়ালো। প্রথমটায় কাউকেই দেখতে পেল না—দুটি মেয়ে যেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। মল্লিকা পরেছে নীল রঙের শাড়ি, বল্লরী পরেছে সাদা সিল্কের স্কার্ট, এই জ্যোৎস্না মেশানো অন্ধকারে মিশে গেছে দুজনেই। বাদল বিমূঢ়ের মতন এদিক-ওদিক তাকালো—গাছটার কাছে গিয়ে দেখলো, সেদিকে কেউ নেই। আরও ভালো করে চারপাশে তাকাতেই দেখতে পেলো উঁচু পাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মল্লিকা। সেদিকে বাদল ছুটতেই মল্লিকাও ছুটলো। সাঁ সাঁ করে বাদল এগিয়ে যাচ্ছে মল্লিকার দিকে হঠাৎ যেন তার ডান পাশে মাটি ফুঁড়েই উঠে দাঁড়ালো বল্লরী। মল্লিকার চেয়ে বল্লরী আরো কাছে। মল্লিকাকে ছেড়ে বাদল বল্লরীর দিকেই দৌড়োলো—বল্লরী হরিণীর মতন দ্রুত পায়ে ছুটতে পারে—তার দিকে কিছুটা গিয়ে—আকস্মিকভাবে মোড় ঘুরে বাদল মল্লিকাকে ছুঁয়ে ফেললো।

খেলা বেশ জমে উঠেছে, বাদল তার শৈশবেও বিশেষ খেলাধুলো করেনি কিন্তু আজ সে শিশুর মতন খুশী হয়ে উঠলো। এক একবার এক একজন ধরা পড়ছে—আর হাসির কলধ্বনি উঠছে কিন্তু মাঝপথে বল্লরী বললো, আপনারা দুজনে একটু খেলুন, আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি। মল্লিকা বললো, বাড়ি যাবি কেন? বল্লরী

বললো, তোমরা ততক্ষণ খেলো না—আমি আসছি এক্ষুনি। মল্লিকা আর বল্লরীর চোখাচোখি হলো—মল্লিকা বললে, আচ্ছা, ঘুরে আয়। বাদলের মনে হলো, বল্লরী বোধহয় বাথরুমে যাবে—সে কথাটা তার সামনে বলতে পারলে না। কিন্তু বেশ কিছুক্ষনের মধ্যেও বল্লরী না আসাতে, তার আবার মনে হলো—বল্লরী বোধহয় তাকে আর মল্লিকাকে আলাদা থাকার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুজনে আলাদা হয়ে পড়ার সুযোগ খোঁজার মতন কোনো ইচ্ছে মল্লিকার নেই। মল্লিকা কখনো কোনো ছুতোয় বল্লরীকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে না। বল্লরী চলে যাবার পর, মল্লিকা বললো, এসো, তাহলে ততক্ষণ আমরা বসি। বল্লরী আসুক—দারুণ ভালো লাগছিল কিন্তু—অনেকদিন পর দৌড়োদৌড়ি করতে এত ভালো লাগছে!

—এসো, আমরা দুজনেই খেলি।

—দুজনে আবার কি খেলবো? ঠিক লুকোচুরি হবে না।

—খুব হবে। তুমি তো সব সময় লুকিয়ে আছো।

—তার মানে?

—তার মানে যা হয় তাই। তুমি লুকোও, আমি বসছি—

এবারর মল্লিকাকে খুঁজে পেতে তার একটুও দেরি হলো না। বাদল তীরের মতন ছুটে গেল মল্লিকার দিকে—মল্লিকা শাড়ির আঁচল কোমরে বেঁধেছে, পায়ের কাছে শাড়ি নিচু হয়ে ধরে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে—বাদল একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেললো। একটানে তাকে বুকের ওপর নিয়ে এলো। ঘনঘন নিঃশ্বাসে মল্লিকার বুক দুলছে, স্ফুরিত হয়েছে ওষ্ঠাধর—বাদল মল্লিকাকে তক্ষুনি ছেড়ে দিল না, বুকের মধ্যে তার দারুণ তৃষ্ণা, ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে, সামান্যতম ইঙ্গিতের জন্য সে মল্লিকার মুখের দিকে তাকালো। মল্লিকা আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, এবার তুমি লুকোও!

বাদল লুকোলো, কিন্তু মল্লিকা ছুটে আসার সময় সে ইচ্ছে করেই বেশী দৌড়োলো না—তার শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রত্যাশা করছিল, মল্লিকাও তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু মল্লিকা শুধু তার হাত ছুয়ে দিল। বাদল ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লো ব্যর্থতায়। আস্তে আস্তে বললো, হাঁপিয়ে গেছি, আর খেলবো না। মল্লিকা বললো, এর মধ্যে হাঁপিয়ে গেলে? আমার কিন্তু হয়নি এখনো! তাহলে বাড়ি যাবে, না বসবে?

—এসো! আর একটু বসি।

সেই গাছের গুঁড়ি পর্যন্ত হেঁটে যাবার সময়টুকুতে বাদলের মনে হচ্ছিল—তার বুকের মধ্যে একটা পশু গজরাচ্ছে—সে এক্ষুনি মল্লিকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—কামড়ে ধরবে মল্লিকার ঠোঁট, ছিঁড়ে ফেলবে তার বসন, তার বুকে বুক মিশিয়ে...।

কিন্তু পাশাপাশি বসার পরই বাদল আবার অনেক শান্ত হয়ে এলো। সে বুঝতে পারলো, মল্লিকার ওপর কখনো জোর করা যায় না। মল্লিকা গুন গুন করে গান ধরেছে, 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছিল, অরূপরত্ন আশা করি'—বাদলের মনে হলো, সত্যিই মল্লিকার পাশে শুধু বসলেই যেন একটা অরূপ রতনের স্পর্শ পাওয়া যায়—পৃথিবীর আর কোনো নারীই মানুষকে এতখানি শান্তি দিতে পারে না!

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাদল নিঃশব্দে মল্লিকার গান শুনলো, গান শেষ হবার পর—বিনা প্রস্তুতিতে, কিচ্ছু না ভেবে, টপ্ করে বলে ফেললো, মল্লিকা, আমি তোমাকে দারুণ ভালোবাসি।

বাদলের কথায় কোনো কৌতুক বা লঘু সুর আছে কিনা বোঝবার জন্যই মল্লিকা ঘাড় ঘুরিয়ে বাদলের দিকে তাকালো। সে রকম কোনো চিহ্ন না দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, ভালোবাসা মানে কি এই, একজন আরেকজনকে সারা জীবন চাওয়া?

—হ্যাঁ। আমার কাছে সেই মানে।

—তা হলে আমিও যে তোমাকে দারুণ ভালোবাসি, তা তুমি জানো?

—হ্যাঁ, জানি।

বাদল আর পারলো না, সবলে মল্লিকাকে কাছে টেনে তার গালে নিজের গাল ছোঁয়ালো। মল্লিকা কোনো আপত্তি করলো না। তারপর মল্লিকার ঠোঁটের দিকে ঠোঁট ফেরাতেই মল্লিকা ত্রস্তে সরে গিয়ে বললো, ওমা ওকি করছো?

—আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে, একবার—

—ওকি? না, না।

—একবার, মিলু, আমি আর পারছি না।

—না, বাদল, এখন ওসব নয়।

—কেন? এখানে তো কেউ দেখবে না—কেউ নেই।

—তা হোক। না, ওসব নয়, যাঃ! তুমি কি।

—মিলু, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

—কেন? কষ্ট হচ্ছে কেন?

—আমি জানি না, তুমি বুঝতে পারছো না?

—না, লক্ষ্মীটি, তুমি ওরকমভাবে কথা বলছো কেন, আমার ভয় করছে। তুমি এরকম করে তো আগে কখনো কথা বলোনি?

—আচ্ছা, আর বলবো না।

—বাদল, তুমি সত্যিই সারাজীবন আমাকে চাইবে?

—কি করে প্রমাণ করবো, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা?

—কোনো প্রমাণের দরকার নেই।

এরপর ওরা চুপ করে বসে জলের ঝিকিমিকি দেখতে লাগলো। একটু পরে মল্লিকা বললো, খুকু তো আর এলো না। চলো, আমরা বাড়িই যাই।

ওরা উঠে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ নদীর ওপারের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর পেছন ফিরে পাড়ের দিকে চললো। দু'চার পা গিয়েই মল্লিকা আবার বাদলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, বাদল, আর একবার আমাকে ধরো তো। বাদল একটু অপেক্ষা করে মল্লিকাকে সময় দিল কিছু দূরে চলে যাবার—তারপর সবে মাত্র ছুটতে শুরু করেছে, প্রথম থেকেই সে এত স্পীড নিয়েছে যে দু'এক মিনিটের মধ্যেই ওকে ধরে ফেলবে, এমন সময় সে একটা ভয়ের ৎকার শুনতে পেল, বাদলদা! তারপরই একটা ঝুপ্ করে শব্দ।

অন্ধকারে দেখতে পায়নি বল্লরী, খাড়া পাড় থেকে নিচে পড়ে গেছে—শাদা সিকেলর স্কার্ট পরা বল্লরীর মূর্তি বাদল আর এক পলক দেখতে পেয়েছিল শূন্যে। তক্ষুনি বাদল সেই দিকে ফিরলো। খুব বেশী উঁচু নয়, প্রায় এক মানুষ সমান—নিজে থেকে বল্লরী এতটা এমনিতেই হয়তো লাফাতে পারে, আচমকা পড়ে যাওয়ায় জোর আঘাত পেয়েছে। মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেছে, নিজে নিজে দাঁড়াতে পারছে না। বাদল ব্যাকুলভাবে ঝুঁকে পড়ে বললো, কোথায় লেগেছে? বল্লরী? মাথায় লাগেনি তো?

বাদল বল্লরীর মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে রক্ত খুঁজতে লাগলো। না, রক্ত নেই কোথাও। বল্লরী বললো, পায়ে লেগেছে, পায়ে! উঃ, উঃ, ভীষণ লেগেছে!

মল্লিকাও ততক্ষণে এসে পৌঁছেছে, জিজ্ঞেস করলো, অন্ধকারে ওরকম দৌড়োতে গেলি কেন খুকু? বল্লরী যন্ত্রণায় উঃ আঃ করতে করতেই উত্তর দিল, একটা শুয়োর, একটা বিচ্ছিরি শুয়োর এখানে, এ জায়গাটা শেষ হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি, উঃ, পায়ে ভীষণ লেগেছে—

বাদল ওর হাত ধরে টেনে বললো, দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও, পারছো না?

—না।

মল্লিকা বাদলকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি ওকে পাঁজাকোলা করতে পারবে?

—দেখি চেষ্টা করে।

বল্লরীর পিঠের নিচে আর দু' পায়ে দু' হাত রেখে বাদল ওকে উঁচু করে তুললো। বেশ কষ্ট হচ্ছে বাদলের, কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে বলে মনে হলো। মল্লিকা রাস্তা দেখাতে লাগলো অন্ধকারে, বাদল পেছনে পেছনে। পড়ে যাবার ভয়ে বল্লরী তার গলা জড়িয়ে ধরেছে।

কয়েক পা যাবার পরই একটা জায়গায় বাদলের চোখ আটকে গেল। বল্লরীর উরুর কাছে তার স্কার্টটা উঠে এসেছে। সাদা স্কিলেরই মতন মসৃণ ধপ্‌ধপে উরু বল্লরীর,

সে তখন যন্ত্রণায় কাতর—পোশাক ঠিক করার কথা তার মনে নেই। বাদলের হৃৎস্পন্দন হঠাৎ দ্রুত হয়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাবার চেষ্টা করলো সেখান থেকে, কিন্তু ওখানে যেন একটা চুম্বক বসানো আছে—বাদলের চোখ বারবার টেনে নিতে লাগলো। বাদল এ পর্যন্ত কোনো তন্বী মেয়ের অতখানি অনাবৃত ঊরু দেখেনি। তার সহবৎ জ্ঞান আছে, কখনো বিপর্যস্ত অবস্থায় কোনো মহিলার দিকে চোখ পড়লেই সে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আজ বাদলের কি রকম হয়ে গেল, সে নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছে না—তার চোখ বল্লরীর ঊরুতে আটকে আছে, আরও একটুখানি দেখার জন্য সে ছটফট করছে। বাদল একবার ভাবলো, সে কি বল্লরীর স্কার্টটা টেনে দেবে? কিন্তু কি করে দেবে—তার তো হাত ছাড়ার উপায় নেই। মল্লিকাকে ডেকে বলবে? কিন্তু মল্লিকাকে একথা বলতে তার ভীষণ লজ্জা হলো।

এরপরই বাদল নিজের বাঁ হাতের দিকে তাকালো। বল্লরীর পিঠের নিচ দিয়ে তার বাঁ হাতটা প্রায় বল্লরীর বুকের কাছে পৌঁছবে। আর এক চুল দূরেই বল্লরীর বুকের ঢেউ একটা আঙুল সরালেই সে স্পর্শ করতে পারে। বল্লরীর সিল্কের জামা ভেদ করে তার উঁচু বুকের আভাস স্পষ্ট, বাদলের আঙুলের ডগা যেন নিশপিশ করতে লাগলো, আঙুলগুলোর যেন আলাদা আত্মা আছে। তারা নিজেরাই চাইছে এগিয়ে যেতে। বাদল মনে মনে বলছে, না, না। তবু বাঁ হাতটা এগিয়ে গিয়ে বল্লরীর সেই ঢেউ ছুঁলো—সঙ্গে সঙ্গে বাদল বলে উঠলো, বল্লরী, তুমি এবার হাঁটতে পারবে না? আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল যে!

মল্লিকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, তা হলে ওকে নামিয়ে দাও, তুমি যেন আবার ফেলে দিও না। ও আমাদের দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটুক! বল্লরী বলল, ব্যথাটা একটু কমেছে! বাদলদার একটুও গায় জোর নেই—আর এইটুকু নিয়ে যেতে পারলেন না।

দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে এক পায় লাফাতে লাফাতে বল্লরী বাকি রাস্তাটা চলে এলো।

তার পরদিনই সেই ব্যাপারটা ঘটলো, যার ফলে সমস্ত জীবনটাই বদলে গেল বাদলের। বাদলের জীবনে আগের বা পরের সব কিছু থেকেই আলাদা সেই একটা দিন।

বল্লরীর পা মচকে যাওয়ার জন্য ওদের কলকাতায় ফেরা পিছিয়ে গেল দু'-দিনের জন্য। আড়াই মাইল দূরে স্টেশন, হাঁটা পথ ছাড়া আর কোনো যানবাহন নেই, শেষ রাতে তুমুল বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার অবস্থাও সাঙ্ঘাতিক। সকালবেলা মল্লিকার সঙ্গে সাঁওতাল বস্তীতে ঘুরে এলো বাদল, সে নিজে ওখানে বিশেষ কিছু করে না—কিন্তু লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে কিংবা কাছাকাছি থাকতে তার বেশ ভালো লাগে এখন। তাছাড়া, ওদের সঙ্গে মিশে গিয়ে মল্লিকার স্বচ্ছন্দ আচরণ সে মুগ্ধ হয়ে দেখে।

সেইদিনই রাস্তার কাদার মধ্যে মল্লিকার চটিটা ডুবে গিয়েছিল, বালি কাদার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সেটা তুলে এনে বলেছিল, এবার কি পুরস্কার দেবে আমাকে? মল্লিকা হেসে বলেছিল, ভেবে দেখতে হবে।

দুপুরে খাওয়ার পর মল্লিকা তার বাবার সঙ্গে গল্প করছে, বাদল বাড়িটার ভাঙা অংশের দিকে ঘুরে দেখছিল। পুরনো আমলের এইসব বনেদী বাড়ির ভেঙে পড়া থাম ও খিলান দেখার মধ্যেও একটা রোমাঞ্চ আছে। বাদলের নিজেদের বাড়িও বেশ পুরনো—কিন্তু এরকম ছোট গ্রামে এরকম বাড়ির পরিবেশ অন্যরকম। সিগারেট টানতে টানতে অলস ভাবে ঘুরছিল বাদল, হঠাৎ দেখতে পেল একটা থামে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বই পড়ছে বল্লরী। কাল রাত্রে বাড়ি ফিরেই বল্লরীর পায়ে চুন-হলুদ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজও সারা সকাল ঘরে শুয়ে ছিল বল্লরী, এখন তাকে এখানে বসে থাকতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, বল্লরী, তুমি এর মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছো?

গভীর মনোযোগ দিয়েয় বই পড়চিল বল্লরী, একটু যেন চমকে উঠলো। ঝকঝকে দাঁতে হেসে বললো, ধুৎ! বেশীক্ষণ ঘরে থাকতে আমার ভালোই লাগে না! তা ছাড়া, ব্যথা অনেকটা কমে গেছে!

—পা ফেলে হাঁটতে পারছো?

—পুরো পা-টা পাততে পারছি না এখনো, গোড়ালির কাছে এখনও খুব ব্যথা।

—তা হলে এ পর্যন্ত এলে কি করে?

—বকের মতন লাফিয়ে লাফিয়ে।

—বক লাফায় না, শালিক। দেখি লাফিয়ে দেখাও তো।

সত্যিই এক পায়ে লাফাতে লাফাতে বল্লরী চলে এলো বাদলের কাছে। জিজ্ঞেস করলো, আপনি এদিকটায় কি করছেন?

—দেখছি সারা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে।

—জানেন, আমি এ বাড়িতেই জন্মেছি। দিদিও। একই ঘরে আমরা দুজনে, শুধু বড়দি জন্মেছিল কাশীতে। দাদু বেঁচে থাকতে আমাদের এখানকার বাড়ি খুব জমজমাট ছিল।

—কোন ঘরে জন্মেছ তোমরা?

—দোতলায় যে ঘরগুলো খালি পড়ে আছে দেখেছেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান দিকেরটা। চলুন, দেখবেন।

—তুমি দোতলায় উঠবে কি করে?

—আপনি আমার একটা হাত ধরুন, আমি ঠিক লাফিয়ে লাফিয়ে উঠবো।

—না থাক্।

—চলুন না!

দোতলার ঘরগুলো সার সার বন্ধ পড়ে আছে। সম্ভবত ওপরের ছাদ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই ঘরগুলো আর বাসযোগ্য নয়। সিঁড়ির পাশের ঘরটায় দরজায় ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল—অন্ধকার ঘর। একটুক্ষণ চেয়ে থাকার পর চোখের অন্ধকার খানিকটা সয়ে গেলে দেখতে পেল—ঘরের ঠিক মাঝখানে আড়াআড়ি একটা লোহার খাট পাতা—আর কিছু নেই, একটা দেওয়াল আলমারির পাল্লা পাট করা। ঘরের মধ্যে ঢুকে বাদল একটা জানলা খুলতেই কিছুটা আলো হলো। খাটটাকে এক পাশে সরিয়ে দেবার জন্য ঠেলতেই বিশ্রী ক্যাড়ক্যাড়ে আওয়াজ করে উঠলো, বল্লরী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, ওরকম ঠেলবেন না—নিচে শব্দ হবে—এই ঘরটার ঠিক নিচেই বাবার ঘর—বাবা বোধহয় ঘুমোচ্ছেন।

বাদল ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে যেন কল্পনা করতে লাগলো, মল্লিকা এ ঘরে জন্মেছে, একেবারে বাচ্চা মল্লিকা হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে, ঘরভর্তি তার খেলনা—! বাদল আপন মনেই বললে, মল্লিকা এখানে জন্মেছিল? আমি কোথায় জন্মেছিলুম—আমায় তা কেউ বলেনি।

বল্লরী বললো, আমিও এই ঘরেই হয়েছি।

—ও হ্যাঁ তুমিও! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাচ্চা এইটুকুনি বল্লরীকে। তুমি নিশ্চয়ই তখন খুব ছিঁচকাদুনে ছিলে?

—মোটেই নয়!

দেয়াল আলমারিটার মধ্যে কতকগুলো পুরনো খবরের কাগজ আর কয়েকটা ছেঁড়া বই। আলমারির বইগুলো একটু হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে যেতেই দুটো নেংটি ইঁদুর তড়াক্ করে লাফ দিয়ে পড়লো—'উরেঃ বাবা রে!' বলে চেঁচিয়ে তার চেয়েও জোরে লাফিয়ে উঠলো বল্লরী। বাদল তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, উঃ, কী ভীতু তুমি এখনো, এত বড় হয়েছো!

—মোটেই ভীতু নই। ওসবে আমার ঘেন্না করে।

—সেদিন নৌকোতে তো দারুণ ভয় পেয়েছিলে!

—সে কথা আলাদা। লাফাতে গিয়ে আবার পায়ে লাগলো। আসুন ঐ খাটটায় একটু বসি।

খাটটায় বসে বল্লরী বললো, এইটাতেই বোধহয় শুয়ে শুয়ে আমি বড় হয়েছি। মা'র স্বাস্থ্য তখন খুব ভালো ছিল জানেন, এখন তো হাঁপানিতে ভুগে ভুগে মাকে আর চেনাই যায় না—

বল্লরীর কাঁধে বাদলের একটা হাত, বল্লরী আদর খাবার ভঙ্গিতে বাদলের বুকের সঙ্গে নিজের পিঠ মিশিয়ে দিয়ে আছে। বল্লরীর ঊরুর দিকে বাদলের চোখ গেল—

এখন আবার স্কার্টে ঢাকা। এতক্ষণ বাদল স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলচিল, হঠাৎ তার গত রাত্রে দেখা বল্লরীর সেই মসৃণ ঊরুর কথা মনে পড়লো, এবং যুক্তিহীন ভাবেই তার আবার ভংকর ইচ্ছে হলো—আরেকবার বল্লরীর সেই ঊরু দেখার। সেই মুহূর্তে বাদল আর সব কিছু ভুলে গেল—তার কানের লতি আর নাকের ডগা জ্বালা করে উঠলো—এক্ষুনি বল্লরী সেই ঊরু আর একবার দেখতে না পেলে সে বাঁচবেই না মনে হলো। বাদল বল্লরীর ঊরুর ওপর একটা হাত রাখলো—বল্লরীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলো না, পা দুটো দোলাতে দোলাতে বললো, অনেকদিন পর এই ঘরটায় এলুম, বেশ ভালো লাগছে।

বাদল আস্তে আস্তে হাত দিয়ে বল্লরীর ফ্রকটা ওপরের দিকে তুলছে। এ রকম কাজ সে জীবনে কখনো করেনি, কোনোদিন সে করতে পারে তাও জানতো না, কিন্তু আজ তার সমস্ত মনোযোগ শুধু ঐ দিকে। ন্যায়-অন্যায়ের কোনো প্রশ্নই তার মধ্যে জাগলো না। অন্য হাতে বল্লরীর মুখটা ফিরিয়ে বাদল বললো, বল্লরী, তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে—চোখে কাজল দিয়েছো বুঝি? ঝাঁকড়া চুল সমেত মাথাটা দুলিয়ে লজ্জার ভঙ্গি করে বল্লরী বললো, যাঃ, রোজই তো দিই, কাজল না, সুর্মা—

—কিন্তু আজ এত মিষ্টি দেখাচ্ছে!

—উঃ উঁ—যাঃ!

বাদল বল্লরীর ঠোঁটে ঠোঁটটা রেখেই তুলে নিল। বল্লরী মিটমিট করে হেসে তাকিয়ে রইলো বাদলের দিকে, কোনো কথা বললো না। বাদল অন্য হাতে বল্লরীর স্কার্টের প্রান্ত তুলে হাঁটু ছাড়িয়ে ফেলেছে, বল্লরী সেদিকে একবারও তাকাচ্ছে না। ঝট্ করে স্কার্টটা অনেকটা তুলে বাদল পাগলের মতন চুমু খেতে লাগলো বল্লরীর ঊরুতে, তারপর মুখ তুলে নিয়ে বল্লরীর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলো প্রবলভাবে—আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে তার নিঃশ্বাসে—বল্লরীও দু'হাতে বাদলের কাঁধ চেপে ধরেছে, আর অনবরত সে হাসছে। বল্লরীর বুকে হাত দিতে বাদলের আর এক মুহূর্তও দ্বিধা হলো না। বল্লরীর অনাবৃত ঊরুর দিকে তাকিয়ে বাদল আচ্ছন্নের মতন বলতে লাগলো, বল্লরী, তোমাকে আমার খুব আদর করতে ইচ্ছে করছে, খুব...তুমি এত সুন্দর...। সেই রকম হাসতে হাসতেই বল্লরী বাদলের বুকে মাথা গুঁজলো। পিঠোর দিকের স্কার্টের বোতাম, সবে মাত্র তিনটে বোতাম খোলা হয়েছে—এই সময় শব্দ পেয়ে বাদল দরজার দিকে তাকালো। সেখানে মল্লিকা দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছে।

মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে মল্লিকা, তার মুখে কোনো রাগ কিংবা অভিমানের চিহ্ন নেই, এমন কি বিস্ময়ও নয়, অদ্ভুত ধরনের শান্ত ভাবে চেয়ে আছে সে। অনেক রুগীর যেমন হু-হু করে জ্বর নামতে থাকে—বাদলের শরীরের তাপও সেই রকম কমতে লাগলো। অনেকখানি কমে যাবার পর বাদল যেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো,

যেন এতক্ষণ কিছুই ঘটেনি—এইভাবে সে মল্লিকার কাছে উঠে এসে স্বাভাবিক ভাবে ডাকলো, মল্লিকা?

যেন অনেক দূর থেকে উত্তর দিচ্ছে, এইভাবে মল্লিকা বললো—কি?

—এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?

—নিচে।

বাদল আর কিছু বলতে পারলো না। মল্লিকা সেই রকম শান্ত ভাবেই বললো, খুকু, তোকে মা ডাকছে, চল্, নিচে চল্।

পিঠের বোতাম আর আটকালো না বল্লরী, উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ফেলতে যেতেই মল্লিকা বললো, আমার হাত ধর, আস্তে আস্তে আয়। একসঙ্গে ওরা নিচে নেমে এলো।

তখনও বাদলের মাথার ঘোর কাটেনি, সে বুঝতে পারলো না কি হয়ে গেল। যেন কিছুই হয়নি।

বিকেল থেকে সে আর মল্লিকাকে কিছুতেই খুঁজে পেল না। চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলো, মল্লিকার সঙ্গে তার কথা বলা বিষম দরকার, মল্লিকাকে সব বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই বুঝবে।

সন্ধ্যেবেলা মল্লিকাকে একা একা সাঁওতাল পাড়া থেকে ফিরতে দেখে বাদল বললো, মিলু, আজ বেড়াতে যাবে না?

একবেলাতেই যেন মল্লিকা দারুণ ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে বললো, আজ আর আমার ভালো লাগছে না। বাদল তবুও জোর করতে লাগলো, অনুনয় বিনয় করে শেষ পর্যন্ত মল্লিকাকে নিয়ে এলো নদীর পারে।

মল্লিকা একবারও কোনো অভিযোগ জানালো না, একবারও রাগ প্রকাশ করলো না। সে শুধু আজ বড় বেশী ক্লান্ত আর ক্লান্ত। বাদল নিজে থেকে ওকথা কিছুতেই তুলতে পারছে না—যতই অন্যান্য বিষয় তুলছে, ততই সে যেন মল্লিকার থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে—এক সময় বাদল টের পেল—মল্লিকা আজ যে আঘাত পেয়েছে, সে আঘাত বোধ হয় আর কোনোদিনই সারবে না। বাদল নিজেকে জানে, সে নিজেও ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ, কিন্তু যখন রাগ হয় তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মল্লিকাকে সে কোনোদিনই রাগতে দেখেনি এ পর্যন্ত, আজ সে বুঝতে পারলো, জীবনের চরমতম আঘাতেই মল্লিকা রাগ করার ক্ষমতা হারিয়েছে। এটা বুঝতে পেরেই বাদল বললো, মল্লিকা, আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে ক্ষমা করো। আমার মাথার ঠিক ছিল না, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না...

মল্লিকা ক্লিষ্ট ভাবে বললো, থাক, ওকথা বলো না।

—মিলুক একবার শোনো অন্তত, মনের দিক থেকে আমি এখনও খাঁটি আছি,

শুধু একটা মুহূর্তের ভুল।

—আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। তবু বেঁচে থাকতে হবেই।

বাদলের পাশ থেকে উঠে গিয়ে মল্লিকা একবার নদীর কিনারায় চলে এলো। জলে পা ভিজিয়ে দাঁড়ালো, ঢেউ লেগে তার শাড়ি ভিজছে, তবু সে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর আর খানিকটা নেমে গেল—

বাদল চেঁচিয়ে উঠলো, ওকি করছো? নদীতে নেমো না এখন—এখানটা ডেঞ্জারাস—মিলু উঠে এসো—

বাদল নিজেই নদীতে নেমে আসছিল মল্লিকাকে ধরতে। মল্লিকা মুখ ফিরিয়ে ঠাণ্ডাভাবে বললো, ব্যস্ত হয়ো না, আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি না। ওসব আমার ইচ্ছে করে না। আমার এমনিতেই এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে।

—ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে পারবে না।

—খুব পারবো।

—মিলু, আমাকে কি কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না?

—বাদল, তুমি খুকুকে বিয়ে করো।

—কি? অসম্ভব! মল্লিকা, তুমি কি বলছো? তুমি বিশ্বাস করো, আমি শুধু তোমাকে—

—তুমি খুকুকে বিয়ে করতে চাও না?

—না। তা হয় না। কিছুতেই সম্ভব নয়—

—যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তুমি আমাদের বাড়িতে আর কখনো এসো না। কোনোদিন আর আমার কিংবা খুকুর সঙ্গে দেখা করো না। আমি আর পারবো না। নদীর জলে দাঁড়িয়ে বলছি। এই আমার সত্যিকারের মনের কথা।

মল্লিকার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, যাতে বাদল বুঝতে পারলো, আর কোনো কথা সেখানে বলার দরকার নেই। বাদল আস্তে আস্তে বললো, বেশ, তুমি না ডাকলে, আর কোনোদিন আসবো না।

আমি ডাকবো না, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

বাদল আর কোনোদিন যায়নি। রাসবিহারীর মৃত্যু সংবাদও পৌঁছায়নি তার কাছে। এই পাঁচ বছরে বাদল ওদের কোনো খবর জানারও চেষ্টা করেনি।

আজ এতদিন বাদে, সম্পূর্ণ অন্য চেহারায় ও চরিত্রে বল্লরীকে দেখছে সে, বসে আছে তার মুখোমুখি এই পার্কে। যে-ঘটনায় তার জীবনটা বদলে গেল, বল্লরী অবহেলার সঙ্গে বলছে সে অনয়াসেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যেতো। তা হলে কি সবটাই বাদলের ভুল?

বাদল জিজ্ঞেস করলো, এই পাঁচ বছরে তোমার দিদি একটুও বদলেছে?

—সবাই বদলায়, কে না বদলায়!

—বল্লরী, আমি যদি এখন মল্লিকার সঙ্গে দেখা করতে চাই, ও কি দেখা করবে?

—তা, আমি কি জানি! সেটা আপনার আর দিদির ব্যাপার!

বাদল হেসে বললো, ঠিক আছে, এসো, তা হলে এবার উঠে পড়া যাক্।

—কিন্তু আপনি আমাকে কি জরুরী কথা বলবেন বলেছিলেন, সেটা বলবেন না? সবই তো শুধু দিদির কথা বললেন।

—সেটা বোধহয় আর বলার দরকার হবে না।

॥ চার ॥

অফিসের সোসাল ফাংশানে বাদল সাধারণত কোনো বছরই উপস্থিত থাকে না। ওসব তার ভালো লাগে না। প্রতি বছরই বাঁধাধরা ভাবে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরই হবেন সভাপতি, কোনো একজন অনিচ্ছুক সাহিত্যিককে এনে করা হবে প্রধান অতিথি। তাঁর বক্তৃতার একটা কথাও শুনবে না কেউ। তারপর কিছু গান ও ভাঁড়ামি। অফিসের যে-লোকগুলো সবচেয়ে ফাঁকিবাজ তারাই ঐদিন মহাব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করবে, সবচেয়ে বেশী ফরফর করবেন ক্রেডিট সেকশানের প্রেমনাথবাবু।

এই বার্ষিক উৎসবে অফিসের সকলের উপস্থিত থাকাই নিয়ম, বিশেষত অফিসারদের। সেইজন্যেই বাদল বছরের ঠিক এই সময়টাতেই ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরে কোথাও বেড়াতে যায়। এবারেও বাদল ভেবেছিল ছুটি নিয়ে কাশীতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসবে। কিন্তু অফিস থেকে তার ছুটি নেওয়া সম্ভব হলো না—সুতরাং সোস্যাল ফাংশানে থাকতেই হলো।

বাদলের মনে মনে সামান্য একটু ইচ্ছে ছিল অবশ্য গৌতম রায়কে সামনাসামনি ভালো করে দেখার। চোখাচোখি তাকালে মানুষকে অনেকটা চেনা যায়। বাদলদের ব্রিটিশ কোম্পানি-ইউনিয়ানে মোটা টাকা জমে, সুতরাং কলকাতার নামকরা অনেককেই আনা হয়েছে, হেমন্ত মুখার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জি, জহর রায়ের সঙ্গে এবার গৌতম রায়ও অন্যতম আকর্ষণ। কিন্তু বাদল আশাই করেনি, গৌতম রায়ের সঙ্গে সে বল্লরীকেও দেখতে পাবে।

অফিসের বড় হলঘরটায় চেয়ার টেবিল সব সরিয়ে ফাঁকা করে ফেলা হয়েছে। তৈরী হয়েছে মঞ্চ, এলোমেলো ভাবে সাজানো নানা জাতের ফুল ও ধূপের গন্ধে জায়গাটা ম-ম করছে! আর্টিস্টদের বসানো হয়েছে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের এয়ার কণ্ডিশাণ্ড ঘরে, প্রেমনাথবাবু মুখে খুব ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে হামলে বেড়াচ্ছেন সারা অফিস। বাদল বহুক্ষণ পর্যন্ত নিজের ঘরে বসে কাজ করলো একা একা। প্রোগ্রাম শুরু হবার

পর দু'তিন জন এসে ডেকে গেলেও সে হাতের কাজ শেষ না করে উঠলো না।

হলঘরে ঢুকে মঞ্চের দিকে এক পলক তাকালো। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে বসে আছে গৌতম রায়, তাকে ঘিরে চার পাঁচজন যুবক-যুবতী, তাদের মধ্যে বল্লরীও একজন। বল্লরী দেখতে পায়নি বাদলকে, হয়তো সে জানেও না যে বাদল এই অফিসে চাকরি করে। বাদল প্রায়ই অফিস বদলায়, এই অফিসে এসেছে মাত্র তিন বছর।

অফিসারদের বসার জায়গা হয়েছে প্রথম সারিতে, বাদল সেদিকে গেল না, সে একেবারে পেছন দিকে দেয়াল ঘেঁষে বসলো। কয়েকজন ছোকরা কেরানী তাকে দেখে একটু সচকিত হয়ে উঠলো, অতিরিক্ত খাতির দেখাবার জন্য বললো, স্যার, আপনি এখানে বসলেন কেন? আপনাদের জন্য সামনে...এখানে আপনার অসুবিধে হবে...। বাদল মুখে কোনো উত্তর দিল না ওদের কথার, শুধু হাত নেড়ে ঠিক আছের ভঙ্গি করলো। তারপর হাত দু'খানা জোড় করে চিবুকে ঠেকিয়ে সে স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে।

গৌতম রায় গরদের পাঞ্জাবি পরে এসেছে, মাথার চুলে সম্ভবত ক্রীম মাখানো—সেইজন্যই বেশী চকচকে। এখন আর তেমন হাল্কাভাবে নেই, মুখে চোখে গাম্ভীর্য মাখানো। তার দু'পাশে দুটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। বল্লরী ঠিক তার বাঁ পাশে। মাইক্রোফোনে ঠিক মতন কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেবার জন্য বল্লরী তার মুখখানা একটু ঝুঁকিয়ে থাকে সামনের দিকে, তার বাহুতে ঠেকেছে গৌতম রায়ের বাহু। গৌতম রায় গান গাইবার সময় চোখ বুজে থাকে। তার বসে থাকার ভঙ্গিতে একটা আন্তরিকতার ভাব ফুটে উঠেছে।

বাদলের মনে হলো, গৌতম রায় গান করে সত্যিই ভালো। বেশ সুরেলা ও জোরালো কণ্ঠস্বর—। গান-বাজনার দিকে বাদলের বিশেষ কোনো ঝোঁক নেই—তবু সে বুঝতে পারলো এর গান শুনে অনেকে স্বাভাবিক ভাবেই মুগ্ধ হবে। দু'খানা রাগপ্রধান ধরনের আধুনিক গান করার পর গৌতম রায় ধরলো ভাটিয়ালি ও লোকসঙ্গীত—তখন বল্লরী ও অন্য ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে গলা মেলালো। গৌতম রায়ের ভাটিয়ালি গানের দীর্ঘ টানের সময় সত্যিই মনটা যেন কোনো নদীর পারে চলে যায়। একটা চওড়া নদী হু-হু করে হাওয়া বাইছে—বাদলের মনটা খারাপ হয়ে গেল একটু।

গৌতম রায় লোকটা ভালো কিংবা খারাপ—বাদল তা বুঝতে পারলো না। বাদল একদৃষ্টে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে—কিন্তু গানের সময় ও চোখ বন্ধ করেই থাকে, বিরতির সময় সে চোখ খুলছে বটে কিন্তু তখন সে পাশ ফিরে বল্লরী ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলছে। বাদলের সঙ্গে চোখাচোখি হবার সুযোগ নেই। এতদূর থেকে অবশ্য চোখাচোখি হলেও কিছু বুঝতে পারতো না। গৌতম রায়ও জানে না—এখানে দর্শকদের মধ্যে একজন শুধু তার গানই শুনছে না—তার প্রতিটি ভঙ্গি যাচাই

করে দেখছে।

বাদল ঠিক করলো, গৌতম রায়ের সঙ্গে সে অন্য কোথাও একবার দেখা করবে। এখানে গৌতম রায়কে চেনা যাবে না, এখানে সে শিল্পী, এখানে তার সত্তা অন্যরকম হয়ে গেছে। সত্যিই গান গাইবার সময় তার চোখ মুখ বদলে যাচ্ছে—এখন ওর রূপ নৈর্ব্যক্তিক, এখন ওকে দেখে ওর ভেতরের পশু কিংবা দেবতাকে চেনা যাবে না।

গৌতম রায়ের সঙ্গের অন্য দুটি মেয়েও দেখতে খারাপ না, কিন্তু বল্লরী সবারই দৃষ্টি কেড়ে নেবে। টকটকে লাল বেনারসী পরে বল্লরী মঞ্চের ওপর আগুনের মতন জ্বলছে। বল্লরীকে দেখে আগুনের কথাটা শুধু যে বাদলেরই মনে এলো, তাই নয়, আশপাশ থেকে সে একথা শুনতে পেল। তার সামনের রো-তে দুজন ফিসফিস করে আলোচনা করছিল, একজন বললো, গৌতম রায়ের পাশের মেয়েটাকে দেখছিস্, মাইরি, আগুন একদম—

অপরজন সবজান্তার মতন ভঙ্গিতে বললো, আজকাল নতুন গাইছে, ফাটিয়ে দিচ্ছে মাইরি, শিগ্‌গিরই টপে উঠে যাবে দেখিস—

—তুই আগে ওর গান শুনেছিস্?

—হ্যাঁ।

—কি নাম ওর বল তো?

—ঐ তো, ইয়ে, বল্লরী সামথিং। গৌতম রায়ের শালী—

—শালী না তোর ইয়ে একেবারে, কত মেয়েই যে গৌতম রায়ের শালী শুনলাম এ পর্যন্ত।

—না, না, এ সত্যিই, আমি নিজের কানে শুনেছি, বড় সাহেবের ঘরে তো বসেছিল ওরা—আমি কোকাকোলা দিতে গিয়েছিলাম, তখন শুনলাম—

—তুই আবার কখন কোকাকোলা দিতে গেলি! সে তো প্রেমনাথবাবুকে দেখলাম—

—বিশ্বাস করছিস্ না। একটা কম পড়েছিল, প্রেমনাথদা আমাকে আনতে বললেন।

—তুই তা হলে খুব কাছ থেকে দেখেছিস্ বল?

—কাছ থেকে মানে কি! বট্‌লটা দেবার সময় ওর সঙ্গে আমার হাতে হাত ছুয়ে গেল, ঠিক যেন কারেন্ট মারলো মাইরি, একেবারে ফোর ফরটি ভোল্ট।

—গৌতম রায় জোটায়ও খুব ভালো জিনিস। গত বছর পুজোর সময় তেইশের পল্লীর ফাংশানে দেখলাম অন্য দুটো মেয়ে, সে দুজনও দারুণ ছিল, তারাও শালী ছিল নাকি রে?

—কিন্তু এর মতন আর কেউ না। চোখ ঘোরাচ্ছে দ্যাখ্ না একেবারে চাক্কু মারছে, একেবারে তাজা মাল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদলকে শুনতেই হলো ওদের কথা। মানুষ ইচ্ছে মতন তো আর কান দুটো বন্ধ করতে পারে না। বাদল জোর করে মনোযোগও ফেরাতে পারছিল না অন্যদিকে। হঠাৎ তার মনে হলো, মল্লিকা যদি এই রকম শুনতো তার ছোট বোন সম্পর্কে, তার কি রকম লাগতো? মল্লিকা কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু এই তো সবে শুরু, বল্লরী সিনেমায় নামতে চাইছে, এরপর তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ নিয়ে রাস্তায় যে-কোন লোক রসলো আলোচনায় মেতে উঠবে—এবং লোক যত বেশী তাকে নিয়ে ওরকম আলোচনা করবে, ততই তার সার্থকতা আসবে, ফিল্‌ম লাইনে এর নামই তো জনপ্রিয়তা।

বাদল নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তবুও সামনের লোক দুটোর আলোচনা শুনতে শুনতে তার রাগ হয়ে যেতে লাগলো। অথচ লোকদুটোকে চুপ করতে বলতে তার রুচিতে বাধছে। লোকদুটো এই অফিসেরই ডেসপ্যাচ ক্লার্ক আর টাইপিস্ট, বাদল ওদের অফিসার—সে রাগ করেছে বুঝতে পারলে ওরা দারুণ ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু গান শোনার দিকে একটুও মন নেই ওদের। ওরা এখন বল্লরীর দেহ নিয়ে চুল চেরা বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছে, ওদের দুজনেরই ধারণা গান গাইবার বদলে বল্লরী যদি নাচ শিখতো—তাহলে আরও অনেক বেশী সাক্‌সেসফুল হতে পারতো। বেশীক্ষণ রাগ চেপে রাখলে বাদলের হাত কাঁপে। বাদলের চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে, হাত কাঁপছে অল্প অল্প, কিন্তু তার কিছুই করার নেই। বাদল সেখান থেকে ঝট্ করে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এসে তার মনে হলো, আজ বল্লরীর সঙ্গে দেখা করবে না। বাদল যে বল্লরীকে আজ এখানে দেখেছে, সে কথাও জানাবে না। এখানে জলসা শেষ হতে রাত দশটা হবেই, তারপর বল্লরীকে কে পৌঁছিয়ে দেবে, ঐ গৌতম রায়ই বোধহয়—বল্লরীদের বাড়িতে কেউ এজন্য আপত্তি করে না? মল্লিকা কি এ সম্পর্কে কিছুই ভাবে না? যাক্ গে আমার কি।

কারুকে কিছু না বলে বাদল রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। ট্যাক্সি ডাকলো না, ট্রামে বাসে উঠলো না, উদ্দেশ্যহীন ভাবে হেঁটে চললে, অনেকক্ষণ, আজ এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে তার কিছুতেই ইচ্ছে করছে না, অথচ কোথাও যাবার নেই। একটু ভেবে, বাদল ওর বন্ধু ভাস্করের বাড়িতে যাওয়া ঠিক করলো।

কলেজ ছাড়ার পর ভাস্করের সঙ্গেই বাদলের কিছুটা যোগাযোগ ছিল। কিন্তু দুজনের জীবন দুরকম। বাদল ধীর শান্ত, ভাস্কর কিন্তু দারুণ ছটফটে, সব সময়ই তাকে ব্যস্ত মনে হয়। বছর দুয়েক আগে বিয়ে করেছে ভাস্কর, তারপর টালিগঞ্জে ফ্ল্যাট নিয়েছে।

ভাস্করের ঘরে আরও তিনচার জন লোক চিল, তুমুল তর্ক চলছে, বাদলকে দেখে ভাস্কর একবার শুধু বললো, কি রে, কি ব্যাপার? বোস্—। তারপর ভাস্কর আবার

তর্কে ডুবে গেল। তা হচ্ছে রাজনীতি নিয়ে, বাদল অচেনা লোকের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারে না বলে চুপ করে বসে রইল। একটু বাদেই ভাস্করের স্ত্রী মণিকা এসে বাদলকে দেখে বললে, একি, আপনি! আপনি অনেকদিন বাঁচবেন।

বাদল একটু হেসে বললো, আমি অনেকদিন বাঁচবো? কেন এক্ষুনি আমার কথাই ভাবছিলেন।

—হ্যাঁ সত্যি, আপনার কথাই ভাবছিলুম বিশ্বাস করুন।

—কি সৌভাগ্য আমার!

ভাস্কর তর্কের মাঝখানেই একবার বাদলের দিকে ফিরে বললো, হ্যাঁরে, আজ বিকেলে তোর কথাই হচ্ছিল। অনেক দিন আসিস্‌নি এদিকে। পরমুহূর্তেই আবার সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বললো, জানেন ভারতবর্ষের জমিতে যে এত আল থাকে। শুধু এই আলের জন্য কত হাজার হাজার একর জমি নষ্ট হচ্ছে! সমবায় পদ্ধতিতে যদি চাষ করা যেত কিংবা রাশিয়ায় যেমন যৌথ খামার—

মণিকা ঠোঁট টেপা হাসির সঙ্গে স্বামীর দিকে চেয়েছিল। একটা কৃত্রিম বিরক্তির নিশ্বাস ফেলে বাদলের দিকে ফিরে বললো, এ ঘরের হাওয়া খুব গরম, চলুন, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে কথা বলি।

বাদল উঠে আসতেই মণিকা বললো, তিনচার মাস এদিকে আসেননি, কি ব্যাপার আপনার?

—কিছুই না। যখনই আসি, দেখি যে ভাস্কর খুব ব্যস্ত, তাই আর—

—ও ব্যস্ত থাকলেই বা। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য বুঝি আসা যায় না!

বাদল ভেতরে ভেতরে বেশ অবাক হচ্ছিল। মণিকার সঙ্গে তার আলাপ খুব বেশী নয়। ভাস্করের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক। তারও আগে তিনচার বছর ওদের আলাপ পরিচয় ছিল—তখনও মাঝে মাঝে দেখেছে মণিকাকে ভাস্করের সঙ্গে, কিন্তু দু-একটা সাধারণ কথা ছাড়া আর তেমন বিশেষ কথা হয়নি। ভাস্করের খুব ধার চাওয়ার স্বভাব ছিল আগে। এমন অনেকবার হয়েছে, মণিকার সঙ্গে যেতে যেতে পথের মাঝখানে বাদলকে দেখতে পেয়ে, ভাস্কর মণিকাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাদলকে বলেছে, শোন্, তোর সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে—তারপর বাদলকে একটু দূরে টেনে এনে বলেছে, গোটা কুড়িক্ টাকা থাকে যদি দে তো আমাকে। আমার সর্ট পড়ে গেছে—। এই অবস্থায় কোনোদিনই মণিকার সঙ্গে তেমন করে কথা বলতে পারেনি বাদল। ওদের বিয়ের পরও খুব কম এসেছে—আর সব দিনই ভাস্কর একাই বক্‌বক্ করেছে সবচেয়ে বেশী। আজ মণিকার এত ঘনিষ্ঠতার কারণ সে বুঝতে পারলো না।

বাদল মিনমিন করে বললো, আমি একদম ভালো কথা বলতেই পারি না। মেয়েদের

সঙ্গে কথা বলার তো একদমই অভ্যেস নেই।

—আপনি ওরকম সেজে থাকেন কেন?

—সেজে থাকি? কি রকম সেজে থাকি?

—এই যে সবসময় কি রকম একটা গো-বেচারা গো-বেচারা ভাব। যাই বলুন, এরকম হলে পুরুষ মানুষদের মোটেই মানায় না!

—কি করবো বলুন, সবাই তো আর আদর্শ পুরুষমানুষ হতে পারে না। আমি কতদিন ভেবেছি, ইস্, আমি যদি ভাস্করের মতন হতে পারতুম।

—এই রে, আপনার রাগ হয়ে গেল বুঝি?

—বাদল চেষ্টা করেই জোরে হেসে বসলো, না, না, রাগ করবো কেন? আমার অক্ষমতার কথা তো আমি জানি।

বাদলের মনে হলো, মণিকা শুধু অন্তরঙ্গভাবেই কথা বলছে, তাই না, তার কথায় কেমন যেন একটা আক্রমণের ঝাঁঝালো সুর ফুটে উঠছে। বাদলকে নিয়ে ইচ্ছে মতন খেলা করবার অধিকার পেয়ে গেছে। কি করে এমন হলো! মণিকা কি ওর কোনো দুর্বলতা কিংবা পাপের কথা জানতে পেরে গেছে? কিন্তু বাদলের তো সে রকম দুর্বল জায়গায় নেই—একমাত্র মল্লিকাকে আঘাত দেওয়া ছাড়া আর কোনো পাপ জীবনে করেনি—এবং মল্লিকা সেকথা কারুকে যে বলবে না, তা বাদল দৃঢ়ভাবেই জানে। মল্লিকা সেরকম মেয়েই নয়।

বিছানার ওপর শান্তিনিকেতনী নক্সাকাটা বেডকভার, মণিকা, তার ওপর সেতার বাজানোর ভঙ্গির মতন পা মুড়ে বসেছে। বাদল বসেছে জানলার পাশে বেতের চেয়ারে। বিয়ের পর মণিকার স্বাস্থ্য ফিরেছে, আগে সে ছিল একটি ছিপছিপে কুমারী, এখন বেশ ভারিক্কী ধরনের বউ। বাদলের ধারণা ছিল মণিকা খুব লাজুক মেয়ে, এখন তার স্বভাবে একটা উচ্ছলতা এসেছে। বিয়ের পর আবার পড়াশুনো শুরু করেছে মণিকা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, হয়তো সেখানকার ছোঁয়া লেগেই এমন সপ্রতিভতা এসেছে তার চোখে মুখে।

মণিকা বললো, আপনার বন্ধু আর আমি আজ বিকেলেই আপনার কথা বলছিলুম। ও বলছিল আপনি নাকি দিন দিন আরও নির্জীব হয়ে যাচ্ছেন। আমি তাই বলেছি, এবার থেকে আমিই আপনাকে ঠিক করার ভার নেবো।

—আবার ভার নেবেন! আমাকে গড়ে পিটে মানুষ করবেন?

—হ্যাঁ। আমি যা বলবো, শুনতে হবে আপনাকে।

—কিন্তু আমার তিরিশ বছর বয়েস হয়ে গেছে, এখন কি আমাকে মানুষ করা যাবে!

—খুব যাবে। কিন্তু আমি যা বলবো, শুনতে হবে কিন্তু।

—ঠিক আছে। চেষ্টা করে দেখা যাক! আপনার প্রথম হুকুমটা কি শুনি।

—সেটা পরে বলছি। আপনার তো মা আছেন। তিনি আপনাকে কিছু বলেন না?

—কি বলবেন? মা এখানে থাকেন না। মা অনেক দিন ধরে কাশীতে আছেন।

—আপনার দাদা-বৌদি তো আছেন। ঠিক আছে, ওঁদেরই বলবো। শুনুন, প্রথমেই আপনাকে একটা বিয়ে করতে হবে! বিয়ে হয়ে গেলে অবশ্য আপনাকে মানুষ করার ভার আপনার বউই নেবে।

বিয়ের কথা শুনে বাদল একেবারে ছেলেমানুষের মতো লজ্জা পেয়ে গেল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, বিয়ে বুঝি এমনি এমনি করা যায়? হঠাৎ বিয়ে করতে ইচ্ছে হলো, আর যে-কোনো একটা মেয়েকে বিয়ে করলুম, তা হয় নাকি?

—হবে না কেন? বিয়ে করা কি এর থেকে শক্ত কাজ নাকি? সবারই তো এইভাবে বিয়ে হয়।

—সবার হয় না। আপনি আর ভাস্কর যেমন দুজনে দুজনকে পছন্দ করে বিয়ে করেছেন।

—আপনার কোনো মেয়ে পছন্দ করা নেই? কোনো বান্ধবী?

—না।

মণিকা খিল খিল করে হেসে উঠে বললো, জানতুম। আমি আগে থেকেই জানতুম।

বাদল খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললো, কিন্তু এতে হাসির কি আছে। সবারই কি বান্ধবী থাকে নাকি? সবাই কি আর ভাস্করের মতন এমন ভাগ্যবান?

—আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়, আপনি কখনো মেয়েদের সঙ্গে মেশেননি। মেয়েদের সঙ্গে মিশলে আপনার এই লাজুক ভাব আর আড়ষ্টতা নিশ্চয়ই কেটে যেত। তিরিশ বছর বয়েস পর্যন্ত একটা মেয়ের সঙ্গেও ভাব হয়নি? সত্যি, অদ্ভুত আপনি! আপনার সুন্দর চেহারা, এত লেখাপড়া শিখেছেন, ভালো চাকরি করেন।

—এর সঙ্গে মেয়েদের সঙ্গে মেশার কি সম্পক?

—শুনুন, আপনাকে আমার খুড়তুতো বোন নবনীতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। দারুণ স্মার্ট মেয়ে। দেখবেন ওর সঙ্গে একটু ভাব হলেই—

বাদল এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। ও, তাহলে এই ব্যাপার।

এতক্ষণে মণিকার ঘনিষ্ঠ ব্যবহারের রহস্য বোঝা গেল। মেয়েদের সেই পুরনো ব্যাপার, সেই ঘটকালি করার আনন্দ। বাদল মনে মনে হাসলো। কোনো উত্তর দেবার আগেই ভাস্কর এসে ঢুকলো।

মণিকা জিজ্ঞেস করলো, গ্যাছে তোমার বন্ধুরা?

—হ্যাঁ। আজ তো আর চা-টা কিছুই দিলে না।

—ইচ্ছে করেই দিইনি, চা দিলে তো আর রাত্তির এগারোটার আগে উঠতো না। বাব্বাঃ, তর্কে তর্কে একেবারে কান ঝালাপালা!

ভাস্কর ঝপ্ করে বিছানায় বসে পড়ে বললো, কি রে বাদল, তুই দিন দিন ম্যাদা মেরে যাচ্ছিস কেন?

বাদল কোনো উত্তর না দিয়ে চেয়ে রইলো ভাস্করের দিকে। এইটাই তার মুশকিল, এখানে বসে থাকতে আর একটুও ভালো লাগছে না, অথচ একা একা ঘুরতেও ভালো লাগছিল না। খানিকটা বিরক্ত ভাবেই বললো, আমি তো বরাবরই এরকম। নতুন কিছু তো নয়!

—আজকাল আরও সেঁতিয়ে গেছিস মনে হচ্ছে। কি করিস সারাদিন? অনেকদিন আসিস না, পরিতোষের কাছে জিজ্ঞেস করছিলুম তোর কথা। ও তো বললো, তুই শুধু অফিসে যাস আর বাড়িতে শুয়ে শুয়ে তেরো-চৌদ্দ ঘণ্টা ঘুমোস্!

—আর, আমি যতক্ষণ ঘুমোই, পরিতোষ আমার পাশে বসে ঘড়ি দেখে, ঠিক ক'ঘণ্টা আমি ঘুমোলুম, সেই হিসেব করার জন্য? না হয় তাই করি, এ ছাড়া আর কি করার আছে? বিয়ে করার কথা বলবি তো। তুইও ঘটকালির ব্যবসা ধরেছিস বুঝি?

মণিকা অনেকক্ষণ ধরে মিটমিট করে হাসছিল, এবার শব্দ করে হেসে বললো, বাদলবাবুর মতন লোক আমি আরও দেখেছি। এইসব লোক বিয়ের কথা শুনলেই ভয় পেয়ে যায়—আর সেই ভয়টা ঢাকার জন্যই রাগের ভাব দেখায়! বাদলবাবু, আপনি কি সত্যি সত্যি রেগে গেছেন?

ভাস্কর বললো, বাদল রাগবে? ওর রাগ তুমি দেখোনি—এমনিতে শান্তশিষ্ট ছেলে, কিন্তু যখন একবার রাগে—কোনো জ্ঞানই থাকে না—একবার তো আমার সঙ্গেই—সেই যে ফোর্থ ইয়ারে—আর একটু হলে বোধহয় রক্তারক্তিই হয়ে যেত।

লম্বা ছিপছিপে চেহারা ভাস্করের, বেশিক্ষণ সিধে হয়ে বসতে পারে না, যে কোনো জায়গাতেই বসার পর একটু বাদেই গা এলিয়ে দেওয়া স্বভাব। বাদলের সামনেই সে বউয়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো, বাঁ হাতখানা রাখলো মণিকার ঊরুতে, সামান্য চাপ দিতে লাগলো। মণিকার মাংসল ঊরুতে তার হাত বসে যাচ্ছে! বাদল সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

ভাস্কর প্রসঙ্গ বদলে বললো, না, আমি বিয়ের কথা বলছিলাম না। বিয়ে করবি কিনা সেটা তোর পার্সোনাল ব্যাপার। আমি বলছিলাম, যে-কোনো একটায় কাজ করা দরকার মানুষের।

—কাজ তো করছিই। বেকার তো নই। আমি অফিসে ফাঁকি দিই না, মন দিয়ে কাজ করি।

—ও কাজ নয়। জীবনের তো একটা উদ্দেশ্য থাকা দরকার। দেশে এই অবস্থা, আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব আছে।

—দেশের দুর্দিন নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসে তর্কাতর্কি করতে আমার সত্যিই ভালো লাগে না। আমি সত্যিই ওরকমভাবে সময় কাটাতে পারি না।

—তুই আমাকে খোঁচা মেরে কতা বলছিস, বাদল। আমি নিছক তর্ক করছিলুম না, আমার পার্টির কলিগদের সঙ্গে আলোচনা করছিলুম!

—এরকম আলোচনা তোকে কলেজ জীবন থেকেই করতে দেখছি।

—তাতে আমার কিছুই উপকার হয়নি তা বলতে পারবি না। আমার নিজের অনেক ধারণা স্পষ্ট হয়েছে, অন্যদের বোঝাতে পারি—আমি এখন ট্রেড ইউনিয়ন করি, আমার যদি নিজের স্পষ্ট ধারণা না থাকে...। ঠিক আছে তুই তর্ক করতে ভালোবাসিস না, তুই অন্য কিছু কাজ কর। অনেক কাজ আছে।

কি রকম?

তুই আমাদের পার্টিতে আয়, পাঁচজনের সঙ্গে মিশে দ্যাখ—নিজেই বুঝতে পারবি কত কাজ পড়ে আছে।

—আমি বেশী লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারি না। আমার কি রকম অস্বস্তি লাগে।

—পারিস না মানে কি? চেষ্টা করে তোর ঐ মেনিমুখো ভাব কাটাতে হবে।

—কেন? কাটাতেই হবে কেন? পৃথিবীতে সব মানুষকে দারুণ স্মার্ট, দারুণ কর্মী হতে হবে? কেউ লাজুক মুখচোরা থাকবে না? ইনট্রোভার্ট মানুষের স্থান নেই পৃথিবীতে?

—সমাজবদ্ধ হয়ে বাঁচতে গেলে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু কাজ করতে হবে। আর এই বুর্জোয়াদের মাথাভারী পচা গলা সমাজ পাল্টে নতুন সুস্থ সমাজ গড়তে গেলে প্রত্যেককেই কাজ করতে হবে। আমাদের স্টাডি সার্কেল হয়, নাইট ক্লাস হয়—তুই তো সেখানেও পড়াতে পারিস, তুই লেখাপড়ায় ভালো ছিলি।

—আমার দ্বারা ও কাজ সম্ভব নয়!

—তুই তাহলে কোনো দায়িত্বই নিতে চাস না?

—আমার দ্বারা কারুকে পড়ানো সম্ভব নয়। আমার ভাইপোকে পড়াতে গিয়ে দেখেছি, তাও পারি না। শোন্, একটা কথা বলি। প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলো চরিত্রবৈশিষ্ট্য আছে—সেগুলো স্বীকার করে না নিয়ে সবাইকেই এক নিয়মে ফেলা যায় না। কিছুতেই যায় না! আমি অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ করেছি। আমি হিসেব-নিকেশের ব্যাপারই ভালো জানি। চুপচাপ একা একা বসে হিসেব দেখার কাজ করতে আমার ভালো লাগে! সমাজে কি ভালো অ্যাকাউন্টেন্টেরও প্রয়োজন নেই? এখন ব্রিটিশ কোম্পনির হয়ে কাজ করছি, যদি কোনোদিন শ্রেণীহীন সমাজ আসে—সেদিন সেই

সমাজের জন্যই করবো। এখন ফাঁকি দিই না, তখনো ফাঁকি দেবো না। আজ যারা অফিসের কাজকর্ম ফাঁকি দিয়ে বিপ্লব আর রাজনীতির কথা বলে, তারা শ্রেণীহীন সমাজ হলে তখনও ফাঁকি দেবে! এই পচা গলা সমাজটাকে যে বদলানো দরকার তা আমিও অনুভব করি, যদি কোনোদিন সে জন্য লড়াই শুরু হয়, আমি তোদের দিকেই থাকবো, আমিও প্রাণপণ করে লড়বো—বাড়িতে আগুন লাগলে কেউ যেমন আর অলস থাকতে পারে না—আমাকে বলতে পারিস রিজার্ভ ফোর্স, এরকমও কিছু লোক থাকবে—সবাই সংগঠনের কাজ পারে না। সবাই রাস্তায় মিছিল করতে পারে না, তার মানে এই নয় যে তাদের মনের মধ্যে কোনো জ্বালা নেই—

ভাস্কর অবাক ভাবে তাকিয়েছিল বাদলের দিকে। বাদলকে একসঙ্গে এতখানি কথা প্রায় বক্তৃতার মতন সাজিয়ে সে বলতে শোনেনি। সে বাদলকে কিছু বলবার আগে মণিকা বলে উঠলো, তোমরা আবার এখানেও তর্ক শুরু করবে নাকি?

ভাস্কর হেসে বললো, না, বাদলের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তা হলে বাদল, তুই বলতে চাস্, বিপ্লব আরম্ভ হলে তুই ঝাঁপিয়ে পড়বি, তার আগে তোর কিছুই করার নেই? তাহলে, এখন কিছুই করার নেই যখন তাহলে একটা বিয়ে করেই ফ্যাল না হয়।

—কাকে? তোর শ্যালিকাকে?

—মন্দ কি? মণির খুড়তুতো বোন নবনীতাকে দেখতে বেশ, এবার বাংলা অনার্স নিয়ে পাশ করেছে।

—আমার বিয়ে না করার অনেকগুলো কারণ আছে, তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে, বিয়ে করলেই আমি তোর মতন বোকা হয়ে যাবো। তখন আবার অন্যদের বিয়ের ঘটকালি করতে শুরু করে দেবো হয়তো?

ভাস্কর কোনো শ্লেষ গায়ে মাখে না। বাদলের খোঁচা খেয়েও সে হেসে উঠলো, দু'হাত দিয়ে মণিকার উরু আরও ভালো ভাবে জড়িয়ে ধরলো। ভাস্করের চক্ষুলজ্জারও কোনো ব্যাপার নেই! মণিকা ভাস্করের হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে বসার চেষ্টার করে বললো, মোটেই আমরা ঘটকালি করছি না। আপনাকে শুধু ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাইছি—

বাদল এবার মণিকার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললো, কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার মিশতেও ইচ্ছে করে না। জানেন, একবার একটি মেয়েকে আমি দারুণ আঘাত দিয়েছিলাম—সেই অনুশোচনা আমাকে সব সময় পুড়িয়ে মারছে। সে আমাকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না। অথচ তাকে ছাড়া অন্য কারুকে বিয়ে করাও আমার পক্ষে অসম্ভব।

মণিকা বললো, তাই নাকি? এরকম ব্যাপার! মেয়েটি কে জানতে পারি? ভাস্কর

বললো, ও হ্যাঁ, তোর সঙ্গে তো সেই মল্লিকার কি যেন হয়েছিল। ঠিক কি হয়েছিল, বল তো?

—সে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব না।

—আরে বলই না। আমাদের কাছে আর লজ্জা কি। তুই হয়তো যতটা সিরিয়াস ভাবছিস—অতটা কিছুই নয়? বিয়ের আগেকার প্রেমে-ট্রেমে ওরকম কাব্য হয়! কি, বাচ্চা হয়ে গিয়েছিল?

—ধ্যাৎ! ওসব না।

—তা হলে কি? বল্ না! দয়লা করছিস কেন? মণিকার সামনে লজ্জা পাচ্ছিস? মণিকা খুব হার্ড বয়েল্ড—ওর কাছে কোনো কথাই শকিং নয়। আমি তো ওর সামনেই অনেক খিস্তি করে ফেলি মাঝে মাঝে।

—না রে ভাস্কর, সেকথা আমি কোনোদিন কাউকে বলতে পারবো না। মল্লিকার সেই মুখখানা যখন আমার মনে পড়ে—আমি আর স্থির থাকতে পারি না—আমি একটা পিঁপড়েও মারি না কক্ষনো, কোনোদিন কারুকে আঘাত দিইনি, অথচ ওর মতন একটা সরল মেয়েকে কেন যে ওরকম অপমান করেছিলাম—

মণিকা এবার আর ঠাট্টার ভঙ্গিতে হাসলো না, খানিকটা সহানুভূতির সঙ্গেই বললো, কতদিন আগেকার ব্যাপার বলুন তো?

—পাঁচ ছ বছর!

—তা হলে, মেয়ে হিসেবে আপনাকে আমি একটা কথা বলতে পারি। মেয়েরা তো পাঁচ ছ বছর আগের ঘটনা তেমন মনে রাখে না। মেয়েদের কাছে বর্তমান কালটাই আসল। হয়তো সে মেয়েটি এতদিনে অনেক কিছুই ভুলে গেছে।

ভাস্কর বললো, কে চিনতে পারছো তো? তোমাদের প্রফেসর! মণিকা এবং বাদল দুজনেই অবাক হয়ে তাকালো। মণিকা জিজ্ঞেস করলো, আমাদের প্রফেসর? কে?

—তোমাদের যাদবপুরে পড়ায়। মল্লিক সরকার। চেনো না?

—মল্লিকা সরকার? সে কি! খুব চিনি। আমাদের হিস্ট্রি পড়ান—

বাদল অস্পষ্টভাবে শুনেছিল যে, মল্লিকা কোথায় যেন অধ্যাপিকা হয়েছে, কিন্তু সে যে যাদবপুরে এসেছে এ খবর জানতো না। সামান্য চোখ কুঁচকে বাদল চেষ্টা করলো অধ্যাপিকা হিসেবে মল্লিকার চেহারাটা একবার ভাবতে। সরল ছেলেমানুষের মতন মুখ মল্লিকার, সে কি করে গম্ভীর হয়ে ক্লাসে পড়ায়? এই তো ভাস্করের স্ত্রী মণিকা—এর যে রকম ভারিক্কী চেহারা, এ রকম ছাত্রীদের সামনে মল্লিকাকে কি রকম দেখায়?

বাদল হঠাৎ খুব সচকিত হয়ে উঠলো, সে কিছুতেই মল্লিকার চেহারাটা স্পষ্ট ভাবে মনে করতে পারছে না। এ যে অসম্ভব ব্যাপার। মল্লিকার প্রতিটি ভঙ্গি, হাসি বা দুঃখের

সময় তার মুখের রেখার পরিবর্তন, সবই বাদলের চোখের মধ্যে ছাপ মারা ছিল, অথচ এখন সে মল্লিকার মুখটাও মনে করতে পারছে না! আজই সন্ধ্যেবেলা মঞ্চের ওপর বল্লরীকে দেখতে দেখতে সে মল্লিকার কথা ভাবছিল। মল্লিকাও ভালো গান গায়—গানের সময় মল্লিকা কি রকম ভাবে একটু একটু মাথা দোলায়—তা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, অথচ এখন কি তার স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গেল! বাদল অতিক্রত অন্য সব চেনা মানুষের মুখ—এমন কি বল্লরীরও মুখ ভেবে নেবার চেষ্টা করলো, সবকটা ছবিই নিখুঁত—শুধু মল্লিকার চেহারাটা ছায়াচ্ছন্ন, যেন সেই নদীর পারে অল্প জ্যোৎস্নামাখা অন্ধকারে মল্লিকা কোথায় লুকিয়েছে, বাদল তাকে খুঁজে পাচ্ছে না।

মণিকা বললো, ভাবাই যায় না, বাদলবাবুর সঙ্গে আমাদের প্রফেসর মল্লিকা সরকারের...। কথা শেষ করলো না মণিকা, কলসীতে জল ভরার মতন ভুক্ ভুক্ করে হাসতে লাগলো।

ভাস্কর জিজ্ঞেস করলো, এতে হাসির কি হলো?

—সত্যি আমি ভাবতে পারছি না, মল্লিকা সরকারকে দেখলে মনেই হয় না উনি কোনোদিন—। এক একজন মানুষ আছে না—দেখলে মনে হয় কোনোদিনই ভালোবাসা-টালোবাসা এইসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি—সেই রকম! একদিন আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে—

মণিকার প্রগল্‌ভতা থামিয়ে দিয়ে বাদল বললো, আপনি তো আমাকে দেখেও ভেবেছিলেন, আমার পক্ষেও কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করাই সম্ভব নয়।

মণিকা হাত জোড় করে লঘু গলায় বললো, ক্ষমা চাইছি সে জন্যে।

॥ পাঁচ ॥

দিন চারেক পরে বাদলের অফিসে ছুটির একটু আগে ভাস্কর এসে হাজির। আগে কিছু খবর দেয়নি, হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। ভাস্কর সাধারণত এই ভাবেই আসে। আগে এরকম হঠাৎ এলে বাদল বুঝতে পারতো, ভাস্কর টাকা ধার চাইতে এসেছে। তাতে যে বাদল খুব বিরক্ত হতো তা নয়, শুধু একটু লজ্জা বোধ করতো।

বাদল সব সময়েই অনুভব করে যে, তার আয় তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী। আরও দু'তিনশো টাকা কম মাইনে পেলেও তার চলতো। তার কোনো বাজে খরচ নেই—দিনে এক প্যাকেট সিগারেট ছাড়া নিত্য নতুন জামা কাপড় কেনা কিংবা ক্যামেরার ছবি তোলার শৌখিনতাও তার নেই, অকারণে ব্যাঙ্কে টাকা জমাতেও তার ভালো লাগে না। নিজের জীবন সম্পর্কে তার কোনো পরিকল্পনা নেই, শুধু শুধু টাকা জমিয়ে কি করবে! কেউ ধার চাইলে টাকা দিতে বাদলের ভালোই লাগে, শুধু একটু লজ্জা হয়। তার মনে হয়, যে টাকা ধার চাইবে সে নিশ্চয়ই টাকার কথাটা প্রথম

বলতে খুব অস্বস্তি বোধ করবে। তার সেই অস্বস্তির জন্য বাদলই যেন দায়ী। ভাস্করকে দেখলে বাদল নিজে থেকেই টাকা পয়সার কথা তুলতো, তার অতিরিক্ত বোনাস কিংবা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নিয়ে আলোচনা করতো।

ভাস্কর সব সময়ই পরশুদিন ফেরত দিয়ে যাবে বলে টাকা নিয়ে কোনোদিনই দিত না। আজকাল অবশ্য ভাস্কর আর ধার চায় না, মণিকার জামাইবাবুর সঙ্গে একত্রে সে কি একটা ব্যবসা শুরু করেছে, তাতে তার ভালোই রোজগার হচ্ছে মনে হয়।

ভাস্কর বললো, জানতুম তোকে অফিসে পাবোই।

—কি করে জানলি?

—ঐ যে সেদিন বললি, তুই কাজে ফাঁকি দিস না। আর সবাই কাজে ফাঁকি দেয়, অফিস থেকে পালায়—তুই তো আর তা করবি না।

—আমাদের এটা ব্রিটিশ কোম্পানি—জেনারেল ম্যানেজার এখনো খাস ইংরেজ, এখানে কাজে ফাঁকি দিলে চাকরি থাকবে না।

—তোকে কাজে ফাঁকি দিতে হবে না, আমি তোকে ডিসটার্ব করবো না! তুই হাতের কাজ সেরে নে।

—আমার আজকের কাজ শেষ হয়ে গেছে।

—চল্। তা হলে বেরিয়ে পড়ি।

—বেরিয়ে কোথায় যাবো?

—ঐ তো তোর দোষ! কোথায় যাবো! না ভেবে বুঝি বেরুনো যায় না? ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যেবেলা তোর কি কি কাজ আছে বল তো?

—কাজ! সন্ধ্যেবেলা আবার আমার কি কাজ থাকবে?

—নেই? খুব হতাশ করলি। আমি ভেবেছিলুম, তুই অনেকগুলো কাজের ওজর দেখাবি, আমি সেগুলো খণ্ডন করবো—যাকগে, কাজ নেই যখন, ভালোই হলো, তুই? আজ সন্ধ্যেটা আমাদের সঙ্গে কাটাবি। মণি তোকে নেমন্তন্ন করেছে। নে, ফাইলপত্তর গুটো। এখনো শালা ইংরেজদের ব্যবসাপত্তরে তোরা মদত দিয়ে যাচ্ছিস—

বাইরে রাস্তায় আজ খুব ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। এতক্ষণ গুমোট, টক্‌টক্ গন্ধ ভরা এয়ার কণ্ডিশান্‌ড ঘরে থাকার পর বাইরে এসে খুব ভালো লাগলো বাদলের। খুব ক্বচিৎ গ্রীষ্মের বিকেলে কলকাতার আবহাওয়া এত ভালো থাকে। আজ ভাস্করকে বাদলের কি রকম যেন রহস্যময় মনে হলো। ভাস্কর কথা বলছে কি রকম যেন হালকা হালকা ভাবে, সব কথাই ইয়ার্কির সুরে। ভাস্করের সময় কাটাবার কোনো সমস্যা নেই। কোনো না কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে সে এ রকম ভাবে বাদলের অফিসে আসতো না। মণিকারও হঠাৎ এ রকম ভাবে নেমন্তন্ন করে ডাকা কিছুটা অস্বাভাবিক, আগে কখনো এ রকম ডাকে নি!

এক একদিন এরকম হয়, খুব চেনা মানুষেরও ব্যবহার কি রকম যেন পাল্টে যায়—কোনো রকম কার্য-কারণ বোঝা যায় না। নইলে, ভাস্করের বাড়িতে তার সন্ধ্যেবেলা নেমন্তন্ন, তবু কেন অফিস থেকে বেরিয়ে ভাস্কর বললো, চল্, এখনো তো অনেক সময় আছে, কোনো দোকান থেকে একটু চা-টা খেয়ে নিই। খুব চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। তার বাড়িতে গিয়ে চা খাওয়াই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক হতো।

চা খেয়ে বেরুবার সময়েই ঠিক বাদলের মাথায় একটা চিন্তা ঝলসে উঠলো। সে যেন বুঝতে পারল ভাস্করের এই হঠাৎ আসার কারণ। সেদিন মণিকা বলেছিল, তার বোন নবনীতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে—। এখন ভাস্করের বাড়িতে বসে একটি অচেনা চোখের সঙ্গে লাজুক লাজুক ভাবে কথা বলতে একদম ভালো লাগবে না বাদলের। বাদল থমকে দাঁড়িয়ে বললো, হঠাৎ তোদের বাড়িতে আমার কিসের নেমন্তন্ন রে আজ?

—কিসের আবার কি? এমনিই বুঝি কেউ কারুকে খাওয়ায় না? আগে থেকে নেমন্তন্ন করিনি, হঠাৎ আজই এসে বললুম, তাতে তোর প্রেস্টিজে লাগলো বুঝি?

—না, প্রেস্টিজের প্রশ্ন নয়। কিন্তু কেমন কেমন যেন লাগছে, তোমাদের মাথায় এখনো সেই ঘটকালির কথা ঘুরছে নাকি?

—ঘটকালি? ওঃ—হো—হো—

রাস্তা কাঁপিয়ে হেসে উঠলো ভাস্কর। তারপর বললো, নবনীতার কথা বলছিস তো? হ্যাঁ। নবনীতাও থাকবে আজ।

—আমি তা হলে যাবো না।

—যাবি না? কেন?

—আমার এসব ভালো লাগে না।

—তুই একটা পাগল নাকি? আমাদের বাড়িতে যাবি, সেখানে আর দু একজন অচেনা ছেলেমেয়ে যদি থাকে—তাতেই তোর আপত্তি?

—ভাস্কর, প্লিজ, আমায় ছেড়ে দে। এসব সত্যিই আমার ভালো লাগে না। একটি মেয়েটিকে বিয়ে করা যাবে কি যাবে না শুধু এই উদ্দেশ্য নিয়েই আলাপ করা, মেয়েটিও তা জানে নিশ্চয়ই। এইসব বর্বর ব্যাপার আমার একেবারে অসহ্য লাগে।

—ধ্যাৎ! ওসব কিছু নয়। যাবি, সাধারণ ভাবে গল্প করবি। দেখিস, নবনীতা খুব মজার মজার কথা বলে। এমন চমৎকার মেয়ে, বুঝলি শালা, বহু-বিবাহের যুগ থাকলে আমি কি আর ওকে ছাড়তুম, আমিই ওকে বিয়ে করে ফেলতুম।

—আমি আজ যাবো না।

—যাবি না মানে? গোঁয়ার্তুমি করিস্ না, মণি ব্যবস্থা করে রেখেছে।

ভাস্কর বাদলের কব্জী চেপে ধরলো। বাদল খুব ভালোভাবেই জানে, সে আর

বেশী আপত্তি করলে ভাস্কর এই রাস্তার মধ্যেই তাকে হিড়হিড় করে টানতে শুরু করবে ; এমন কি পাঁজাকোলা করে তোলার চেষ্টাও করতে পারে। তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু বাদলের রুচিতে ওসব বাধে। সে বুঝতে পারলো ভাস্করের কাছে আপত্তি জানিয়ে কোনো লাভ নেই। রাগে, বিরক্তিতে এক ধরনের দুঃখে তার মন ভরে গেল, সেই মুহূর্তে তার মনে হলো, পৃথিবীতে কোনো মানুষের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব করা উচিত হয়নি। হঠাৎ ভাস্করের কেন এই উৎকট খেয়াল হলো? সেদিন ওদের বাড়িতে না গেলেই হতো। সে একা থাকতে চায়, সে তো কারুর কোনো ক্ষতি করেনি, তবু কেন লোক তাকে জ্বালাতন করে? অসহায় ভাবে সে ভাস্করের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠলো।

সারা রাস্তা ধরে ভাস্কর শুধু নবনীতার গুণপনার বর্ণনা করে যেতে লাগলো। যেন গোটা ব্যাপারটাই খুব মজার ব্যাপার, সব সময় তার মুখে চাপা হাসি। বাদলের অসহায় বিরক্তি যেন সে খুব উপভোগ করছে, যেন সে এই ভাবেই জোর করে বাদলকে ছাঁদনাতলায় কিংবা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সামনে দাঁড় করাবে। বাদল ভাবতে লাগলো, মানুষ এত বোকা হয়ে যায় কি করে? ভাস্কর এমনিতে খুব সপ্রতিভ ছেলে, পলিটিক্স করে, বহু লোকের সঙ্গে মেশে, অথচ নিজের শ্যালিকার সম্বন্ধে এত উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করা যেন কি হাস্যকর তাও সে বোঝে না?

ভাস্করের ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানোই ছিল। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। বসবার ঘরে মুখোমুখি দুই নারী বসে আছে। বাদল পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ভাস্করের স্ত্রীর সামনে বসে খুব নিবিষ্ট ভাবে কথা বলছে মল্লিকা।

চেহারা বিশেষ বদলানি মল্লিকার। চোখে শুধু কালো লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমা। আগে চশমা ছিল না। সামান্য একটু যেন রোগা হয়েছে, অধ্যাপিকা সুলভ কোনো গাম্ভীর্যও আসেনি। ভাস্করের স্ত্রী তার ছাত্রী, কিন্তু মুখোমুখি দুজনে বসে আছে, যেন দুই বান্ধবী। ওরা দুজনেই মুখ তুলে তাকালো। মল্লিকার সঙ্গে চোখাচোখি হলো বাদলের, নিবিড় বিস্ময় মাত্র দু'এক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হলো মল্লিকার চোখে, মুখের একটি রেখাও বদলালো না।

বাদলের বুকের মধ্যে একবার মাত্র দপ্ করে উঠেছিল, তারপরই সে অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে গেল। কোনো আকস্মিক ঘটনা বা উত্তেজনা বা চমকের ব্যাপার হলে বাদলের মধ্যে একটা বিচিত্র পরিবর্তন হয়, প্রথম মুহূর্তটা সামলে ওঠার পরই তার শরীর ও মন আগের চেয়েও হালকা হয়ে যায়। কোনো ভাবান্তর আসে না। বাদলেরও মুখের একটা রেখাও বদলালো না, কোনো অস্ফুট শব্দ বেরুল না, নাটকীয় কিছু করলো না সে, সামান্য হেসে বললো, কি খবর মল্লিকা?

বাদল খুব ভালোভাবেই জানে, তার উপর মল্লিকার যত রাগ বা অভিমানই থাক—

কিংবা মল্লিকা তাকে যতই ঘৃণা করুক, তবুও সে লোকজনের মাঝখানে কোনো বিসদৃশ ব্যবহার করবে না, তাকে অপমান করবে না, ক্রোধকঠিন মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলবে না, এ কি! এই লোকটা এখানে আসবে জানলে আমি মোটেই আসতাম না। আমায় আগে বলোনি কেন?

মল্লিকাও সামান্য হেসে বললো, ভালো। আপনি কেমন আছেন?

তুমি থেকে আপনি হয়ে গেছে। আগে মল্লিকা লোকজনের সামনেই বাদলকে তুমি বলতো, তার বাবা-মার সামনেও। সামনে-আড়ালের দু'রকম ব্যবহার মল্লিকা কখনো করেনি। বাদল তবুও মল্লিকাকে আপনি বললো না, মুখের ক্ষীণ হাসিটা একই রকম রেখে বললো, অনেকদিন পর দেখা হলো তোমার সঙ্গে।

ভাস্করের স্ত্রী কৃত্রিম বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো, এ কি, আপনারা আগে থেকেই চেনেন নাকি?

সে যে অনেক কৌশল ও ষড়যন্ত্র করে মল্লিকাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছে, দেখা করিয়ে দিয়েছে দুজনকে, সেই সার্থকতার আহ্লাদ তার চোখে মুখে। বাদলের এবার একটু অস্বস্তি লাগলো, তার মনে হলো মল্লিকা যদি ভাবে, সে-ও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার? সেই-ই মল্লিকার সঙ্গে দেখা করার জন্য এখানে আনিয়েছে!

মল্লিকা সহজভাবে বললো, হ্যাঁ, আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়তাম। ভাস্কর-বাবুও পড়তেন সেই সময়—কিন্তু ওঁর সঙ্গে তেমন পরিচয় ছিল না, তা ছাড়া ভাস্করবাবুর তো সায়েন্স ছিল।

ভাস্কর বললো, আমি চিনতাম আপনাকে। আপনি তো কলেজে ফেমাস ছিলেন।

—যাঃ। মোটেই না।

—নিশ্চয়ই। সেই আপনি একবার ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা দল করিয়েছিলেন, আমাদের ক্লাসেও এসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন—সেবার আমিও নাম লিখিয়েছিলুম।

—তাই নাকি? আপনি সেবার ছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ, আমিও গিয়েছিলাম আপনাকে সঙ্গে। তবু দেখুন, আমার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হলো না, বন্ধুত্ব হলো এই লাজুক-মুখচোরা বাদলটার সঙ্গে।

মল্লিকা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে মণিকার দিকে চেয়ে বললো, কি, একটু চা খাওয়াবে না?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—চলো, আমি তোমাকে চা বানাতে সাহায্য করি বরং।

—না, না, আপনি বসুন মল্লিকাদি, গল্প করুন। আমার এক্ষুনি হয়ে যাবে।

—চলো না, তোমাদের ফ্ল্যাটটা ঘুরে-টুরে দেখি। বেশ সুন্দর ছিমছাম ফ্ল্যাটটা

তোমাদের।

—আসুন তা হলে। মল্লিকাদি, আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি? আমি থাকি বিবেকানন্দ রোডের কাছে—আমাদের সেই পুরনো সেকেলে আমলের বাড়ি।

—অতদূরে? ওখানে থেকে ইউনিভার্সিটিতে আসেন কি করে?

—কেন, এইট-বি বাস।

বাদল জানলার বাইরে আরক্ত আকাশ দেখছে। সারাদিন গুমোট গরমের পর ফিনফিনে পাতলা হাওয়ায় ভরে গেছে দশদিক। ভাস্করদের বাড়ির পাশেই দুটো লম্বা নারকেল গাছ, পাতাগুলো দুলছে ঝিলমিল করে। চূড়ার কাছে এখনো লেগে আছে রোদ্দুরের অবশিষ্ট দু'একটি রেখা। আকাশ এখনও স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু আলতো অন্ধকার নেমে এসেছে মাটিতে—ঠিক সন্ধ্যে হবার এই মুহূর্তটাতে হঠাৎ কেন যেন মন খারাপ লাগে। বাদলের মনে হলো, তার বুকের মধ্যে কোনো যন্ত্রপাতিই নেই, হৃৎপিণ্ডও নেই—সম্পূর্ণটা ফাঁকা, সেখানে এই সন্ধ্যার মুহূর্তটার মতন আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। মল্লিকার সঙ্গে যাতে তার চোখাচোখি না হয়, বাদল এই জন্য একটু পাশের দিকে ঘুরে বসলো।

মল্লিকা উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের ছবি দেখালো, আলমারির বইগুলোও দেখে নিল এক নজরে, তারপর, মণিকার সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেল।

ভাস্কর মাঝে মাঝে নিঃশব্দে অট্টহাসি হাসতে পারে। সমস্ত মুখটা ফাঁক হয়ে যায়, চোখ দুটো বুঁজে আসে—প্রথম হাসির চিহ্ন ফুটে ওঠে তার মুখে, কিন্তু একটুও শব্দ বেরোয় না। কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় থেকে দু'হাতে একটা চাঁটি দিয়ে হাসি শেষ করে। সেই রকম অট্টহাসি হেসে ভাস্কর বললো, বেশ ভালো লাগে মাইরি এ রকম নাটক দেখতে।

বাদল উদাসীন ভাবে বললো, কি নাটক?

—এই যে তোরা দুজনে এমন মুখ করে রইলি যেন দুজনের কেউ-ই ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানিস না। তুই তো এমনভাবে কথা বললি যেন ওকে ভালো করে চিনিস্ না, নাম জানিস না, একদিন শুধু রেলের কামরায় একটু আলাপ হয়েছিল! ধুস্!

—ভাস্কর, তুই তো অনেক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকিস, হঠাৎ এই খেয়াল তোর মাথায় চাপলো কেন? শুধু শুধু এই জন্য সময় নষ্ট করছিস।

—তোর ভালোর জন্য!

—সারা দেশের মানুষের ভালোর জন্য তোর ব্যস্ত থাকার কথা, শুধু শুধু আমার একার জন্য—

—ঐ একই কথা! কেউ প্রেম-ফ্রেম কিংবা মান-অভিমান নিয়ে সময় নষ্ট করবে এটা আমার একেবারে পছন্দ হয় না!

—সব কিছু বুঝি তোর পছন্দ মতন চলবে?

—এঁড়ে তর্ক করিস না! শোন্ আগে—এখন তুই অন্ধ হয়ে আছিস, ভালোবেসেও যদি একটা মেয়েকে না পাওয়া যায়—তা হলে সেই মেয়েটার কথাই সমস্ত মন জুড়ে থাকে, তখন আর অন্য কোনোদিকে দৃষ্টি যায় না! কিন্তু একবার বিয়ে ফিয়ে করে ফেললে দেখবি—এসবের চেয়েও জীবনে অনেক কিছু করার আছে! আমি একটা ভেটারান্ লোক, আমার কথাটা শুনে দেখ্!

—তুই তো অনেক কিছুই জানিস! কিন্তু এই সামান্য জিনিসটা জানিস না—একটি ছেলে আর মেয়ের নিজস্ব কোনো ব্যাপারে তৃতীয় কারুর হস্তক্ষেপ একেবারেই মানায় না। ভালোবাসা জিনিসটা একান্ত ব্যক্তিগত বলেই মানুষ এতকাল ধরে তাকে আঁকড়ে আছে। সবাই মিলে আলোচনা করে, যুক্তিতর্ক দিয়ে ভালোবাসা যায় না! তুইআর তোর বউ মিলে আজ যে ব্যাপারটা—

—ধ্যাৎ শালা, এখানে ভালোবাসার কোশ্চেন আসছে কি করে? এ তো মান-অভিমানের ব্যাপার! অভিমান জিনিসটা অসুখের মতন, একে বাড়তে দিলে বেড়েই চলবে, ইঞ্জেকশান না দিলে এ অসুখ ছাড়ে না। মল্লিকার সঙ্গে তোর কি ঝগড়া হয়েছিল জানি না, জানতেও চাই না। আজ দেখা হয়েছে, হাঁটু গেড়ে মাপ চেয়ে নে না। মেয়েছেলের কাছে মাপ চাইতে কোনো লজ্জা নেই, এটাও একটা ফ্যাশান।

—ভাস্কর, তুই বুঝি সব মেয়েদেরই আড়ালে মেয়েছেলে বলিস?

ভাস্কর এবার শব্দ করেই হেসে উঠলো। টেবিলের ওপর দুখানা পা তুলে দিয়ে বললো, হ্যাঁরে—আমার নিজের বউকেও বলি। তোদের মতন এত রোমাণ্টিক ছেলেছোকরাদের নিয়ে কি হবে দেশের! খালি সব কিছু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখা। প্রেম আর ভালোবাসা নিয়ে আদিখ্যেতা। আমাকে দেখ না। আগে তিন-চারটে মেয়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছি, তারপর মণিকাকে বেশী পছন্দ হয়ে গেল, ওকেই বিয়ে করে ফেললুম। এখন আর কোনো ঝামেলা নেই!

—আমারও তো কোনো ঝামেলা নেই এখন। আমি যদি একা একা থাকতে চাই, তাতে কারুর ক্ষতি হয় কি?

—তোর ভালোর জন্যই বলছি, মল্লিকার সঙ্গে মিটিয়ে ফ্যাল ব্যাপারটা—তারপর দেখবি জীবনে আরও কত কি করার আছে? শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট করা।

ট্রে ভর্তি খাবার ও চা নিয়ে ঢুকল মণিকা। বাদলের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বললো, কি, আপনি এত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন কেন?

ভাস্কর বললো, তা কি আর করবে বেচারা! মল্লিকাকে তুমি এতক্ষণ পাশের ঘরে

আটকে রেখেছো।

—আসুন মল্লিকাদি। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বাদলের মনে হলো, ওরা স্বামী-স্ত্রীকে অনেকদিন পর যেন বেশ একটা কৌতুকের সুযোগ পেয়েছে। ভাস্কর তার অফিস আর রাজনৈতিক তর্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মণিকা অধিকাংশ সময়েই একা একা থাকে, তার সময় কাটতে চায় না। আজ ওরা স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে মিলে এই ষড়যন্ত্রে মেতে খুব আনন্দ করে নিচ্ছে, বাদল যেন ওদের হাতের খেলার পুতুল।

মল্লিকা বললো, বেশ সুন্দর আপনাদের ফ্ল্যাটটা। আর মণিকা খুব গুছিয়ে রাখতেও জানে। কেমন চমৎকার মানিয়েছে! মণিকা, এত সব খাবার তুমি নিজে হাতে বানিয়েছো!

—বিস্কুটগুলো ছাড়া। বিস্কুট আমি নিজে বানাতে জানি না।

ঘরের তিনজনেই এবার হেসে উঠতে হলো। মল্লিকা হাসতে হাসতে বললো, সেটা বললেও অবাক হতুম না! এই সব পুডিং, নিম্‌কি, ওটা কি? চিড়ের পোলাও, কখন এসব বানালে?

—আজ তো একটায় ক্লাস ছিল ; সকালে বসে বসে বানালুম। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, আপনাকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি। অবশ্য, আপনি কারুর বাড়িতে যান না শুনেছিলুম।

—কে বললে? কেন যাবো না। তা বলে, এত খাবার তুমি আমার জন্য বানিয়েছিলে?

—এত আর কোথায়? আপনার জন্যই বানিয়েছি, বাদলবাবুর তো আজ আসবার কথা ছিল না।

ভাস্কর কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে সুযোগ না দিয়েই মণিকা আবার বললো, জানেন মল্লিকাদি, আমার নিজের হাতেই সব কিছু করতে ভালো লাগে। বাড়িতে কোনো ঝি-চাকরও রাখিনি, একটা ঠিকে ঝি শুধু দু'বেলা বাসনগুলো মেজে দিয়ে যায়।

—সে তো খুব ভালো কথা।

ভাস্কর বললো, শুধু কথা বলে জিনিসগুলো ঠাণ্ডা করবো? না খেতে খেতে কথা বলবো? নে বাদল, শুরু কর। তুই তো আসতে চাইছিলি না, এখন বল, এসে ঠকেছিস?

বাদলের অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছে। ভাস্কর আর মণিকা বড় বেশী বলছে, গায়ে পড়েই দেখাতে চাইছে যে, বাদল আর মল্লিকার আজ এখানে দেখা হয়ে যাওয়াটা নেহাত আকস্মিক। ওদের কোনো ভূমিকা নেই। ওরা তো জানে না, মল্লিকা শান্ত ধরনের মেয়ে হলেও মোটেই বোকা নয়। বাদল চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল।

ভাস্কর বললো, আচ্ছা মল্লিকা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

বাদল আর মল্লিকা দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে তাকালো ভাস্করের দিকে। দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল, এক সেকেণ্ডেরও একটা টুকরো সময়ের জন্য থেমে রইলো চোখে চোখ, আবার সরে গেল।

মল্লিকা বললো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বলুন।

—এই কলেজে পড়ানোর চাকরি আপনার ভালো লাগে? কোনো অসুবিধে হয় না?

—কেন, অসুবিধে হবে কেন?

—আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে পড়ে তো—যা সব দুর্দান্ত ছেলে এখানকার, মানে, আমি ভাবছিলুম, আপনি এ রকম ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ, ক্লাস ম্যানেজ করেন কি করে? আপনাকে মানে সবাই?

মল্লিকা মৃদু হেসে বললো, আপনার বউ-ই তো পড়ে আমার ক্লাসে, ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

—মল্লিকাদিকে কিন্তু ক্লাসের সবাই খুব ভালোবাসে। কেউ কোনো গণ্ডগোল করে না। মাঝে মাঝে শুধু...সেদিন সেই ছেলেটা, অভিজিৎ—মল্লিকাদি মনে আছে?

—দু'একজন তো একটু দুষ্টু হবেই?

ভাস্কর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি করেছিল সেই অভিজিৎ?

মণিকা হাসি চাপার ব্যর্থ চেষ্টায় মুখটা লাল করে বললো, উঃ, কি পাজী ছেলে, ক্লাসের এত মেয়ে...

মল্লিকা বললো, থাক্, ও কথা থাক্।

ভাস্কর বললো, কেন, শুনি না! মজার ব্যাপার মনে হচ্ছে!

—মল্লিকাদি, বলবো? বলি না, কি আর হবে?

—না, ইউনিভার্সিটিতে আমাদের সব ব্যাপার বাড়িতে বলতে নেই। তুমি তোমার বরের কাছে সব কথা বলো?

বাদল একটা কথাও বলেনি। শুধু নিরাসক্ত ভঙ্গিতে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। শেষ কথা শুনে সে চমকে তাকালো, এবার চোখোচোখি হলো না, তাই বাদল মল্লিকার মুখের দিকেই চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। কোনো কথা গোপন করার অভ্যেস তো মল্লিকার আগে ছিল না। তাছাড়া, তার গলার স্বর শান্ত থাকলেও, সে যেন প্রগল্‌ভতার জন্য মণিকাকে ভর্ৎসনা করছে—সে যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে—মণিকার স্বামীকে লুকোবার মতও দু'একটা ব্যাপার আছে।

মণিকা সঙ্গে সঙ্গে লঘু ভঙ্গি পালটে ফেলে বললো, যাই বলো, মল্লিকাদির কথা কিন্তু সবাই শোনো। সেই অভিজিৎকেও উনি যখন ডেকে বললেন...মেয়েদের চেয়েও

ছেলেরা ওঁর কথা বেশী শোনে!

অপ্রত্যাশিতভাবে ভাস্কর বললো, ছেলেরা আপনার কথা শোনে! তা হলে এই বাদলটাকে একটু বকে দিতে পারেন না! ও দিনের পর দিন মন মরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বাদল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আমাকে এবার যেতে হবে।

ভাস্কর ওর কথা গ্রাহ্য না করে বলে চললো, আপনি বাদলের বন্ধু ; আপনার উচিত ওর দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া। ছেলেটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মল্লিকা একটুও বিচলিত হলো না, সেও খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বললো, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি সে রকম নই।

—কি ভুল বুঝেছি? কিছু ভুল বুঝিনি, ঠিকই বুঝেছি। আপনি আর বাদল—দুজনেই বড্ড ছেলেমানুষ।

মল্লিকা এবারও সেই একই স্বরে বললো, তা হয়তো ঠিক।

বাদল উঠে দাঁড়িয়েছে, মণিকা খপ করে তার হাত ধরে বললো, যাচ্ছেন কোথায়? বসুন। ইস্! লজ্জায় আপনার মুখখানা যে টকটকে লাল হয়ে গেছে!

বাদলের সহজে রাগ হয় না, কিন্তু এখন তার সমস্ত শরীরটা রাগে জ্বলতে লাগলো। বাদল সহজে মানুষকে ঘৃণা করতে চায় না, কিন্তু এখন ভাস্কর আর মণিকার ওপর তার অসম্ভব ঘৃণা হলো। মণিকা তার হাত ধরে আছে, ঘৃণায় তার শরীরটা শিরশির করছে। বাদলের ইচ্ছে হলো, তার হাত দুখানা মুষ্টিবদ্ধ করে সে ভাস্করের নিচু হওয়া ঘাড়ে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করে। ওদের স্বামী-স্ত্রীর এই বর্বরতা সে সইতে পারছে না। এরা মানুষের অনুভূতির কোনো মূল্য জানে না। অথচ এরাই তৃপ্ত, এরাই সুখী। আঃ, কেন যে সে আজ ভাস্করের সঙ্গে এসেছিল। আর কোনোদিন সে ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। আস্তে ঝাঁকুনি দিয়ে মণিকার কাছ থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

ভাস্কর বললো, আরে মশাই, বুঝি না আপনাদের ব্যাপার-স্যাপার।

মণিকা ধমকে উঠলো, ওকি, তুমি মল্লিকাদিকে মশাই বলছো কেন?

মল্লিকা কথা না বলে শুধু হাসি মুখে তাকিয়ে রইল।

—আপনাদের ব্যাপারটা কি বলুন তো! এ-ঘরে দুজনে দু'দিকে মুখ ঘুরিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইলেন! এসব কি ছেলেমানুষী! কি হয়েছিল আপনাদের, বলুন না, আমরা মীমাংসা করে দিচ্ছি!

—ভাস্করবাবু, আপনি খুব সরল লোক।

—আপনারাও একটু সরল হোন না বাবা! বাদল কি অন্যায় করেছিল, বলুন, দু'ঘা দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করে দি। চুকে যাক্ সব।

ভাস্কর যেন ক্ষেপে গেছে। সোফার ওপর পা তুলে দিয়ে সে আরও ঝুঁকে বসলো

মল্লিকার দিকে। তার নিশ্বাসও বোধহয় মল্লিকার গায়ে লাগছে।

বাদল এগিয়ে এসে মৃদু গলায় বললো—মল্লিকা, তুমি এখন বাড়ি যাবে? চলো আমার সঙ্গে।

মল্লিকাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, হ্যাঁ, চলুন।

বাদলই ঝুঁকে মল্লিকার হাত ব্যাগটা তুলে তার হাতে দিয়ে বললো, এসো। মল্লিকা অত্যন্ত সহজ গলায়, ভাস্করদের দিকে ফিরে বললো, খুব ভালো লাগলো আজ। আজ চলি এখন, ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে! চলি মণিকা, কাল তো ইউনিভার্সিটিতে দেখা হবেই।

ভাস্কর আর মণিকা দুজনেই যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। ভাস্কর বললো, যা বাবা! এত সহজেই মিল হয়ে গেল!

কেউ কোনো উত্তর দিল না। দরজার দিকে এগিয়ে এলো ওরা।

মণিকা বললো, মল্লিকাদি, আপনি রাগ করেননি তো? আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে—

মল্লিকা ঘুরে দাঁড়িয়ে মণিকার বাহু স্পর্শ করে আন্তরিক ভাবে বললো, না না, রাগ করবো কেন! খুব সুন্দর খাবার বানিয়েছিলে, খুব ভালো লাগলো।

রাস্তায় বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটার সময় দুজনেই কিছুক্ষণ নিঃশব্দ। বাদল বুঝতে পারলো, তার কিছু বলা উচিত? কিন্তু হঠাৎ তার মধ্যে একটা অযৌক্তিক ইচ্ছে জেগে উঠলো। আবছা অন্ধকারময় টালিগঞ্জের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হলো, মল্লিকারই উচিত তার কাছে ক্ষমা চাওয়া। সে পুরুষ, তার আত্মাভিমানে মল্লিকার এতখানি আঘাত দেওয়া উচিত নয়। মল্লিকা যদি একবার বলে, বাদল, আমি ভুল করেছিলাম, সামান্য একটা ছেলেমানুষীর জন্য আমি অন্যায়ভাবে—তা হলে, বাদল তক্ষুনি মল্লিকার হাত জড়িয়ে ধরে অসম্ভব তৃপ্তি বোধ করতে পারে। সমস্ত পৃথিবী তার কাছে আবার অর্থময় হয়ে উঠতে পারে।

সে রকম কিছুই ঘটলো না। কেউ একটা কথাও বললো না। হয়তো বাদলের মতন মল্লিকাও মনে মনে অনেক কথা বলছে। কিন্তু মল্লিকার মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। অসম্ভব আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাদল মল্লিকাকে ভাস্করের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ডাক দিয়েছিল, মল্লিকা শুধু তার মর্যাদা দিয়েছে।

বাদলই প্রথম জিজ্ঞেস করলো, তুমি কবে চশমা নিয়েছো?

—দেড় বছর আগে।

—আর কোনো ছাত্র-ছাত্রী বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে, চট করে যেতে রাজী হয়ো না—এই রকম বিপদ হতে পারে।

—বিপদ আর কি?

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। বাস স্টপে এসে দাঁড়ালো দুজনে। মল্লিকাকে বাস বদলাতে হবে—কিন্তু এখান থেকে ওদের দুজনেই একসঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। একটা বিজ্ঞাপনের নিয়ন আলোর রঙিন আভা পড়ছে মল্লিকার মুখে। চশমার নিচে তার চোখের দৃষ্টি কোন দিকে ঠিক বোঝা যায় না। শুধু, একটু দ্রুত নিশ্বাসে তার বুক দুটি ঘন ঘন দুলে উঠছে। মল্লিকার বুকের দিকে তাকিয়েই বাদলের সমস্ত শরীরে যেন ঝনঝন শব্দ হতে লাগলো।

বাদলই আবার বললো, বল্লরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তোমাকে বলেছে?

—না

—দুবার দেখা হয়েছিল। প্রথমবার হঠাৎ দেখা হয়েছিল বিডন্ স্ট্রিটের কাছে দ্বিতীয়বার আমি ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

—ও!

—তুমি বারণ করেছিলে বল্লরির সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু একটা বিশেষ কারণ ছিল, আমি দেখা না করে পারিনি!

মল্লিকা এবার কিছুই বললো না। শিশু যেন কোনো অপরাধ করে ফেলে অভিভাবকের কাছে কৈফিয়ত দিচ্ছে, এই রকম ভাবে বাদল বললো, বল্লরীকে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম, আমি জানতাম লোকটা খুব খারাপ, তাই বল্লরীকে সাবধান করতে চেয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে, আমাদের ফাংশানে বল্লরী সেই লোকটির সঙ্গে গান গাইতেও এসেছিল। তুমি এসব কিছুই জানো না?

—না।

—তুমি কি জানো বল্লরী সিনেমায় নামছে?

—সিনেমায়?

—হ্যাঁ, গৌতম রায় বলে একজন গায়কের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছে, সেই লোকটাই ওকে সিনেমায়—তুমি তো জানো না, ওসবের মধ্যে কত কুৎসিত ব্যাপার থাকে।

—বল্লরী বোকা নয়, সে কোনো ভুল করবে না।

—তুমি জানো না, ঐ জগৎটা বড় সাংঘাতিক! ওখানে অনেক কিছু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়।

মল্লিকা এবার পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ালো বাদলের দিকে। স্পষ্ট চোখে চোখ রেখে উত্তাপহীন গলায় বললো, বল্লরী তো এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে, এখন ও নিজের ভালোমন্দ ঠিকই বুঝতে পারবে। আমি ঐ ট্রামটায় উঠবো।

দুজনেই উঠলো একই ট্রামে। সে ট্রামে একটি মেয়ে ছিল না, সব কটি সিটেই পুরুষ বসে ছিল। মল্লিকাকে দেখে দুজন অনিচ্ছুক পুরুষ গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে

দাঁড়ালো। বাদলের দুরন্ত ইচ্ছে হলো সে গিয়ে মল্লিকার পাশে ঝুপ করে বসে পড়ে। কিন্তু এসব জায়গায় স্বাভাবিক ভদ্রতা যে ঐ দুজনের একজনকেই বসতে অনুরোধ করা। বাদলের ইচ্ছে হলো লোকদুটোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে নিজে গিয়ে বসবে। তবু, বাদলের ইচ্ছে যতই তীব্র হোক, সে অভদ্র ব্যবহার সহজে করতে পারে না। তার দ্বিধার জন্য একটু দেরী হলো, মল্লিকাও মুখ ফিরিয়ে তাকে ডাকলো না, সেই অবসরে একজন লোক বসে পড়লো মল্লিকার পাশে। বাদলের গা জ্বলে গেল। লোকটার মুখখানা বাদল খুব ভালো করে চিনে রাখলো, মনে মনে ঠিক করলো, কোনোদিন একলা পেলে ঐ লোকটাকে সে অকারণে খুব অপমান করবে।

তারপর ক্রমশ ভিড় বাড়তে লাগলো, ভিড়ের ধাক্কায় বাদলকে দূরে সরে যেতে হলো, মল্লিকাকে আর দেখতে পেল না। ট্রামের কর্কশ শব্দ, লোকজনের গোলমাল আর ঘামের গন্ধের মধ্যে সে ডুবে যেতে লাগলো। মনোহরপুকুরে ধাক্কাধাক্কি করে নামার সময় মল্লিকাকে জানলার পাশে দেখতে পেল না। মল্লিকা নিশ্চয়ই টু-বি বাস ধরার জন্য রাসবিহারীর মোড়ে নেমে গেছে। নামার সময় মল্লিকা কি বাদলকে একবারও খুঁজেছিল? ট্রাম থেকে নেমে পড়ার পর বাদলের মনে হলো, ইস্, কি প্রচন্ড নির্বোধ সে। এতদিন পর মল্লিকার সঙ্গে দেখা হলো, অথচ মল্লিকার নিজের কথা সে কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। শুধু শুধু বল্লরীর কথা তুলে সময় নষ্ট করলো! তার মুখে বল্লরীর কথা কি মানায়? তবে, একথাও ঠিক, বাদল আজ আবার বুঝতে পারলো, মল্লিকাকে না পেলে তার জীবনের আর কোনো মানেই থাকবে না।

সেদিন রাত্তিরে বাদল দুটো ঝগড়া প্রত্যক্ষ, করলো। সাড়ে আটটার মধ্যেই সে বাড়ি ফিরে এসে দেখলো দাদার ঘরের দরজা ভেজানো, ভেতর থেকে দাদা আর বৌদির চাপা ক্রুদ্ধস্বর শোনা যাচ্ছে। বাদলের দাদা নিশানাথও খুব শান্ত মনের মানুষ, সহজে কেউ তাকে কখনো রাগতে দেখেনি, মুখে সব সময় একটা চাপা কৌতুকের হাসি। হিসেবের খাতা মেলাবার সময়ও বাদল দাদাকে গুনগুন করে গান গাইতে শুনেছে। দাদার চায়ের কোম্পানির ডিরেক্টারদের মিটিং হয় মাঝে মাঝে এ বাড়িতে। তখন আর সবাই গম্ভীর, একমাত্র নিশানাথেরই হো হো হাসির শব্দ শোনা যায় মাঝে মাঝে। তবে নিশানাথ যখন রাগেন একবার, তখন আর কাণ্ডাজ্ঞান থাকে না।

বৌদির স্বভাব একটু এলোমেলো। এই খুব হাসিখুশি, এই গম্ভীর। মাঝে মাঝে দু'দিন তিনদিন বৌদি কারুর সঙ্গে একটাও ভালো করে কথা বলেন না। অথচ খরচের হাত বৌদির, দারুণ নেশা শাড়ি কেনার। কিছু না কিনলেও সপ্তাহে অন্তত তিন চারদিন নিউমার্কেটে না গেলে চলে না কিছুতে। দাদার চায়ের ব্যবসা এখন পড়তির দিকে, বৌদির সে সব কোনো হুঁশ নেই, শো-কেসে যে শাড়িটা পছন্দ হয়েছে সেটা কিনতেই হবে। দাদা বাদলের কাছ থেকে সংসার খরচ কিছু নেবেন না, বাদল তবু লুকিয়ে

লুকিয়ে প্রতিমাসে বৌদিকে আড়াইশো তিনশো টাকা দেয়। প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে বৌদি বাড়িতে থাকেন না। একা একা চলে যান নিউ মার্কেটে।

দাদা অবশ্য এতে বাধা দেন না। টাকা পয়সা সম্পর্কে দাদা অনেকটা উদাসীন। কোনো কোনোদিন মাঝরাত্রে উঠে বেহালা বাজানো আর প্রতি রবিবার সারাদিন তাস খেলা দাদার এই দুটি প্রিয় নেশা। বাদল জানে, বছরে অন্তত একদিন দাদা আর বৌদির মধ্যে এ রকম ঝগড়া হবেই। পরদিন সকালেই অবশ্য, বৃষ্টি শেষের পরিষ্কার আকাশের মতন দাদার মুখ আবার প্রসন্ন।

সংসারের খুঁটিনাটি খবর বাদল রাখে না, অনুমানও করতে পারলো না, ঝগড়াটা কি নিয়ে। তবে অন্যবারে চেয়ে একটু গুরুতর বুঝতে পারলো, কেননা আগে কখনো রাত দশটার আগে ঝগড়া হতে দেখেনি। ঝি কিংবা রাঁধুনি কেউই দোতলায় নেই, দাদার ছেলে শিন্টু ঘুমিয়ে আছে বারান্দার মেঝের ওপর, পাশে তার বই খাতা আর খেলনা ছড়ানো। বৌদির আর যত দোষই থাকুক, ছেলের যত্ন নিতে কখনো ত্রুটি করেন না। প্রত্যেকদিন শিন্টুকে নিজের হাতে সাজিয়ে ইস্কুলে পাঠান, আবার নিজেই আনতে যান। শিন্টু এরকম অযত্নে বাইরে ঘুমোচ্ছে, বৌদির সেটাও খেয়াল নেই।

চেয়ারে বসে জুতো খুলতে খুলতে বাদল বৌদির ঝগড়ায় নিজের নামটা শুনে চমকে উঠলো। বৌদি জেদী গলায় বললেন, বেশ করেছি, আমার ইচ্ছে। দাদা বললেন, তোমার যা খুশী করো, কিন্তু অন্য লোকের মুখে আমাকে যখন তোমার নিন্দে শুনতে হয়—তোমারই জামাইবাবু বললেন—তুমি বাদলের সঙ্গে বেড়াতে যাও, সিনেমায় যাও, মার্কেটিং-এ যাও—সব তোমার মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না। বৌদি আবার জেদী গলায় বললেন, না করে না। বাদলের সঙ্গেই যাবো বা যার সঙ্গেই যাই, তুমি তো কোনোদিন—

বাদল লুকিয়ে অপরের ঝগড়া শুনতে চায় না। এগিয়ে গিয়ে সে শিন্টুকে কোলে তুলে নিতে গেল। জেগে উঠে খানিকটা ভয় পেয়ে ধড়মড় করে সে জড়িয়ে ধরলো বাদলকে। বললো, কাকা—! বাদল বললো, মাটিতে ঘুমোচ্ছো কেন? তুমি খেয়েছো?

—না, খাইনি!

—ঠিক আছে, আজ আমরা একসঙ্গে খাবো। এসো, আমার ঘরে চলো তোমাকে গল্প বলবো!

বাদলের ইচ্ছে নয়, শিন্টু তার বাবা-মা'র ঝগড়া শুনতে পায়। একটা দু'বছরের শিশুর জগতে এসব অভিজ্ঞতা না আসাই ভালো। শিন্টুকে কোলে তুলে নিতেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বাদল বললে, ছিঃ, কাঁদে না। একি, শিন্টুবাবু এত বড় হয়েছ—এখনো কাঁদে!

নিজের ঘরের দরজা ভেজাবার সময় সে ঝগড়ার আর একটা টুকরো শুনতে পেল।

বৌদি তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, তুমি কি করতে চাও আমাকে! কি চাও! দাদা খুবই ক্লান্ত ভাবে বললেন, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই না, কিছু করতে চাই না, আমারই ইচ্ছে করে সব ছেড়ে ছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে।

দাদার এ কথাটা শুনে বাদলের বুকটা মুচড়ে উঠলো। দাদা সত্যিই ছেলেবেলা থেকেই একটু সন্ন্যাসী ধরনের মানুষ—কারুর কোনো ক্ষতি করা কিংবা মনে আঘাত দেওয়া দাদার স্বভাবে নেই। দাদাকে কেউ বুঝতে পারলো না। বৌদিও মানুষ খুব খারাপ নয়, কিন্তু দাদাকে একেবারেই বুঝতে পারেননি। বৌদির সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলেই মা বিনা প্রতিবাদে এ সংসার ছেড়ে কাশীতে চলে গেছেন। দাদার জন্য খুবই দুঃখ বোধ করলো বাদল।

শিন্টুকে খাটে বসিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বাদল বললো, ছিঃ, পুরুষমানুষ হলে কাঁদতে নেই, জানো না। দ্যাখো না আমি কি কাঁদি কখনো? বাবা কাঁদে? মেরো শুধু কাঁদে? কি গল্প শুনবে বলো?

শিন্টু সোজা হয়ে বসে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছলো। তারপর বললো, বাবা আজ মাকে এত বকছে কেন?

—বড়োরা ওরকম মাঝে মাঝে বকে। বাবা মাকে বকছে আবার মাও বাবাকে বকছে। ওটা বড়োদের এক রকমের খেলা। কোন্ গল্প বলবো, বলো?

—সেই রবিনহুডের গল্পটা, তুমি একদিন আদ্দেকটা বলেছিলে—

একটু বাদেই ঘরের দরজাটা ঠকাস করে খুলে বৌদি এসে দাঁড়ালেন। বৌদির চোখে কান্না চাপা রাগের স্ফুলিঙ্গ বেরুচ্ছে, শাড়ির আঁচল আলুথালু, ব্রেসিয়ারের স্ট্রাপটা বেরিয়ে এসেছে ব্লাউজ থেকে—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। রাগের সময় নাটকীয়ভাবে কথা বলা বৌদির অভ্যেস। ঘরের ভিতরে এক ঝলক দেখে নিয়ে বৌদি বললেন, শিন্টু এখানে আছে? ঠাকুরপো, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি ঠিক উত্তর দেবে? আমি যদি মরে যাই তুমি শিন্টুকে মানুষ করতে পারবে? ও তো কোনো দোষ করেনি।

বাদল এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললো, আঃ বৌদি, এসব কি হচ্ছে। ওর সামনে এসব কথা—মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি আপনার!

—না, তোমার দাদা আমাকে আজ যা বলেছে, তারপর আমি আর একদিনও বাঁচতে চাই না।

—বৌদি, কি করছেন কি। ঐটুকু ছেলের সামনে—

—না, তুমি ঠিক করে বলো আগে।

—যান, এখন ঘরে যান তো।

বৌদি বাদলের বাহুতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বাদলের

বিষম অস্বস্তি লাগলো। নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, শিন্টু, তোমার মায়ের মন খারাপ হয়েছে, একটু আদর করে দাও তো—

সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের আওয়াজ শোনা গেলন। বাদলদের বাড়িতে পুরনো আমলের কাঠের সিঁড়ি—কেউ এলে দারুণ শব্দ হয়। দু'তিনজনের গলার আওয়াজ, পরিচিত। বৌদির বাবার ডাক শোনা গেল, কইরে, নীতা, শিন্টুবাবু কোথায়—

বাদল উঁকি মেরে দেখলো, বৌদির মামা মা ও দুই বোন এসেছে বেড়াতে। বৌদি মুহুর্তে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। বাদল এগিয়ে এসে হাসিমুখে ওঁদের বললেন, বসুন, আমি ডাকছি সবাইকে। শিন্টু আমার ঘরে!

ডাকতে হলো না, দাদা একটুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এলেন। মুখের ভাব সম্পুর্ণ পাল্টে এসেছেন, সামান্য ক্রোধের চিহ্ন যেটুকু আছে তা বাদলই শুধু দেখতে পেল। বৌদিও এসে হাজির হলেন, কান্নার সামান্য চিহ্নও নেই, প্রায় হাসিমুখেই ছোট বোনদের জিজ্ঞেস করলেন, কি রে সিনেমায় গিয়েছিলি বুঝি?

বাদল সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে এলো। বৌদির বাড়ির লোকেরা এলে সাধারণত এগারোটার আগে ওঠেন না, বৌদির বাবা খুব রসিক লোক, হাসি ঠাট্টায় জমিয়ে রাখবেন। বেচারা দাদা, একটু আগে কি গভীর দুঃখের সুরে শুনেছিল তাঁর গলায়, এখন তাঁকে উচ্চকণ্ঠে হাসতে হবে। বৌদির আত্মহত্যার ইচ্ছে আপাতত মুলতুবি। ওঁরা চলে গেলে, দাদা বৌদি আবার কি ঝগড়া শুরু করতে পারবেন?

ভদ্রতা এর নাম। মনের মধ্যে যাই থাক, এখন দাদা-বৌদি দুজনকেই ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে। এই ভদ্রতার মূল্য কি? সে নিজেও যদি আজ ট্রামে উঠে ভদ্রতা না দেখিয়ে ঠেলেঠুলে মল্লিকার পাশে বসে পড়তো, তা হলে হয়তো সব কিছুই আবার বদলে যেতে পারতো। মল্লিকার শরীরের সঙ্গে তার শরীর ছোঁয়া লাগতো, মল্লিকা মুখে কিছু বলার আগেই হয়তো মল্লিকার শরীর বাদলকে ক্ষমা করতো, বাদল তখন বলতে পারতো, চলো মল্লিকা তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার আর আমার নিয়তি এক। সেসব কিছুই হলো না, সামান্য ভদ্রতা রাখতে গিয়ে ওরা দুজনে আবার ভিড়ে হারিয়ে গেল।

খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছিল বাদল, মাঝরাত্রে প্রচণ্ড গোলমালে ঘুম ভেঙে গেলো। দাদা-বৌদির ঘর নিস্তব্ধ, ঝগড়ার আওয়াজ আসছে পাশের বস্তি থেকে। বস্তিতে চেঁচামেচি লেকেই থাকে, আজ যেন সেটা সপ্তগ্রামে উঠেছে। আলো জ্বাললো না, বিছাড়া ছেড়ে উঠে এসে বাদল বন্ধকার জানলার সামনে দাঁড়ালো।

বাদলের জানলার নিচেই বস্তির উঠোন, সেখানে কুড়ি-পঁচিশজন নারী পুরুষ মিলে হুড়োহুড়ি চেঁচামেচি করছে, দু'একটি মেয়েলি গলায় ভয়-পাওয়া আওয়াজ,

প্রথমটায় বাদল কিছু বুঝতে পারলো না। তারপর রক্ত দেখে শিউরে উঠলো।

বাদল প্রায়ই তার ঘরের জানলা দিয়ে ঐ বস্তির জীবন দেখে। কখনো কখনো অসংযত কোনো মেয়ে কিংবা আরও গোপন ঘনিষ্ঠ দৃশ্য তার চোখে পড়ে গেছে, কিন্তু সে-সব দেখার লোভেই বাদল চেয়ে থাকে না, বাদলের সে রকম বিকৃত রুচি নয়, অনেক সময় সে চোখ ফিরিয়ে নেয়।—কিন্তু দূর থেকে নির্লিপ্ত ভাবে অতগুলি মানুষের হাসি-কান্না, ধর্ম-সংস্কার মিশ্রিত জীবনের ছবি দেখার লোভ সে সংবরণ করতে পারে না। ঠিক যেন পুতুল খেলার জীবন, অদৃশ্যভাবে ওদের নিয়ে কেউ খেলা করছে, ওরা আত্মবিস্মৃত ভাবে বেঁচে আছে। বাদল ওদের সবাইকে চেনে, ওদের চরিত্রের দোষগুণ জানে।

বাদল এ রকম দৃশ্য আশা করেনি। ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করে ফটিক, ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়েস। তার সারা মুখখানা রক্তমাখা, কাৎ হয়ে শুয়ে আছে দরজার গোড়ায়। প্রথমে বোঝা গেল না আঘাতটা কিসের, ভালো ভাবে নজর করে বাদল দেখলো, ফটিকের নাকের আধখানা কেটে গেছে, সেই অবস্থাতেও সে গালাগাল করছে হারামজাদী, ছেনালী, কুত্তির বাচ্চা—দুজন লোক ঠেসে ধরে আছে ফটিকের হাত। উঠোনে দু'তিনজন মেয়ে মিলে মারছে একটা মেয়েকে, মেয়েটার পরনো শাড়ি নেই। সায়া আর ব্লাউজ পরা সোমত্থ চেহারা—বাদল একে চেনে না। বোধহয় নতুন এসেছে। আরও একটি মেয়েকে চেপে ধরে আছে দু'তিন জন—বাদল একে চেনে, এর নাম পাঁচী, ফটিকের বউ, সে-ও নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টায় ঝটাপটি করছে, তার মুখেও কুৎসিত গালগাল, বাকি লোকেরা অনর্থক চেঁচামেচি করছে। ফটিকের জন্য ডাক্তার ডাকা কিংবা রক্ত বন্ধ করার দিকে কারুরই হুঁশ নেই, ঝগড়ার একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত সে প্রশ্নই যেন ওঠে না।

মারতে মারতে সেই মেয়েটাকে উঠোনে শুইয়ে ফেললো একেবারে। কাটা পাঁঠার মত সে ছটফট করছে, সায়া নেমে গিয়ে তার নগ্ন পিচ্ছিল উরু দুটো সবার চোখের সামনে ঝলসে উঠলো, অন্যদের হাত ছাড়িয়ে পাঁচী একবার ছুটে এলো এদিকে, বাঘিনীর মত নোখ দিয়ে খামচে ধরলো মেয়েটার মুখ, দু'তিনজন আবার পাঁচীকে ছাড়িয়ে টেনে তুললো, আর মেয়েটা এক লাথি কষিয়েছে পাঁচির পেটে। জঘন্য নারকীয় দৃশ্য।

কাঠের মতন শক্ত হয়ে বাদল দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারে জানলার পাশে। সরে গেল না, জানলা বন্ধ করলো না। এও তো সত্য, একে অস্বীকার করে লাভ কি। মানুষের ভেতরে একটা পশু সব সময় গজরাচ্ছে—সমাজ, ধর্ম, নীতির নামে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা হচ্ছে, মাঝে মাঝে তবু সেটা শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। বাঁধন যতই শক্ত হচ্ছে, শিকল ছেঁড়ার অস্থিরতা ততই বাড়ছে। ওদের ঝগড়ার

মূল ব্যাপারটা বাদল বুঝতে পারলো। ফটিক ঐ মেয়েটার সঙ্গে অবৈধ ব্যাপারে লিপ্ত থাকার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়ে পাঁচীর কাছে, পাঁচী তাই ফটিকের নাক কেটে দিয়েছে, আর পাঁচজন শাস্তি দিচ্ছে মেয়েটাকে। বাদল আগেই শুনেছিল, কোনো কোনো জাতের মধ্যে স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে একজন কেউ অবিশ্বাসী হলে তার নাক কেটে প্রতিশোধ নেবার প্রথা এখানো আছে। ওরা ডাক্তার ডাকবে না, পুলিস ডাকবে না, নিজেদের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। এর পর থেকে ফটিকের সঙ্গে পাঁচীর ছাড়াছাড়ি।

হয়তো দেখা যাবে, কাল থেকে ফটিক ঐ মেয়েটাকে নিয়ে থাকবে, কেউ আপত্তি করবে না। আর কোনো ঝগড়াও হবে না, দু'একদিনের মধ্যেই ওরা সবাই মিলেমিশে সারারাত্রি ধরে হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসাবে। ফটিকের নাকে শুধু কাটা দাগটা থেকে যাবে, তাই নিয়ে দু'এক জায়গায় হয়তো সে গর্বও করবে। এই সব সমস্যার কোনো গুরুত্বই নেই, ওদের কাছে একমাত্র সমস্যা হচ্ছে খাওয়া পরার সমস্যা। অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সংসর্গের সময় হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার চেয়েও হঠাৎ চাকরি যাওয়া ওদের জীবনে অনেক বড় ঘটনা। আহত অবস্থায় শুয়ে থেকেও ফটিকের তেজ একটুও কমেনি, একটু লজ্জা কিংবা গ্লানির চিহ্ন তার মুখে নেই—সে মাত্র পৌনে দুশো টাকা রোজগার করে—এখন সব কিছুই তাকে মানায়। ঐ ফটিককেই মাঝখানে একবার বেকার অবস্থায় দেখেছিল বাদল, কি বিমর্ষ আর শুকনো মুখ ছিল তার।

বেঁচে থাকাটাই আসলে বড় কথা। বাদল ভাবলো, আমাদের যাদের খাওয়া পরার চিন্তা নেই, বেঁচে থাকার মূল সমস্যা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতে হয় না, তারাই অন্য সব কিছু তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথার মধ্যে জট পাকাই, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা সোজাসুজি সমাধান করতে পারি না। যদি হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রোজ পেটের ভাত জোটাতে হতো, তাহলে এ সবই সরল হয়ে যেত। ফটিকের জীবনটাকে একটু হিংসে না করে সে পারলো না।

॥ ছয় ॥

—মা তোমার একা একা এখানে থাকতে ভালো লাগে?

—একা কোথায় রে? মানুষ জনে গিল্‌গিস করছে জায়গাটা।

—মানুষ তো সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু তোমার নিজের লোকদের ছেড়ে—

—বাঃ, নিজের লোক নেই বুঝি? পরেশ নরেশ তো প্রায়ই আসে—

—তোমার কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছে করে না?

—আজকাল আর ইচ্ছে করে না। এখানটাতে খুব শান্তি আছে।

—মা, আমার ইচ্ছে করে তোমার কাছে থাকি। আমি এখানেই থেকে যাবো?

—তুই আর কতদিন থাকবি? পুরুষ মানুষ, তোকে কাজকর্ম তো করতে হবে। কাশীতে আর তুই কি চাকরি পাবি? পেলেও, ক'দিন পরই হাঁপিয়ে উঠবি?

—আমাকে চাকরি করতে হবে কেন? মামাদের ব্যবসায় তো তোমার কিছু শেয়ার আছে, তার থেকে যা পাবো, তাতে আমার চলে যাবে।

—সে শেয়ার আমি পরেশের নামে লিখে দিয়েছি। নে ওঠ, চান করবি না?

—লিখে দিয়েছো? আমাদের কিছু জানালে না! দাদাকে জানিয়েছিলে?

—না জানাইনি। কেন, তোর কি ঐ টাকায় লোভ ছিল নাকি?

—লোভ থাকবে কেন! কিন্তু তোমাকে ছোটমামা যদি ঠকিয়ে নেয়—

—ঠকায়নি, আমি ইচ্ছে করে দিয়েছি। তোরা দু'ভাই যায় আ করিস, তোদের ঠিকই চলে যাবে। পরেশের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, এই তো চোত মাসে ওর আবার একটা মেয়ে হয়েছে।

—আবার? এই নিয়ে কটা হলো? নয় পা দশ? সম্পত্তি দেবার বদলে ছোটমামাকে তো জেলে দেওয়া উচিত।

—ওকি, গুরুজনদের নামে ওসব কি কথা! নে ওঠ্, কত বেলা হলো, তোর ক্ষিদে পায়নি? আমি এবার পুজোয় বসবো।

—কলকাতায় থাকতে তোমাকে তো কখনো পুজো-টুজো করতে দেখিনি—

—এখন বয়েস হয়েছে না! দুলু, তুই একটু রোগা হয়ে গেছিস।

—এতক্ষণে তোমার চোখে পড়লো?

—চোখে পড়েছে আগেই। তুই ভালো করে খাসটাস না বুঝি? তোর বৌদি তোকে যত্নটত্ন করে তো?

—বৌদি খুব যত্ন করে। দুপুরের খাওয়া তো আমি অফিসেই খাই। কিন্তু তোমার হাতের রান্না না খেলে আমার তৃপ্তি হয় না।

—আমার তো নিরামিষ, ক'দিন তোর মুখে রুচবে দেখি।

—নিরামিষ কেন? হরিদ্বারের মতন কাশীতেও কি মাছ মাংস খাওয়া বারণ নাকি?

—তা নয়, তুই হোটেলে খেতে পারিস। কিংবা নরেশদের ওখানে যদি বলে দিই। আমি তো আর মাছ মাংস ছুঁই না।

—ছোঁও না? গত বছর তো তুমি আমায় রেঁধে দিয়েছিলে।

—এখন আর ওসব ভালো লাগে না রে! কাশীতে বিধবাদের ওসব ছুঁতে নেই।

—ধুত্তোর কাশীর নিকুচি করেছে। তুমি আমার জন্যও রাঁধবে না। আমি খেতে ভালবাসি জেনেও—

—কি করবো বল, আজকাল মাছ মাংস দেখলেই আমার গা বমি বমি করে। আমি বরং নরেশকেই বলে দেবো—

—মা, তুমি দিন দিন এত বদলে যাচ্ছো কেন?

বাদলের গলাটা হাহাকারের মতন শোনালো। বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে কথা বলছিল বাদল, মা ওদিকে তাকিয়ে হাসলেন, তাপর বললেন, বাঃ, আমি বুড়ী হচ্ছি না! তুই এবার একটা বিয়ে কর, তোর বউ এসে তোকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াবে।

শিশুর মতন অভিমানে বাদল বললো, না তুমি মোটেই বুড়ী হওনি। ওরকম বুড়ী বুড়ী ভাব দেখাবে না আমার কাছে।

—এবার ওঠ তো! এতবেলা পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে নেই, পিত্তি পড়ে যাবে শেষে—

বাদল উঠে স্নান করতে গেল। দশাশ্বমেধ ঘাটের একেবারে গায়ে বাড়িটা, তিন তলার বাথরুমের দরজা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়। এত বেলাতেও হাজার হাজার মানুষ স্নান করছে সেখানে, কয়েকটা সাহেব দাপাদাপি করছে জলে। অত লোকের মধ্যে বাদলের স্নান করতে ইচ্ছে করে না বলে কাশীতে এসে গঙ্গাস্নান তার হয়েই ওঠে না।

কলকাতায় একটুও মন টিঁকছিল না বলে বাদল কাশীতে চলে এলো মায়ের কাছে। এখানে এসেও নুতন করে আঘাত পেল। ভেবেছিল, মায়ের কাছে এসে তাঁর আদরের ছোটছেলে হয়ে থাকবে কদিন, মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় শুয়ে ঘুমোবে, মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দেবে। এসে দেখলো, মা ওর থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। প্রথম এসেই মাকে যখন প্রণাম করতে যায়, মা ত্রস্তে পা সরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, এখন না, রেলের জামাকাপড় ছেড়ে নে আগে, কত নোংরা ময়লা থাকে। বাদল অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মায়ের দিকে। মায়ের শুচিবাই হয়েছে, মা তার প্রণাম নেননি।

ছেলেবেলার কথা বাদলের অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, তখন তাদের বাড়ি জমজমাট ছি, মা খুব শৌখিন ছিলেন, পুজো-আচ্চা, ধর্মকর্মের বাতিক মোটেই ছিল না, মা খুব সেজেগুজে বাবার সঙ্গে পার্টিতে যেতেন। কতদিন মধ্যরাত্রে, ঘুমন্ত অবস্থায় ঠাকুমার ঘর থেকে মা তাকে কোলে তুলে এনেছেন, মিষ্টি সেন্টের গন্ধ বেরুত তখন মা'র গা থেকে। কি নরম ছিল মা'র হাত দুটো, সেই নরম হাতে মা তাকে আদর করতেন। কোনো নেমতন্ন বাড়িতে যাবার সময় মা যখন এক গা জড়োয়ার গয়না পরে সাজতেন, মাকে দেখাতো রাজেন্দ্রাণীর মতন। বহুদিন পর্যন্ত বাদলের ধারণা ছিল, তার মায়ের চেয়ে কোনো সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নেই।

বাবা মারা যাবার পরও মা খুব ভেঙে পড়েননি। শক্ত হাতে সংসারের হাল

ধরেছিলেন। কাকাদের সঙ্গে ঝগড়ার পর সম্পত্তি আর বাড়ি ভাগাভাগির সময় মা একচুলও অধিকার ছাড়েননি, নিজেই কথা বলেছেন উকিল ব্যারিস্টারদের সঙ্গে। দাদা তখন যথেষ্ট বড়, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, পড়া ছাড়িয়ে এনে মা দাদাকে বাবার চায়ের ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিলেন। দু'বছরের মধ্যেই নিজে পছন্দ করে মেয়ে দেখে বিয়ে দিলেন দাদার। বাদলের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক তখন ছিল বন্ধুর মতন, ভয় কিংবা ভক্তির সম্পর্ক ছিল না। বাদল মাঝে সব কথা বলতো, এমন কি কলেজে প্রথম সিগারেট খেতে শুরু করে সে কথাও কামে লুকোয়নি। মা তখন বলেছিলেন, সিগারেট খাবি সেটা কিছু দোষের নয়, কিন্তু কখনো খালি পেটে সিগারেট খাস না। আজও বাদলের মনে আছে সে কথা। মল্লিকার সঙ্গে প্রথম আলাপের পর সে কথাও বলেছিল মাকে। মা বলেছিলেন, নিয়ে আসিস মেয়েটাকে একদিন বাড়িতে, দেখবো'খন। তা অবশ্য আর আনা হয়নি শেষ পর্যন্ত।

বিধবা হয়েও মা আচার নিষ্ঠা নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করেননি। থান পরতেন, নিরামিষ খেতেন ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে বিশেষ কোনো উৎসব থাকলে মা মাছ বা মাংসের একটা আইটেম রেঁধে দিতেন। হাসিখুশী হৈ চৈ করা স্বভাব ছিল মা'র, বাড়িতে প্রায়ই নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন অনেককে। সেই মা এখানে একা একা পড়ে আছেন বছরের পর বছর।

বৌদির কোনো একটা কথায় বা ব্যবহারে মা গভীর ভাবে আঘাত পেয়েছিলেন, মা কিন্তু সে কথা কারুকে বলেননি। আসল ব্যাপারটা বাদল আজও জানে না। মা ঝগড়া করেননি, কান্নাকাটিও করেননি, নিঃশব্দে সরে এসেছিলেন। কাশীতে ধর্ম কারার টানেও আসেননি মা। বাদলের মামাদের কাচের ব্যবসা আছে, বেনারসে তার একটা ব্রাঞ্চ, এখানে নিজেদের বাড়িও আছে। মা নিজের ভাইদের কাছে কয়েকদিনের জন্য বেড়াবার নাম করে এসেছিলেন পাঁচ বছর আগে, আর ফিরে যাননি। ভাইদের সঙ্গেও থাকেন না, আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন, একজন দেখাশুনো করে। দাদা বেশী ভাবপ্রবণ, দাদা মাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কাশীতে এসে কান্নাকাটি পর্যন্ত করেছিল, মা কিছুতেই আর রাজী হননি। অভিমান করে দাদা আসে না মায়ের সঙ্গে দেখা করতে, বাদলই বছরে একবার করে আসে।

কিন্তু প্রতিবছরই মা আরও বেশী দূরে সরে যাচ্ছেন। শুচিবাই হয়েছে বলে সে এখন আর যখন তখন মাকে জড়িয়ে ধরতে পারে না। মায়ের শুচিবাইয়ের ব্যাপারটা বাদল কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না, তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় এখনো। জোর করে ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিল প্রথমদিন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি, মাকে বারবার স্নান করতে দেখেছে। ঠাকুর ঘরে মা ঘন্টা দুয়েক সময় কাটান এখন— সেই সময়টা বাদলের অসহ্য লাগে, দু'একবার ঠাকুর ঘরে সে ঢুকে মায়ের পাশে

বসেছে, মা একবারও চোখ খুলে তার সঙ্গে একটাও কথা বলেননি।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা মায়ের কাছে এক দঙ্গল স্ত্রীলোক আসে। তারা মাকে গুরুমা বলে ডাকে। মাকে ঘিরে বসে তারা, মা এটা সেটা গল্প করতে করতে ওদের নানান রকম ধর্মের উপদেশ দেন। মা এত সব ধর্মের কথা কবে পড়লেন বা লিখলেন বাদল তাও বুঝতে পারে না। সন্ধ্যের ঐ সময়টা বাদল সাধারণত বাইরেই থাকে, কিন্তু একদিন পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে বাদল মায়ের বক্তৃতা শুনছিল। শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, গুরুমা হবার নেশা মাকে পেয়ে বসেছে। মা এত বুদ্ধিমতী এবং কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মহিলা ছিলেন কিন্তু ধর্মের নেশা মা'র মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। ঐ নেশার ঝোঁকে মা মিথ্যে কথা বলতেও দ্বিধা করেন না। বাদল নিজের কানে শুনেছে, ভক্তরা যখন মা'র আগেকার জীবনের কথা শোনার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল, তখন সেই গল্প বলতে বলতে মা বললো, শ্বশুর বাড়িতে শিবপুজো করতে করতে তিনি প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যেতেন। কি নিদারুণ মিথ্যে কথা। ঠাকুমা'র আমলে তাদের বাড়িতে নারায়ণ পুজো হতো বটে, শিবপুজো কোনোদিনই হয়নি, মাকেও সে কোনোদিন কলকাতার ঠাকুর ঘরে দেখেনি। মা'র মুখে ঐ কথা শুনে এক ধরনের দুঃখ ও হতাশায় বাদলের বুক সিরসির করতে লাগলো।

বাদল বুঝতে পারলো, মা'র থেকে সে অনেক দূরে সরে গেছে, আর কাছে আসার উপায় নেই। জন্মের সময় নাড়ী কেটে মায়ের শরীর থেকে তাকে আলাদা করা হয়েছিল, জীবনে আরও বহুবার নাড়ী কাটা হয়, অনেক বন্ধন ছিন্ন করতেই হয়। এই কথাটা ভেবে বাদল দারুণ নিঃসঙ্গ বোধ করলো।

নিজের সংসারের কর্ত্রীত্ব ছেড়ে এসেছেন মা, এখন এখানে এই এক দল বুড়ীর গুরুমা হয়ে কর্ত্রীত্ব করছেন। ঐ ভক্তদের তুলনায় মা অনেক বেশী টাকাও খরচ করেন। মাসে তিনশো টাকা খরচ করার মতন সামর্থ্য কাশীর অনেক বিধবারই নেই। অনেকেরই সামর্থ্য তিরিশ টাকার বেশী না। গুরুমা হবার অধিকার মায়ের তো এমনিতেই আছে।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বাদল মাকে বললো, মা তুমি অনেককে উপদেশ দাও। আমাকে একটা ব্যাপারে একটু উপদেশ দেবে?

মা উদাসীন ভাবে হেসে বললেন,তোরা আমাদের উপদেশ শুনবি কেন? আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি বুড়ো-বুড়ীদের কথা শোনে?

—একটা ব্যাপার আমার মনের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে গুমরোচ্ছে। আমার আর কেউ নেই যাকে আমি একথা বলতে পারি, আর কেউ নেই যার কাছে আমি মতামত চাইতে পারি। আমি একা একা আর সইতে পারছি না। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে?

—কি ব্যাপার, বল আগে শুনি!

—একটা মেয়ের সঙ্গে আমি ভয়ংকর অন্যায় ব্যবহার করেছি, সে জন্য—আমি অনুতাপেও জ্বলছি, কিন্তু—

—কে! সেই মল্লিকা?

—তোমার মনে আছে তার কথা?

—কি করেছিস তার সঙ্গে?

—মা, সে কথা আমি তোমাকে কি করে বলবো? আমি মিথ্যে কথা বলতে পারবো না, কিন্তু নিজের মা'র কাছে সে কথা কেউ বলতেও পারে না।

—মনে কর, আমি তোর মা নই। মনে কর, তুই ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে একা একা সব স্বীকার করছিস।

—আমি ঠাকুর-ফাকুর মানি না। তুমি আমার সামনে বসে রয়েছ, অথচ তুমি আমার মা নও, একথাও আমি ভাবতে পারি না।

—আমি যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দে শুধু, তাহলেই আমি বুঝবো। তুই কি মল্লিকার সঙ্গে কোনো অপবিত্র কাজ করেছিস?

—না। আচ্ছা, শোনো।

ঠিক দরজার কাছেই বসেছেন মা, একটা হরিণের চামড়ার আসনে। দেয়ালের খুব কাছে, তবু দেয়ালে হেলান দেননি, ঋজু হয়ে বসে আছেন, হাত দু'খানা কোলের ওপর জোড় করা। ঠাকুর ঘরে মা যে রকম ভাবে পুজোয় বসেন, সেই রকম ভঙ্গি। মুখের ভাবে একটা শান্ত উদাসীনতা, যেন বাদলকে তিনি চেনেন না, নিজেরই প্রাণরস দিয়ে বাদলকে যে তিনি এ পৃথিবীতে এনেছেন, তাও মনে নেই।

নেয়ারের খাটে আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে আছে বাদল। বুকের নিচে বালিশ, পা দু'খানা তুলে দিয়েছে পাথরের দেয়ালে। একটু শীত শীত করছে সন্ধ্যেবেলার জোলো হাওয়ায়। হঠাৎ তার মনে হলো, মা ছিলেন পৃথিবীতে তার শেষ বন্ধু, মা-ও এখন অনেক দূরে গেছেন। পৃথিবীতে এর পরেও সে হয়তো নতুন বন্ধু পাবে, কিংবা পুরনো বন্ধুদের ফিরে পাবে, কিন্তু মাকে আর পাবে না। ঠাকুরঘরের ঐ পাথরের ঠাকুরটার সঙ্গে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিততে পারবে না কিছুতেই।

বাদল বললো, মা মল্লিকাদের সঙ্গে ওদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম একবার। রূপনারায়ণ নদীর পারে ওদের বাড়ি, তখন বর্ষাকাল, নদীটা একেবারে টইটম্বুর ভরা—সেখানে কয়েকদিন থাকার পর আমি কি রকম যেন বদলে গেলাম—আগেও বুঝতে পারিনি কখনো যে নদীর এরকম প্রভাব আছে মানুষের জীবনে...যে সব চিন্তা তখন আমার মাথায় এলো...তুমি তো জানো মল্লিকার কথা, ওর মতন ভালো মেয়ে...ওর জন্য আমি জীবন দিতে পারি—তবু আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম সেই

মুহূর্তে...

কাটাকাটাভাবে সব কথাই বললো.বাদল। কিছুই প্রায় বাদ দিল না। মায়ের মুখে কোনোরকম বিস্ময় কিংবা ব্যথার চিহ্ন ফুটলো না, একটা রেখাও বদলালো না, বরং মা যেন সামান্য একটু হাসলেন। সেই হাসির কোনো অর্থ বুঝতে পারলো না বাদল।

মা বললেন, এইজন্যই বুঝি তুই দিন দিন এমন রোগা হয়ে যাচ্ছিস?

—না, রোগা হবো কেন? এর সঙ্গে রোগা হবার কি সম্পর্ক আছে? তা ছাড়া আমি রোগা হইও নি।

—আগের বছরের চেয়ে তুই অনেক রোগা হয়েছিস। তোর মনের মধ্যে বুঝি অনবরত এই সব কথাই কুরিয়ে কুরিয়ে খাচ্ছে?

—না, সব সময় না! সব সময় শুধু একটা কথা মাথার মধ্যে থাকলে মানুষ তো পাগল হয়ে যাবে। না, সে রকম কিছু না—প্রথম প্রথম বেশী মনে পড়তো ঠিকই—কিন্তু এখন, বহুদিন ওসব কথা মনেই আসে না, সিনেমা দেখি, অফিস করি, বাইরে বেড়াতে যাই—কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে পড়ে, তখন খুব কষ্ট হয়, মনে হয় মল্লিকার মতন একটা সরল মেয়েকে অমন আঘাত দিয়ে মানুষ হিসেবে অনেক ছোট হয়ে গেছি।

—না, ছোট হয়ে যাসনি। তোর মনটা বড় ভালো, নিজের ছেলে বলে বলছি না, আজকালকার ছেলেমেয়েদের মন আগেকার লোকদের থেকে অনেক ভালো। লোকে মিছিমিছি তাদের নিন্দে করে, মনটা বড় সাদা।

—তুমি কি দেখে একথা বললে?

—তুই যে জন্য মনে কষ্ট পাচ্ছিস এত, আগেকার অনেক লোক এই নিয়ে গর্ব করতো।

—মা তুমি ওসব কথা কি বলছো! সে তো অন্য ব্যাপার। সে তো সবাই জানে আগেকার জমিদার-টমিদাররা কি করতেন...

—জমিদার শুধু না, তুই জানিস দুলু, তোর নিজের ঠাকুরদারই তিনটে বিয়ে ছিল? এক বৌ তো কোনোদিন শ্বশুর বাড়িতে আসেইনি, আর দু'বৌকেই তিনি রেখেছিলেন ঐ মনোহরপুকুরের বাড়িতে। আমার সেই ছোট শাশুড়িকে আমিও এসে দেখেছি। কোনো ছেলেপুলে হয়নি তাঁর, ছোট্টখাট্টো মানুষটি ছিলেন, কথা কম বলতেন খুব—আর কথা বলবেন কি? তোর ঠাকুর্দার ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ—এর পরেও শুনেছি, তিনি প্রায় রাত্তিরেই বাড়ি ফিরতেন না।

—মা, তখনকার সমাজ ব্যবস্থাটাই ছিল অন্যরকম। শুধু পুরুষের সমাজ।

—সেই তুলনায় তো বাবা ছিলেন দেবতার মতন। হোটেল-টোটেলে যেতেন—

কত পার্টিতে যেতেন, কিন্তু কোনোদিন কোনো ছোট মনের কাজ করেননি। পুরুষ মানুষের গাম্ভীর্যটাই হলো আসল, হাল্কা হয়ে গেলে মেয়েরা তাদের শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে পুরুষ মানুষেরা বড় অস্থির, তারা কিছুতেই এক জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকতে চায় না। সেইজন্যই তো আগেকার মুনি-ঋষিরা নানারকম শাস্ত্রের নিয়ম করে গেছেন। ভগবানে ভক্তি থাকলে মানুষ অন্যকে দুঃখ দিতে ভয় পায়। যারা ধর্মকর্ম ভুলে যায়—ভগবানের কথা সব সময় বুকের মধ্যে রাখে না—

—মা, যাক্ ওসব কথা বলো না। ধর্ম বিশ্বাস নিয়েই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী খুনোখুনি হয়েছে। তোমার ভগবানই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জল্লাদ। ...ওসব আমি মানি না, ও নিয়ে আমি কথা বলতেও চাই না।

—তোর বাবাও মানতো না, তাই তোর বাবারও পা টলেছিল। কিন্তু সেইটুকু দোষ তার গুণের তুলনায় এতই সামান্য ছিল যে আমি রাগ করিনি...আমার কোনো অভিমান নেই, পুরুষ মানুষের শেষ পর্যন্ত বিচার হয় শুধু তার পুরুষকার দিয়ে—তোর বাবা শুধু সেই একবারই...

—বাবার সম্বন্ধে আমার ধারণা আমি বদলাতে চাই না। আমাকে বাবার দুর্বলতার কথা বলো না। আমি শুনতে চাই না।

—কেন শুনবি না? আমি তোর মা হয়ে বলতে পারি, আর তুই ছেলে হয়ে শুনতে পারবি না। ও রকম ভয় পেলে মন শক্ত হয় না। দোষ, গুণ সব জেনেও মানুষকে ভক্তি করা যায়। আমি তো তোর বাবাকে সারাজীবন ভক্তি করেছি। শুনে দ্যাখ, তুই নিজে এর থেকেই সান্ত্বনা খুঁজে পাবি। আমার বিয়ের আগে, আমাদের বাড়িতে মেয়ে দেখতে এসেছে তোর বাবা, তখন তার বয়স কত হবে, বাইশ-তেইশ, লাজুক ছিল খুব, আমার দিকে তো মুখ তুলে তাকায়ইনি, তবে তবু কোন ফাঁকে যে নিরুকে দেখে গেল...আমার খুড়তুতো বোন নিরুপমাকে তুই-ও দেখিসনি—কি সুন্দর দেখতে ছিল তাকে, চাঁপাফুলের মতন গায়ের রং, টানাটানা চোখ—আমাকে দেখতে এসে তোর বাবার নিরুকেই পছন্দ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে সে কথা বলেও ছিল, কিন্তু ও কথা আর উঠতেই পারেনি। তোর ঠাকুরদা এক কথায় বাতিল করে দিয়েছিলেন—আমাদের কাকাদের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না, নিরুর বিয়েতে তেমন কিছু দিতে-টিতে পারবে না। আমরা কিছু জানতেও পারিনি, এমনকি বিয়ের পরেও একদিনের জন্যও তোর বাবার ব্যবহারে কিছু বুঝতে পারিনি—। আমাদের বাড়িতেও যখন তোর বাবা আসতো, কোনোদিন নিরুর নিকে চোখ তুলে তাকায়নি। তারপর নিরুর বিয়ে হয়ে গেল বরানগরে। কিন্তু পুরুষ মানুষের জেদ তো, দু'পাঁচ বছরেও সে জেদ মরে না, বুকের মধ্যে পুষে রাখে। চার বছর বাদে নিরু ফিরে এলো বিধবা হয়ে—তার দু'বছর বাসে সে আত্মহত্যা করলো। এর মধ্যে,

তোর বাবা তার সঙ্গে...

—মা থাক আর শুনতে চাই না।

—নিরু শুধু দুঃখই পেয়ে গেল। যদি বিধবা হবার পর ঠাকুরের পায়ে আশ্রয় নিত, তা হলে আমি যে শান্তি পেয়েছি...নিরুর মরার আগে কিছুই জানতে পারিনি—তোর বাবাই আমার কাছে সব বলেছিল। প্রথমটা আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম, আমার মাথার ঠিক ছিল না, নিরুর মৃত্যুতে আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম, তারপর যখন আবার একথা শুনলাম...তুই আজ যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিস, আমিও তেমনি আমার মায়ের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। মা আমাকে ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেখানে গিয়ে দুজনে মিলে কেঁদেছিলাম অনেকক্ষণ, তারপর মা আমাকে ঠাকুরের পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল,—আমি যাতে তোর বাবাকে ক্ষমা করি। মন থেকে সব কথা মুছে ফেলার চেষ্টা করি। মা বলেছিল, ক্ষমাতেই শান্তি, নইলে সারাটা জীবন জ্বলে পুড়ে মরবি—বড় সত্যি কথা বলেছিলেন। আমি ক্ষমা করতে পেরেছিলাম বলে তোর বাবাও শান্তি পেয়েছিলেন, সারা জীবনে কখনো আর দ্বিতীয়বার—

মা হঠাৎ চুপ করে মাটির দিকে মুখ নিচু করে রইলেন। বাদল একহাতের ওপর কাৎ হয়ে ছিল এতক্ষণ, হাতটা প্রায় অসাড় হয়ে গেছে, এবার পাশ বদলালো। বাবার মুখটা বাদলের ভালো করে মনে পড়েনা, কিন্তু বাবার কথা ভাবলেই বাদলের এক বিশাল মানুষের কথা মনে পড়ে, খুব গম্ভীর ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। মায়ের মুখ থেকে এতখানি কথা শুনেও বাবার সম্পার্ক বাদলের ধারণা একটুও বদলালো না। বাদল শুনেছিল, তার এক মাসী আত্মহত্যা করেছে—কিন্তু কেউ তাকে কোনোদিন নিরুমাসীর আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে কিছু বলেনি। এ ঘটনার সঙ্গে বাদল তার নিজের কোনো মিল খুঁজে পেল না।

বাদল জিজ্ঞেস করলো, মা, তুমি সত্যি ভুলতে পেরেছিলে?

—ঘটনাটা ভুলিনি। কিন্তু রাগ ভুলেছিলাম।

—তুমি সত্যি কথা বলছো?

—তুই কি বলছিস দুলু, তোর কাছে আমি মিথ্যে কথা বলবো?

বাদল আবার একটু চুপ করলো, একথা বলতে পারলো না, যে সে নিজের কানে শুনেছে, মা তাঁর ভক্ত শিষ্যাদের সামনেই মিথ্যে কথা বলছিলেন। মা কোনোদিন শিবপুজো করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাননি। কিন্তু সে কথা শুনেও মায়ের সম্পর্কে তেমন কোনো আঘাত পায়নি বাদল। মিথ্যে কথা সবাই বলে একটু-আধটু। সবাই মাঝে মাঝে কল্পনার জগতে থাকতে চায়। কঠোর সত্য বড় একঘেয়ে।

—মা, তুমি তাহলে আমাকে আর একটা সত্যি কথা বলবে?

—কি?

—বৌদির সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছিল কি নিয়ে? বৌদির কোন কথার তুমি আঘাত পেয়েছিলে?

—তোর বৌদির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়নি তো। কে বললে তোকে?

—তুমি এবার কিন্তু সত্যি কথা বলছো না। সবাই জানে কাশীতে তুমি ধর্মের টানে আসোনি, তুমি অভিমান করে নিজের সংসার ছেড়ে চলে এসেছো। দাদা তোমাকে কোনোদিন কোনো আঘাত দেয়নি।

—নিশি সে রকম ছেলেই নয়—

—তা হলে কে? বৌদি নিশ্চয়ই—বৌদিও তোমার কথা আর একদমই উচ্চারণ করে না। শাশুড়ি আর বৌতে ঝগড়া হওয়াটা এমন অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আমার কেউ সে রকম কোনো ঝগড়া শুনিনি—তবে, কি হয়েছিল তোমাদের মধ্যে?

—আমি তোকে সে কথা বলতে চাই না। তুই দুঃখ পাবি। আমি বুড়ো হয়েছি, বেশী দিন বাঁচবো না, আমাকে ছাড়াও তোদের চলবে, কিন্তু তোকে তো দাদা বৌদির সঙ্গেই থাকতে হবে, ও কথা আর আমাকে জিজ্ঞেস করিস না।

—মা, বৌদি কিন্তু মানুষ খারাপ নয়। স্বভাবটা একটু এলোমেলো, খানিকটা ছেলেমানুষ ধরনের, কিন্তু মনটা খুব সরল।

—মানুষ কেউ তো খারাপ নয়। খারাপ কি হতে পারে? সব মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন—সে যে পবিত্র স্থান। কিন্তু মানুষর মধ্যে যেমন ঈশ্বর আছেন, তেমনি ছটা রিপুও লুকিয়ে আছে। কেউ যদি ঈশ্বরকে ভুলে রিপুর দাস হয়ে পড়ে—

—আবার তুমি তত্ত্বকথা শুরু করলে? ওসব আমার একটুও ভালো লাগে না। বিশেষত তোমার মুখ থেকে শুনলে আমার বড্ড অস্বস্তি লাগে। এর থেকে তুমি যদি আমায় বলতে, আয় আমার পিঠের ঘামাচি মেরে দে, কিংবা যা কুয়ো থেকে এক বালতি জল তুলে নিয়ে আয়—

—হয়েছে, হয়েছে। নে, এবার খাবি না? ওঠ্, ভাত বেড়ে দিই।

—একটু পরে খাবো। ভাবছি, কাল-পরশু এখান থেকে এলাহাবাদে চলে যাবো।

—তা যাবি যাস, এখন খেয়ে নে বরং।

—মা, তুমি আমাকে কোনো পথ দেখাতো পারলে না।

—তুই কি আমার দেখানো পথে চলবি? শুনবি আমার কথা?

—তোমার কাছ থেকে একটা কিছু শুনতে চাই বলেই তো এখানে এসেছি।

—তাহলে উঠে আয়, আমার কাছে আয়।

—উঠতে হবে কেন? বলো না।

—তুই ঠাকুর দেবতা মানিস না, কিন্তু আমাকে তো মানিস—আমার পা ছুঁয়ে

প্রতিজ্ঞা কর, আমি যা বলবো, তাই শুনবি।

—আগে তোমার কথাটা বলো, তারপর তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করবো।

—তবে যে বললি, আমার কথা শুনবি?

—শুনবো, কিন্তু বিচার-বিবেচনা না করে মানতে পারবো না।

—তুই ওসব নিয়ে আর বেশী ভাবিসনি—এমন কিছু হয়নি। খুঁজলে দেখবি, অমন অনেক ঘরেই দু'একটা ব্যাপার হচ্ছে। তুই ঐ মেয়েটিকে বিয়ে কর, ঐ মল্লিকার ছোট বোনকে—কি যেন নাম তার?

—বল্লরীকে? অসম্ভব!

—নারে তাতেই তোরা সুখী হবি। একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, নিরুকেই যদি তোর বাবা বিয়ে করতো প্রথম থেকে, তাহলে বেচারী নিরুকে আত্মহত্যা করতে হতো না।

—তুমি ভুল করছো, আমাদের মধ্যে সে রকম কোনো ব্যাপারই ঘটেনি—শুধু সামান্য একদিনের ভুল, তখন আমি...মানুষ তো জ্বরের ঘোরেও অনেক কিছু প্রালাপ বকে, সেগুলো যেমন সত্যি নয়—তা ছাড়া মোটেই আত্মহত্যা করার মতন মেয়ে নয় বল্লরী, সে প্রশ্নই ওঠে না।

—তবু, ওকে বিয়ে করলেই তুই শান্তি পাবি।

—বল্লরী সম্পর্কে ওকথা আমি ভাবতেই পারি না। ওকে অনেক ছোট থেকে দেখছি—তা ছাড়া বল্লরী এখন বড় হয়েছে, তার নিজস্ব ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে, সে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? সে তো জানেই, তার দিদিকেই শুধু আমি ভালোবাসি—না, না, ওসব নয়, আমার সমস্যা হচ্ছে মল্লিকার মনে আমি যে আঘাত দিয়েছি—তার কোনো..

—তুই তো অনুতাপ করেছিস, তাই যথেষ্ট। তবে একটা কথা বলে দিলাম, মল্লিকার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে না। তুই তা হলে, ওদের দুজনকেই ভুলে যা, অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে কর। বেশী আর দেরী করিস না।

—সে তো হলো অন্য কথা। আরসেই মেয়েটি যদি পরে এসব কথা জানতে পায়?

—জানবে কেন? এই কাশীতেই কত মেয়ে আছে, যদি বলিস তো...

—অর্থাৎ তার কাছে সব কিছু গোপন করে যাবো? মা, আমি তোমার কাছ থেকে কোনো সমাধান পেলাম না। আচ্ছা, অন্য একটা কথার উত্তর দাও। আমি যাকেই বিয়ে করি—আমি বিয়ে করার পর তুমি কলকাতায় আমার কাছে গিয়ে থাকবে?

—আমাকে আর জড়াসনি। আমি এই বিশ্বনাথের পায়ের কাছে পড়ে আছি,

বেশ শান্তিতে আছি।

—মা, তুমি আমাদের ত্যাগ করলে?

—না রে না, মনের মধ্যে সব সময় থাকবি—

—আমি আর যাকেই ক্ষমা করি, তোমার বিশ্বনাথকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবো না।

ভারতমাতার মন্দিরের কাছে বাদলের মামাদের বাড়ি। একদিন সেখানে দেখা করতে গেল বাদল।

কাশীর রাস্তায় এখন প্রায়ই ঝাঁকে ঝাঁকে সাহেব-মেম দেখা যায়। নোংরা ছেঁড়া পোশাক পরা সুঠাম আমেরিকান-ইংরেজ যুবকের দল, চুলে চিরুনি পড়েনি বহুদিন, অনেকের গাল ভর্তি দাড়ি, মেয়েদেরও একই রকম জামা কাপড়—চট্ করে ছেলে আর মেয়েদের আলাদা করে চেনা যায় না। গঙ্গার ঘাটে ওরা গোল হয়ে বসে ছিলিমে গাঁজা খায়, আর ছোট ছোট ছেলেরা তাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে দূর থেকে।

অবাক তো হবেই, এতকাল আমরা জানতুম সাহেবরাই এ পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান—তাদের চেহারা সুন্দর, তাদের দেশে কিছুর অভাব নেই, তাদের সাজ-পোশাক সব কিছু নিখুঁত—তবু কিসের অভাবে তারা দেশ ছেড়ে এতদূরে ছুটে আসছে, থাকছে এমন ভাবে? বাদলের হঠাৎ মনে হলো, এ দেশ স্বাধীন হবার আগেই যদি ইউরোপ-আমেরিকায় বিটনিক আর হিপিদের আন্দোলন শুরু হতো—তখনও কি এইসব ছেলেদের এই রকম নোংরা পোশাকে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ভারতের রাস্তায় ঘুরতে দিত বৃটিশ সরকার? রাজার জাতের লোকদের এই অবস্থা দেখে আমরা হাসতুম।

একজোড়া সাহেব-মেম রাস্তার ওপর কয়েকটা আঁকাবুকি ছবি এঁকেছে রঙিন চক্ দিয়ে, তারপর হাত পেতে ভিক্ষে চাইছে। বাদল সেখানে একটুক্ষণ না দাঁড়িয়ে পারলো না। কি অদ্ভুত শখ, মেমটি অপূর্ব সুন্দরী—তার ময়লা পোশাক সত্ত্বেও বোঝা যায়, সোনালি রঙের চুল নেমে এসেছে পিঠ পর্যন্ত, ঢলঢলে মুখখানি, ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে সে ভিক্ষে চাইছে। 'কিরপয়া করকে কুচ ডিজিয়ে—ফাইভ পয়সা, টেন পয়সা'। সঙ্গের ছেলেটির কাঁধে ঝোলানো যে ব্যাগ তার মধ্যে নিশ্চয়ই রয়েছে দুজনের পাসপোর্ট, প্লেনের টিকিট থাকাও আশ্চর্য নয়, যে-কোনো সময় ওরা দেশে ফিরেযেতে পারে, দেশে ফিরে গেলেই চাকরি বাঁধা, ওদের বাড়িতে হয়তো দুখানা ক'রে মোটর গাড়ি আছে, তবু কাশীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করে আনন্দ পাচ্ছে। মানুষেণ আনন্দ পাবার কত বিচিত্র উপায়! এমন ভিখিরি আর কখনো পাবে না বলে বাদল পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করতে লাগল।

এই সময় নীল রঙের ছোপানো ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা একজন লোক বাদলকে প্রায় ঠেলেই সরিয়ে সাহেব-মেম এর কাছে ভিক্ষে দিতে এলো। বাদল অবাক হয়ে তাকালো লোকটার দিকে। বাঙালী বলেই মনে হয়—কিন্তু নীল রঙের ধুতি পাঞ্জাবি? তাছাড়া লোকটার মুখে পাউডার মাখা, ভুরু দুটোও কাজল দিয়ে আঁকা...হঠাৎ বাদল ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, সঙ্গে সঙ্গে সরে এলো সেখান থেকে। ভিড় ফাঁক করিয়ে একটা ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সিনেমা তোলা হচ্ছে। কোনো সিনেমা কোম্পানি সম্ভবত কাশীর রাস্তায় শুটিং করতে এসে অপূর্ব সাহেব-মেম ভিখিরি পেয়ে সে দৃশ্যটাও তুলে নিচ্ছে। বাদল একটু বিরক্ত হলো, তাকে ধাক্কা না মেরে আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল। আশা করি, তার ছবিও উঠে যায়নি। না, ক্যামেরার দিকে বাদলের পিঠ ফেরানো ছিল, উঠলেও ক্ষতি নেই।

মামাদের বাড়িতে এসে দেখলো, সেখানেও সিনেমার লোক। নরেশ মামা তাঁর বাড়ির একটা অংশ সিনেমার লোকজনদের থাকার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। ভাড়া পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। নরেশ মামার ছেলেমেয়েরা তো কলকল করে সিনেমার গল্পই করতে লাগলো সারাক্ষণ। একটা ভিড়ের দৃশ্যে ওদেরও ছবি উঠেছে ছোট ছেলে অপুর তো কথাও আছে দু'তিনটে। বাংলা ছবি। সে ছবির গল্প, নায়ক-নায়িকা ইত্যাদির নাম বাদলকে শুনতে হলো বাধ্য হয়ে। আর একটা নামও শুনলো, সঙ্গীত পরিচালক গৌতম রায়। গৌতম রায়ও রয়েছেন এই দলে।

বাদলের একবার মনে হলো, গৌতম রায়ের সঙ্গে দেখা করে আসে। আশ্চর্য, মাত্র দেড়মাস দু'মাস আগেও বাদল এই লোকটির নামও জানতো না। কিন্তু বল্লরীর সঙ্গে দেখা হবার পর বারবার এই লোকটি তার কাছাকাছি আসছে। তার অফিসের জলসাতেও গৌতম রায়। এখন, তারই মামাবাড়িতে এসে উঠেছে সেই লোক। বল্লরীও এসেছে নাকি? তার আসার কোনো যুক্তি নেই অবশ্য, সে গাইবে নেপথ্য সঙ্গীত, আউটডোর শুটিং এ তার আসবার কথা নয়। কিন্তু বল্লরী বলেছিল, গান নয়, সিনেমায় অভিনয় করাই তাই ইচ্ছে। অনেক মানুষ তার স্তাবকতা করবে বল্লরী সেটাই চায়। না, বল্লরী আসেনি নিশ্চয়ই—মামাতো ভাই-বোনদের মুখে সে বল্লরীর নাম শোনেনি একবারও।

কিন্তু কি বলে সে গৌতম রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে? গৌতম রায় তাকে হয়তো গ্রাহ্যই করবে না। বল্লরীর নাম বলবে? সে গিয়ে বলবে, আমি বল্লরীকে চিনি, সে আপনার সঙ্গে মিশছে—আপনি মানুষটা কেমন, তাই দেখতে এলাম? হাস্যকর! গৌতম রায় তার মুখের ওপর হেসে উঠবে। বাদল গেল না শেষ পর্যন্ত। তবু, গৌতম রায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

বাদল এলাহাবাদে যাওয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করে এখান থেকেই কলকাতায় ফিরবে

ঠিক করলো। ট্রেনে গৌতম রায় ঠিক মুখোমুখি। কাশী থেকেই কলকাতায় যাবার রিজার্ভেশন হয়, একটা বগি জুড়ে দেওয়া হয় মোগলসরাইয়ে। বাদল ফার্স্ট ক্লাসে নিচের বার্থ পেয়েছিল, ঠিক তার উল্টোদিকে গৌতম রায়। তাকে দেখে বাদল একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল, একটা পত্রিকা কিনে তার পাতায় মন রাখার চেষ্টা করলো।

গৌতম রায় তো আর বাদলকে চেনে না। তার কোনো আড়ষ্টতা নেই। আজও একটা সস্তা সিল্কের পাঞ্জাবি পরে আছে, একটা বড় ডিবে থেকে মাঝে মাঝেই পান বার করে মুখে দিচ্ছে।

রাত সাড়ে ন'টায় ট্রেন ছাড়লো, একটু ক্ষণের মধ্যেই গৌতম রায় ধুতি ছেড়ে পা-জামা পরে নিল, পাঞ্জাবিটা খুলতে গিয়ে পকেট থেকে ঝনঝন করে পয়সা পড়ে গেল। কয়েকটা পয়সা গড়িয়ে এলো বাদলের পায়ের নিচে। গৌতম রায় হুমড়ি খেয়ে খুঁজছে, বাদল তার পায়ের কাছের পয়সাগুলো কুড়িয়ে দিল বাধ্য হয়ে। সেগুলো হাতে নিয়ে গৌতম রায় বললো, থ্যাংকস, মেনি থ্যাংকস! ওপরের বার্থে দুজন অবাঙালী, তারা এর মধ্যেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। বাদল জানলা দিয়ে দেখতে লাগলো বাইরের অন্ধকার।

গৌতম রায় পরিপাটি করে বিছানা পাতলো, তারপর তলা থেকে একটা ছোট সুটকেস বিছানার ওপর এনে পা গুটিয়ে বসলো। সুটকেস থেকে বেরুলো একটা মদের বোতল আর প্লাষ্টিকের গেলাস। ফ্লাস্কে জল। খুব নিবিষ্টভাবে গেলাসে মদ ঢেলে জল মেশালো। বাদল ওর দিকে তাকাবে না ভেবেও আড়চোখে না দেখে পারছে না। গৌতম রায় ঠোঁটের কাচে গেলাস তুলে হঠাৎ সরিয়ে নিয়ে বাদলকে বললো, আই হোপ ইউ ডোন্ট মাইন্ড?

বাদল এক অক্ষরে জবাব দিল, না।

গৌতম রায় এবার উৎসাহের সঙ্গে বলল, ও আপনি বাঙালী? ভালোই হলো গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। কলকাতা পর্যন্তই যাবেন তো?

বাদল ভেবেছিল, গৌতম রায়ের সঙ্গে সে নিজে গিয়ে দেখা করবে, কিন্তু এখন তাকে সামনে পেয়েও সে কোনো কথা বলার উৎসাহ পাচ্ছে না। তা ছাড়া লোকটার মধ্যে আপত্তিকর কিছুই সে দেখছে না—বরং সরল ধরনের মানুষই মনে হয়।

গৌতম রায় বললো, ইয়ে মানে, আপনি একটু খাবেন নাকি? আমার কাছে খবু বেশী নেই অবশ্য...মানে বেশ শীত শীত লাগছে তো।

বাদল বললো, না। আমি খাই না।

—খান না? তা হলে তো বেঁচে গেছেন। বেনারসে বিজনেস আছে বুঝি আপনার!

—না।

—তা হলে অন্য কোনো কাজে এসেছিলেন? একা একা বেনারসে তো কেউ বেড়াতে আসে না! আর যাই বলুন, সে বেনারস আর নেই, এখন মশাই এখানকার ঘিতেও ভেজাল। আগে রাবড়ি ছিল দু'টাকা সের, এখন সেই রাবড়ি—

মিনিট দশেকের মধ্যে গেলাস শেষ করে আবার ঢাললো। অনবরত কথা বলে যাচ্ছে, লোকটি কথা বলতে ভালোবাসে, বাদল যে হুঁ-হার বেশী কিছু বলছে না, সেদিকে লক্ষ্য নেই। লোকটির আর একটা অদ্ভুত স্বভাব, মদ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পানও চিবিয়ে যায়। একটু পরে আবার একটা চুরুট ধরালো। নানা রকম নেশায় শরীরটা সব সময় ব্যস্ত ও উত্তেজিত না রাখলে ওর চলে না। ভেতরের কোনো একটা অস্থিরতাকে যেন চাপা দিতে চাইছে। ওর কথাবার্ত্তার মধ্যে অবশ্য কোনো অহংকার কিংবা কৃত্রিমতা নেই।

—আমি গানের লাইনে আমি, এখানে এসেছিলাম একটা সিনেমার ব্যাপারে—একটা বাঈজীর নাচের সিন আছে, তার ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক...আমার নাম গৌতম রায়। আপনার নাম?

বাদল শুধু নিজের নাম বললো। আর কোনো কৌতূহল দেখালো না। এমন কি কোথায় কাজ করে, সে কথাও বলেনি—তার অফিসের নাম শুনলেই গৌতম রায় চিনতে পারত।

গৌতম রায় হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো, আপনি গান-বাজনা, সিনেমা-থিয়েটার একেবারেই পছন্দ করেন না বুঝতে পারছি।

—কেন বলুন তো?

—আমার নাম শুনেও চিনতে পারলেন না। সাধারণত লোকে আমার নাম শুনলে 'ও, আপনিই গৌতম রায়!' এই বলে একটু অন্যরকম ভাবে তাকায়। সেটা দেখাই অভ্যেস হয়ে গেছে তো! বুঝেছি কাশীতে বাংলা বই-টই তেমন আসে না তো।

—আমি কাশীতে থাকি না। কলকাতায় থাকি।

—সত্যি বলছি মশাই, কেউ আমার নাম শুনে চিনতে না পারলে এখন অবাকই লাগে। আসলে অবাক হবার কি আছে, মাত্র বছর চারেক ধরেই তো একটু বেশি... কিন্তু বাংলা দেশে সিনেমার লোকেদের নিয়েই বেশী মাতামাতি করে কিনা, কত বড় বড় মনীষীকে সাধারণ মানুষ চেনে না, কিন্তু উত্তম কিংবা সুচিত্রা যদি রাস্তায় বেরোয়—

আমি অবশ্য আগে থেকেই আপনাকে চিনি। আপনার গান বেশী শোনা হয়নি

এখনো, কিন্তু একটি মেয়ের মুখে আপনার কথা শুনেছি।

—আপনি আমাকে চেনেন! আচ্ছা চাপা লোক তো আপনি মশাই। কিছু বলেননি এতক্ষণ! কে বলেছে আমার কথা?

—বল্লরী নামে একটি মেয়েকে আপনি ফিল্মে গান গাইবার সুযোগ দিচ্ছেন—

—বল্লরী? কে বল্লরী?

—আপনি বল্লরীকে চেনেন না? সে আপনার সঙ্গে দু' একটা অনুষ্ঠানে গান গেয়েছে!

—ওঃ, হো বল্লরী সরকার? সে আবার এখন সুজাতা সরকার নাম নিতে চাইছে ফিল্‌মে। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, বল্লরীর চেয়ে কি সুজাতা নামটা ভালো? আপনি বল্লরীকে চেনেন?

—না, সে রকম কিছু নয়। ওর বাবাকে আমি চিনতাম...কিছুদিন আগে একদিন রাস্তায় দেখা হলো বল্লরীর সঙ্গে, তখন বললো...

—কি বলেছে আমার সম্বন্ধে?

—আপনি ওদের গানের ইস্কুলে গিয়েছিলেন, ওর গান শুনে পছন্দ করে ওকে ফিলমে গাই গাইবার চান্স দিচ্ছেন।

—হ্যাঁ মেয়েটির গলা শুনে আমার বেশ ভালোই লেগেছিল। ভেবেছিলুম, একটু সুযোগ-টুযোগ পেলে খুব উন্নতি করবে—এখন অবশ্য তা মনে হয় না।

—এখন মনে হয় না? পারবে না ও?

—কি করে পারবে? সাধনা ছাড়া কি সঙ্গীত হয়? আপনিই বলুন!

আজকাল ছেলেমেয়েদের তো দেখছি—দু'চারখানা গান গলায় তুলেই ভাবে মস্ত গায়ক হয়ে গেছে। আর কিছু শেখার নেই! ঐ জন্যই তো হঠাৎ নাম হয়, হঠাৎ আবার ডুবে যায়। সাধনা নেই, বুঝলেন, কোনো সাধনা নেই। বল্লরী মেয়েটি ভেবেছিলুম ভালোই গানটান গাইবে—কিন্তু এর মধ্যেই সে গান ছেড়ে সিনেমায় অভিনয় করার জন্য ঝুঁকেছে!

—তাই বুঝি?

গৌতম রায় গেলাসে আবার মদ ঢাললো। মুখখানা তার লালচে হয়ে এসেছে চোখ দুটো ছলছলে। লোকটি যেন মনের মধ্যে সত্যিই কোথাও আঘাত পেয়েছে। খানিকটা ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, মাঝে মাঝে আমার নিজেরই অনুতাপ হয়, কত ভালো ভালো মেয়েকে চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যেতে দেখলুম। রুপোলি পর্দার নেশা বড় সাংঘাতিক নেশা। আপনাদের সঙ্গে কেমন চেনাশুনো বল্লরীর? বলে কয়ে এখনো ফেরাতে পারেন না?

বাদল মৃদুস্বরে বললো, আমার কথা শুনবে কেন? আমার সেরকম কিছু...

—বড় খারাপ লাইন। দেখতে শুনতে যদি একটু ভালো হয়, আর বয়েসটা কম থাকে—তাহলে সে সব মেয়েদের মান ইজ্জৎ বাঁচিয়ে রাখা মুশকিল। কটা মেয়ে আর নায়িকা হয় বলুন? কিন্তু ঐ লোভে ডজন ডজন মেয়ে এসে পুড়ে মরে। বল্লরী যদি শুধু গান-বাজনা নিয়েই থাকতো, হয়তো উন্নতি করতো, তা নয়, মুখে রং মেখে সে অ্যাকট্রেস হতে চায়।

শীতের হাওয়ার জন্য বাদল জানলার কাচ তুলে রেখেছিল। কিন্তু গৌতম রায়ের চুরুটের ধোঁয়ায় তার অস্বস্তি হচ্ছে। জানলা খুলে বাদল চোখে মুখে খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগালো। তারপর সেও একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন মনে করবো কি আবার!

—আমি অবশ্য গান-বাজনা তেমন ভালো বুঝি না, কিন্তু বল্লরীর গান যা দু'একবার শুনেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে—ওর গলায় তেমন সুর নেই—কয়েকখানা গান মন্দ গায় না, কিন্তু বড় গায়িকা হওয়া ওর পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়! তা হলে, আপনি ওকে পছন্দ করেছিলেন কেন?

—খানিকটা চেহারা দেখেও বলতে পারেন। মেয়েটাকে দেখতে তো ভালো, ভালো চেহারা দেখলে কার না ভালো লাগে? তবে ওর গলাও খারাপ নয়। আপনি ঠিকই বলেছেন, খুব সুরেলা না অবশ্য, কিন্তু গলার জোর আছে—অধিকাংশ মেয়েরই তো মিনমিনে, ফলসেটাতো গায়, সেই তুলনায় ওর গলা...শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে...কিন্তু ঐ যে বললুম সাধনা দরকার।

—বল্লরী কোনো ফিলমে পার্ট করার সুযোগ পেয়েছে?

—এখনো পায়নি। আমাকে ধরেছে খুব, আমার নতুন ছবিটায়—নায়িকার অনেক গান আছে, কিন্তু পরিচালনা করছে সন্তোষ—তার ইচ্ছে বোম্বে থেকে কোনো হিরোইন আনে...আপনি তো এ লাইনের কথা জানেন না। আপনি বুঝতে পারবেন না—কতগুলো ধূর্ত, ঝানু বদমাইশ লোকের মাঝখশনে একটি কচি মেয়ে...কতক্ষণ মাথার ঠিক রাখতে পারবে? আমার কষ্ট হয়, অমিই তো এনেছি মেয়েটাকে—ওর বাবাকে আপনি বলুন না, যাতে মেয়েকে শাসন করে? বাড়ির অবস্থা কি রকম ওদের? খুব অভাব?

—না, ওদের টাকা পয়সার খুব অভাব নয়। তবে ওর বাবা বেঁচে নেই।

—নেই! তাহলে আর কি! তাহলে যা হবার তাই হবে। আমারই মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন? মনে হয় আমার গলায় ক্যানসার হবে। ছেলেবেলায় বাড়ি

থেকে পালিয়ে বরোদায় গিয়েছিলুম, ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের কাছে গান শিখবো বলে! ওস্তাদজীর তখন অনেক বয়েস...পাত্তা পাইনি। তারপর গিয়েছিলুম পটবর্ধনের কাছে, অনেক হত্যে দিয়ে তো তাঁর দেখা পেলুম—তিনি বললেন, তুই গান শিখতে পারবি না। তোরা বাঙালীরা বড় ছটফটে—গুরুজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—সারাজীবন সঙ্গীতের সাধনা করবো, গলা বেচতে যাব না—কিন্তু সেকথা রাখিনি—গুরুর কাছে মিথ্যেবাদী হয়েছি।

—আপনি পটবর্ধনের কাছে কতদিন শিখেছিলেন?

গৌতম রায় সেকথা শুনতে পেল না। নেশা কিংবা আবেগের আতিশয্যে তার চোখ দুটো যেন ছলছলে হয়ে এসেছে। ফৈয়াজ খাঁ কিংবা পটবর্ধনের নাম উচ্চারণ করার সময় সে ভক্তির সঙ্গে দুই কান স্পর্শ করছিল। কামরার আলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে, যেন ওখানে কিছু দেখতে পাচ্ছে। একটু পরে বাদলের দিকে তাকিয়ে বললো, কেন নষ্ট হয়েছি জানেন? মদের গেলাসটা তুলে বললো, এই জন্যে। মদ তো অনেকেই খায়, বড় বড় ওস্তাদদেরও খেতে দেখেছি, কত বড় বড় লোক মাঝে মাঝে মদ খায় কিছু হয় না তাদের—কিন্তু সেই শরৎ চাটুজ্যের কথা আছে না, মদই আমাকে খেয়েছে! অন্য সময় নানান দুঃখে কষ্টে থাকি, কিন্তু যখন নেশা হয় তখন আর মনে থাকে না কিছু, কি যে করি, কি যে বলি, আমি নিজেই বুঝি না। আমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছি। আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।

গৌতম রায় আবার একগেলাস ঢেলে এক চুমুকে শেষ করলো। বাঁ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছলো। বালিশের তলা থেকে রুমাল বার করে ফড়াৎ করে নাক ঝাড়লো, তাকিয়ে রইলো রুমালটার দিকে, তারপর কি ভেবে রুমালটাকে ফেলে দিল জানলা গলিয়ে। দু'বার কাশলো, ঘঙ ঘঙ শব্দ হলো বুকের মধ্যে—অনেক দিনের সর্দি সেখানে শুকনো হয়ে আছে। চোখ দুটো এখন লাল। বাদলের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ধরনের হেসে বললো, অনেক বক্‌বক্ করলুম আপনার সঙ্গে। এবার শুয়ে পড়া যাক, কি বলেন! মাথার কাছের জানলা বন্ধ রাখবো? না খোলা থাকলে আপনার সুবিধে হয়! আপনি যা বলবেন, আমার কিছু যায় আসে না—এখন আমার কাছে শীত গ্রীষ্ম সব সমান, বুঝলেন, সব সমান—

চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তে না পড়তেই গৌতম রায় নাক ডাকাতে শুরু করলো। বাদল বড় আলোটা নিবিয়ে নীল আলোটা জ্বেলে রাখলো। তার ঘুম আসেনি এখনও। গৌতম রায় বেঁকেচুরে আছে। খানিকটা কুঁচকে আছে ওর ভুরু দুটো ও ঠোঁট—হয়তো এর মধ্যেই ও কোনো দুঃখের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

বাদল এই লোকটার সঙ্গে দেখা করবে ভেবেছিল। কিন্তু লোকটাকে সে যেরকম ভেবেছিল মোটেই সে-রকম নয়। খানিকটা দুর্বল অসহায় ধরনের মানুষ। ওর ঐ রোগা চেহারাটার মধ্যেও এখন বিবেক বলে জিনিসটা জেগে রয়েছে। বাদল ভেবেছিল, বল্লরী সম্পর্কে ওকে সাবধান করেদেবে। কিন্তু এ নিজেই বল্লরী সম্পর্কে চিন্তিত, বল্লরীকে ও বাঁচাতেই চাইছে। অমন সরল সুন্দর মেয়ে বল্লরী— সে শেষ পর্যন্ত একটা ঘিনঘিনে অবাহাওয়ায় মিশে যাবে। কিন্তু বল্লরী বলেছিল, নিজের ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা তার আছে। সত্যি কি আছে? বড় ছেলেমানুষ আর জেদী মেয়ে। গৌতম রায় বল্লরীর কাছে একটা সিঁড়ি মাত্র, ওর ওপর ভর দিয়ে উঠতে চাইছে। একবার ওপরে উঠলে, পা দিয়ে এই সিঁড়িটাকে ও সরিয়ে দেবে। যদি ওখান থেকে আবার নামতে হয়, তখন সিঁড়ির প্রয়োজন হবে না! অধঃপতনের জন্য সিঁড়ি লাগে না।

কিন্তু বল্লরী...না, না, কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

॥ সাত॥

বাদল আর ভাস্করদের বাড়িতে যায়নি। সেদিনের সেই ঘটনার পর ভাস্কর আর মণিকার ওপর তার অসম্ভব রাগ হয়েছিল। এখন অবশ্য ততখানি রাগ আর নেই, কেননা সে বুঝতে পেরেছে, আর যাই হোক, ভাস্কর আর মণিকার উদ্দেশ্য তো খারাপ ছিল না। ওরা ভেবেছিল মল্লিকার সঙ্গে তার সাধারণ মান-অভিমানের ঝগড়া ওরা সেটা মিটিয়ে দেবার কৃতিত্ব নেবে। কিন্তু ওদের কথাবার্তা, রসিকতা—সবই অত্যন্ত স্থূল মনে হচ্ছিল তার। বাদল বুঝতে পেরেছে, মণিকা আর ভাস্কর যে জগতে আছে সেখানে সে কিছুতেই স্বচ্ছন্দ ভাবে বিচরণ করতে পারবে না। ওরা ভাবে, একটি মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে, আর একটি মেয়েকে অনায়াসে বিয়ে করা যায়।

কিংবা দুজন নারী পুরুষের ঝগড়া তৃতীয় ব্যক্তি মিটিয়ে দিতে পারে? অভিমান জিনিসটা ভাস্করের মতে নিতান্তই ছেলেমানুষী! বাদল আয়নার সামনে দাঁনিয়ে ছোট ছেলেদের মত ঠোঁট উল্টেঅভিমনের ভঙ্গি করে একটু হাসলো। আমিও ছেলেমানুষ? হয়তো, তাই মল্লিকার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইবার সাহস আমার হয় না কেন? অথচ, এটাও তো ঠিক, মল্লিকা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের কথা চিন্তা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিছুদিন আগেও হয়তো সম্ভব ছিল। কিন্তু সেদিন ভাস্করের বাড়িতে মল্লিকাকে দেখার পর—আর সম্ভব নয়।

ভাস্কর দু'একবার টেলিফোন করেছিল বাদলের অফিসে। নানা রকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছে, তা বউ মণিকা সেদিন বাদলের বোকা বোকা ব্যবহার দেখে কি রকম

হাসাহাসি করেছিল—সে কথা সবিস্তারে বলেছে, ওর বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধও জানিয়েছে। তারপর মাসখানেক ধরে ভাস্কর আবার চুপ, আর তার কোনো খবর নেই।

এর পর ভাস্করকে একদিন রাস্তায় দেখলো। তার আগের দিন টিটাগড়ে সাঙ্ঘাতিক শ্রমিক সংঘর্ষ হয়েছে, পুলিসের গুলিতে সাতজন শ্রমিক মারা গেছে। তার জন্য আজ শোক মিছিল বেরিয়েছে কলকাতায়। দীর্ঘ মিছিল, ট্রাম-বাস সব বন্ধ হয়ে আছে অনেকক্ষণ, একটা থেমে থাকা বাসের জানলায় বসে ছিল বাদল, সেখান থেকে শোক মিছিল দেখছিল, তার মধ্যে ভাস্করকে দেখতে পেল। এই মিছিলে কোনো শ্লোগান নেই, শান্ত গাম্ভীর্যময়। নীরব প্রতিবাদও কত প্রবল হয়ে উঠতে পারে—এই মিছিলটা দেখলে বোঝা যায়। ভাস্করের চোখে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে এখন। থমথমে মুখ, তার লম্বা চেহারাটা টানটান করে হাঁটছে—দেখলেই বোঝা যায়— এর মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত শোকের কাতরতা নেই, প্রবল প্রতিবাদ যে কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়বে। ভাস্কর বাদলকে দেখেনি। হঠাৎ বাদলের খুব শ্রদ্ধা হলো ভাস্কর সম্পর্কে, একবার তার ইচ্ছে হলো সেও বাস থেকে নেমে গিয়ে ভাস্করের পাশে পাশে হাঁটে। কিন্তু অন্তর্নিহিত লাজুকতায় দোনামোনা করতে করতেই মিছিলে ভাস্কর অনেকটা এগিয়ে গেল।

বাদলের মনে হলো, প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি নিজস্ব ভূমিকার ক্ষেত্র আছে। ভাস্করকে যেমন আজ এই ভূমিকায় সবচেয়ে বেশী মানিয়েছে—ভাস্করের আন্তরিকতা এখানে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। এই ভূমিকায় এখন এই মুহূর্তে ভাস্কর তার চেয়ে মানুষ হিসেবে বড়। ভাস্করের প্রতি আর রাগ রইলো না বাদলের।

মল্লিকা কিংবা বল্লরীর সঙ্গে আর একবারও দেখা হয়নি। রাস্তা-ঘাটে চলার সময় বাদল আজকাল সব সময় উন্মুখ হয়ে হাঁটে, কলকাতা শহরে এত মানুষের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যায়—তার সঙ্গেও মল্লিকার সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে। একমাত্র হঠাৎ দেখা হলেই বাদল মল্লিকার সঙ্গে কথা বলতে পারবে, যে কোনো তুচ্ছ মামুলি কথা, কিন্তু নিজে থেকে আর দেখা করবে না।

বাড়ি ফিরে বাদল প্রত্যেকদিনই ডাকবাক্সে উঁকি দিয়ে দেখে—তার নামে কোনো চিঠি এসেছে কিনা। কে চিঠি লিখবে, কার চিঠির আশা করছে? নিজেই সে ভালো করে জানে না। বিশেষ চিঠিপত্র আসে না বাদলের নামে, তার নিজের চিঠি লেখার অভ্যেসও নেই বিশেষ, সুতরাং তাকে কে লিখবে! তবু এক একদিন শূন্য ডাকবাক্সের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, মল্লিকাও তো তার কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি লিখতে পারে। তাহলেই ব্যাপারটা চুকে যায়। পরক্ষণেই, সে ভাবে, মল্লিকা কেন

তার কাছে ক্ষমা চাইবে? সে তো অপরাধ করেনি, অপরাধ তো করেছি আমি। হ্যাঁ, আমি একটা ছোট অপরাধ করেছিলুম বটে, কিন্তু মল্লিকা সেটা ক্ষমা করতে পারেনি কেন? ক্ষমা করতে না পারাও অপরাধ, নিশ্চয়ই অপরাধ।

বৌদি ক'দিন বাপের বাড়ি ঘুরে এসে আবার আগের মতনই হাসিখুশীর আগের মতনই আবার যখন তখন শাড়ি কিনতে বেরিয়ে যান। দাদার মুখেও কোনো রাগের চিহ্ন নেই, ছুটির দিনে বন্ধুদের ডেকে সারাবাড়ি সরগরম করে দাদা তাসের আসর বসান আবার। বাদল জানে, দাদা বৌদির মধ্যে বছরে একবারের বেশী ঝগড়া হয় না। আবার সামনের বছরে একদিন তুমুল কাণ্ড হবে, আবার বৌদির আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হবে, দাদার ইচ্ছে হবে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না—সব ঝগড়াই মিটে যায়, কোনো চিহ্ন পর্যন্ত রাখে না।

অফিস থেকে ফিরে বাদল বাথরুমে ঢুকেছিল গা ধুতে, বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বৌদি বললেন, ঠাকুর পো, কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছো না! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

বাদল ব্যস্ত হয়ে বললো, না বৌদি, বেরুচ্ছি আর এক মিনিট।

—একটি মেয়ে যে তোমার জন্য অনেকক্ষণ বসে আছে।

—কে?

—একটি মেয়ে! তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

—মেয়ে! আমার সঙ্গে...কে?

বৌদির হাসির শব্দ শোনা গেল। হাসতে হাসতে বৌদি বললেন, আমি তার কি জানি। আমি কি তোমার সব মেয়ে বন্ধুদের চিনি? মাথায় অবশ্য সিঁদুর দেখলাম। নাও, তাড়াতাড়ি বেরোও—

বাদল বিমূঢ় হয়ে গেল। তাকে ডাকতে কোনোদিন কোনো মেয়ে আসেনি এ বাড়িতে। কলেজ জীবনেই কেউ আসেনি—এখন তো আরও...বিবাহিতা মেয়ে? অফিসের কেউ? কিন্তু অফিসের কোনো সহকর্মীর স্ত্রী হলে একা আসবে কেন? তা ছাড়া, কোনো সহকর্মী কখনো আসেওনি এ রকম...বাদল বাথরুমে গেঞ্জি কিংবা জামা আনেনি—এখন খালি গায়ে বেরিয়ে তাকে বাথরুম থেকে নিজের ঘরে যেতে হবে—মেয়েটিকে যদি বারান্দায় বসিয়ে থাকে—তাহলে তার সামনে দিয়ে...

বারান্দায় কেউ নেই, বৌদির যা কাণ্ড, মেয়েটিকে বসিয়েছে একেবারে বাদলের ঘরে। ঘরে ঢুকে বাদল লজ্জা পাবার চেয়েও বেশী অবাক হয়ে গেল। ভাস্করের স্ত্রী মণিকা জানলার ধারের চেয়ারে বসে দিব্যি গল্প জমিয়ে দিয়েছে বৌদির সঙ্গে। বাদলকে দেখে হাসতে হাসতে বললো, খুব চমকে গেছেন তো? আপনি তো আর কোনোদিন

নেমন্তন্ন করলেন না, তাই নিজের থেকেই এলাম।

আলনা থেকে পাঞ্জাবিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি গলিয়ে বাদল হেসে বললো, খুব ভালো করেছেন। সত্যিই আমার নেমন্তন্ন করা উচিত ছিল। ভাস্কর কোথায়? এলো না?

—ওকে তো রোজই বলি। আজ ও আসতো, হঠাৎ দুজন বন্ধু এসে হাজির হলো, কি মিটিং আছে—তাই আমি নিজেই—

বাদল তবুও মনে মনে বুঝতে পারলো, মণিকা এমনি এমনি হঠাৎ আসেনি। তার কোনো উদ্দেশ্য আছে। তার বসে থাকার ভঙ্গি, তার মুখের ভাব—এসব কিছুর মধ্যেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু মণিকা তার উদ্দেশ্যের কথা কিছুতেই বলতে প্রস্তুত নয়!

বৌদির সঙ্গে খুব সহজ ভাবে গল্প করছে মণিকা। এরই মধ্যে কথায় কথায় বেরিয়ে পড়েছে, বৌদির এক মামাতো বোনকে চেনে মণিকা, তার গল্প থেকে শুরু করে, ইউনিভার্সিটির কথা, গ্যাসের উনুনের সুবিধে অসুবিধে, নাইলন জর্জেট শাড়িরও ভেজাল বেরুবার খবর—কিছুই বাদ গেল না। বাদলকে এ সব প্রসঙ্গে টেনে আনবার চেষ্টা করছে। একটু বাদে বৌদি বললেন, বোসো ভাই, তোমরা গল্প করো, আমি একটু চা করে আনি।

এমনি নয় যে, বৌদি চলে যাওয়া মাত্রই মণিকা কোনো গোপন কথা বলা শুরু করবে। একই রকম হালকা ভাবে বাদলকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, আর আসেন না কেন আমাদের বাড়িতে? রাগ করেছেন?

—না,না, রাগ করবো কেন?

—সেদিন মল্লিকাদির সঙ্গে তো আপনি একসঙ্গেই বেরুলেন আমাদের বাড়ি থেকে, তবু ভাব হলো না?

—ভাব হয়েছে কিনা আপনি কি করে জানলেন?

—আমি জানতে পারি।

বাদল তৎক্ষণাৎ ও প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, আপনাদের কোথায় বাইরে যাবার কথা ছিল না? গেলেন না।

—যাবো তো, কিন্তু আপনার বন্ধুর সময়ই হচ্ছে না। আপনি কাশীতে কেমন বেড়ালেন, বলুন।

মণিকা এলোমেলো টুকিটাকি বলে সময় কাটাচ্ছে। অস্বস্তি হচ্ছে বাদলের। মণিকার সঙ্গে সে তো কখনো ভাল করে মেশেনি—মণিকার সম্পর্কে সে বিশেষ কিছুই জানে না—তাকে শুধু সে ভাস্করের স্ত্রী হিসেবেই চেনে। সুতরাং মণিকার

সেঙ্গ একমাত্র ভাস্করের সম্পর্কে কথা বলাই তার পক্ষে সুবিধাজনক। বাদল বললো, ভাস্কর আজকাল খুব ব্যস্ত না! সেদিন ওকে দেখলাম শোক মিছিলে।

—হ্যাঁ খুব ব্যস্ত। কি নিয়ে ব্যস্ত তা কে জানে। শুনুন আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই।

বাদল তো জানেই, মণিকা একটা কোনো বিশেষ কথা বলার জন্যই তার কাছে এসেছে। সে উৎকর্ণ হয়ে বললো, কি?

—আপনার বন্ধুর সঙ্গে আজকাল প্রায়ই মল্লিকাদির দেখা হয়।

—তাই নাকি? কোথায়?

—ও তো বলে, পথেঘাটে নাকি হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। আমি কিন্তু জানি, আপনার বন্ধু ইচ্ছে করেই মল্লিকাদির সঙ্গে দেখা করতে যায়। আমাকে মিথ্যে কথা বলে।

বাদল একথা শুনে একটুও অবাক হলো না। মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ভাস্করের সঙ্গে যারই পরিচয় হয়, ভাস্কর তাকেই পার্টির কাজে লাগাতে চায়। বাদলকেও চেয়েছিল। আর মল্লিকার তো বরাবরই ওদিকে ঝোঁক আছে—সুতরাং ভাস্কর ওকে তার পার্টিতে টানার চেষ্টা করতেই পারে। ভালোই হবে তা হলে, মল্লিকা সত্যিই অনেক ভালো কাজ করতে পারবে। একদিন মল্লিকার ডাক শুনে ভাস্কর ব্ল্যাড ব্যাঙ্কে রক্ত রক্ত দিতে গিয়েছিল, আজ মল্লিকাকেই সে তার পার্টির কাজে জীবন দেবার জন্য ডাকবে—এটাই তো সঙ্গত।

বাদল একটু হেসে বললো, আপনি কি করে বুঝলেন, ভাস্কর মিথ্যে কথা বলে?

—কোনো স্বামী তার স্ত্রীর কাছে কোনো কথা লুকোতে পারে নাকি কখনো? চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যায়। কলকাতা শহরে এত লোক থাকতে শুধু বেছে বেছে ওর সঙ্গেই মল্লিকাদির দেখা হয়ে থাকে পথে-ঘাটে? মল্লিকাদি নিজে আমাকে বলেছেন, ও মল্লিকাদির বাড়িতে গিয়েছিল।

একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করলেই আপত্তি হবে, আপনি নিশ্চয়ই এতটা কনজারভেটিভ নন।

—দেখা করার প্রশ্ন নয়। আসলে, মল্লিকাদিকে দেখে ওর মাথা ঘুরে গেছে।

—হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে ফেলার মতন ছেলে তো ভাস্কর নয়!

—আপনাদের ছেলেদের কথা আর বলবেন না। চিনতে কিছু বাকি নেই আমার।

মণিকা একবার ভ্রূভঙ্গি করলো। বাদল এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না। মণিকা কি এই কথাটা বলার জন্যই এসেছে? বাদল এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সমাজসেবা কিংবা বস্তির মধ্যে গিয়ে লেখাপড়া শেখানোর ঝোঁক মল্লিকার

বহুদিনের। ভাস্কর নিশ্চয়ই তাকে তার পার্টির কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে—মল্লিকারও তাতে সুবিধেই হবে। একা একা ওসব করার চেয়ে একটা বিশেষ কোনো আদর্শ নিয়ে অন্যদের সঙ্গে যদি মেতে উঠতে পারে—। ভাস্করের হালকা ভাবে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করা স্বভাব—হয়তো সেরকমই কোনো বেহিসেবী রসিকথা তার স্ত্রীর কানে গেছে—

বাদল বললো, আমার মনে হয়, আপনি একটু বেশী ভাবছেন। সে রকম কিছু নয়—

—আমি ঠিকই ভাবছি। সে যাই হোক, আপনাকে আমি আমার স্বামীর কথা বলতে আসিনি। ওর ঘোরানো মাথা কি করে আবার সোজা করতে হবে—তা আমি ভালো ভাবেই জানি। আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম—

মাস দুয়েক পরে দেখছে মণিকাকে। মণিকা এর মধ্যে আর একটু মোটা হয়েছে, কিন্তু দৃষ্টিকটু হয়নি এখনও চেহারা। বরং বেশ একটা ভারিক্কী ব্যক্তিত্ব এসেছে। এমন একটা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বসে আছে যেন ভাস্করের মতন একটা রোগা-পাতলা স্বামীকে সামলানো তার পক্ষে কিছুই না।

মণিকা বললো, মল্লিকাদির বোধ হয় শিগ্‌গিরই চাকরি যাবে ইউনিভার্সিটি থেকে।

—কেন?

—ইউনিভার্সিটিতে ওর নামে হৈ-হৈ চলেছে। অনেকদিন থেকেই কানাঘুষো চলছিল, এখন একেবার—বিশেষত গত সপ্তাহে...আপনি শুনলে দুঃখ পাবেন—মল্লিকাদির কমবয়েসী ছেলেদের সম্পর্কে বেশ দুর্বলতা আছে। ছাত্রীদের চেয়ে ছাত্রদের সঙ্গেই ওর বেশী ভাব—অভিজিৎ বলে একটা ছেলে আছে আমাদের ক্লাসে—বড়লোকের বকাটে ছেলে, সব মেয়েদের জ্বালায়—মল্লিকাদির ওপরে ও অনেকদিন ধরে...ইউনিভার্সিটির সবাই জেনে ফেলেছে। অভিজিতের সঙ্গে এই শনিবার মল্লিকাদি গাড়িতে করে ডায়মণ্ডহাবার গিয়েছিলেন—আমাদের রেকটর পর্যন্ত...

বাদল স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলো মণিকার দিকে। মণিকা জানে না বাদল কিছুতেই তার কথা বিশ্বাস করবে না। মল্লিকার পক্ষে কোনো রকমে নোংরা কাজ করা অসম্ভব। এমনকি, কোনো দুরন্ত ছাত্রের পাল্লায় পড়ে মল্লিকা যদি গাড়িতে চেপে তার সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েও থাকে, তাতেও কিছু যায় আসে না—মল্লিকার চরিত্রে একটা কালো দাগও পড়বে না। সাধারণ মাপের মেয়েদের দেখাই তো সকলের অভ্যেস, মণিকা নিজেও যে রকম মেয়ে, ছোটখাটো লোভ কিংবা আনন্দ আর দুঃখ নিয়ে থাকে—ওরা তো জানে না, মল্লিকা এর থেকে অনেক

আলাদা জাতের মেয়ে। সমস্ত পৃথিবীও যদি একযোগে মল্লিকার বিরুদ্ধে কোনো কুৎসা রটায়, তাও বাদল বিশ্বাস করবে না। এ সম্পর্কে তার কোনো দ্বিধা নেই।

বাদল নিরুৎসুকভাবে বললো, তাই নাকি?

—মনে হচ্ছে, আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছেনা। মল্লিকাদির কিন্তু সত্যিই এই দোষটা আসছে, আজকাল ক্রমশ বাড়ছে। নিজের থেকে কমবয়েসী ছেলেদের সম্পর্কে একটা...আমরা আগে জানতুম, ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের ডঃ দে সরকার কিছুদিন আগে যিনি আমেরিকা থেকে ফিরেছেন, ব্যাচেলার এখনো, তাঁর সঙ্গেই মল্লিকাদির বিয়ে হতে পারে—সে রকম ভাব দেখিয়েছিলেন—কিন্তু মল্লিকাদি ওঁকে পাত্তাই দিলেন না। কোনো প্রফেসরের সঙ্গেই ওর তেমন ভাব নেই। শুধু ছাত্রদের দিকেই—এটা একটা রোগ বলতে পারেন।

—রোগ কেন হবে? অধ্যাপকের সঙ্গে যদি ছাত্রীর প্রেম হতে পারে, তবে অধ্যাপিকার সঙ্গেই বা কেন কোনো ছাত্রের প্রেম হতে পারবে না?

—আপনি বুঝি একে প্রেম বলেন? এই মহিলার জন্যই আপনি আপনার জীবপটা নষ্ট করছেন?

—আপনি ভুল করছেন। আমি আমার জীবনটা নষ্ট করতে যাবো কেন! চাকরি করছি, টাকা জমাচ্ছি—এর নাম জীবন নষ্ট করা?

—এই রকম একটা বদনাম নিয়ে মল্লিকাদির চাকরি গেলে, উনি আর কোথাও চাকরি পাবেন না।

—ছাত্রের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে সেই কারণেই কারুর চাকরি যেতে পারে কিনা আমি জানি না। আমি এর মধ্যে কোনো দোষ দেখছি না। যাই হোক, চাকরি যাবে কি যাবে না সেটা আপনার মল্লিকাদির ভাবনা—আমার তো নয়!

বৌদি চা আর খাবার নিয়ে আসতেই মণিকা বাদলকে কিছু একটা উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেল। মুখের ভাব সম্পূর্ণ পালটে কলস্বরে বলে উঠলো, একি, এত খাবার এনেছেন, না, এত কে খাবে? আপনার ছেলেকে দেখলুম না।

কিছুক্ষণ বাদে মণিকা যখন উঠতে চাইলো বাদল তাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো। রাস্তায় বেরিয়ে মণিকা বিশেষ কিছু কথা বললো না। বাসে ওঠবার আগে শুধু বললো, আপনি যেন ভাববেন না, আপনার বন্ধু সম্পর্কে নালিশ করতে এসেছিলুম আপনার কাছে। আমি আপনার কথাই ভাবছিলুম।

—আপনি সত্যিই আমার সম্পর্কে অনেক ভাবেন।

—আপনাকে দেখলেই যে কি রকম অসহায় মনে হয়। এই রকম অসহায় ধরনের ছেলেদের দিকেই মেয়েদের টান থাকে।

—অন্তত একজন মহিলারও যে আমার দিকে টান আছে, একথা জানতে পারলে বেশ ভালো লাগে।

—ইস, বেশ কথা শিখে গেছেন তো এর মধ্যেই। আজ চলি, আবার কবে আমাদের বাড়ি আসবেন বলুন।

—যাবো একদিন।

—কবে?

—দিন বলতে পারছি না। যে-কোনো একদিন।

মণিকা বাসে ওঠার পর বাদল সেখানেই মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। মণিকার কথা সে কতখানি বিশ্বাস করবে? সে সব মানুষকেই বিশ্বাস করতে চায়। সেই হিসেবে মণিকাকেও বিশ্বাস করবে। অর্থাৎ মণিকার বলা ঘটনাগুলো শুধু, সেসব ঘটনার মর্ম নয়।

কিন্তু সে কেন নিজেকে এমন ঠকাচ্ছে। বাইরে সে এত শান্ত ভাব দেখাচ্ছে—ভেতরটা যে তছনছ হয়ে যাচ্ছে-তার। তার মনের মধ্যে এমন কোনো দুঃখ কিংবা কোনো আনন্দ নেই। শুধু একটা ঝড়ের মতন শব্দ। সে এখানে দাঁড়িয়ে কি করছে?

বাদল শুধু একবার দেখলো, পাঞ্জাবির পকেটে মানিব্যাগটা আছে কিনা। সেটুকু দেখেই সেই মুহূর্তে মনস্থির করে ফেললো। হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামালো।

বেল টিপতেই দরজা খুললো একজন নতুন চাকর। একে বাদল দেখেনি। বাড়িটার চেহারাও এই ক'বছরে একটু জীর্ণ হয়েছে, রাসবিহারী মারা যাবার পর আর দেওয়ালে পলেস্তারা পড়েনি, হোয়াইট ওয়াশ হয়নি। এক সময় বাদল এ বাড়িতে প্রায় প্রত্যেক দিন আসতো, দরজা খোলা থাকলে কারুকে না ডেকেই দোতলায় উঠে যেত।

চাকরকে বললো, দিদিমণিকে ডেকে দাও।

—কোন দিদিমনি?

বাদল এক মুহূর্ত ভাবলো। এখানে এসে পৌঁছুবার পর ভেতরে ভেতরে খানিকটা নার্ভাস বোধ করছে। বাদল বললো, যে-কোনো একজন।

চাকর আবার জিজ্ঞেস করলো, মেজদিমণি বা ছোটদিমণি?

বাদল এবার জোর দিয়ে বললো, যে কোনো একজনকে।

বাইরের ঘরে তাকে বসিয়ে চাকর ওপরে চলে গেল। ঘরটার কিছুই পায় বদলায়নি, শুধু রাসবিহারীর একটা ছবি ঝুলছে। সোপা সেটির ঢাকাগুলো পর্যন্ত বদলানো হয়নি। বাদল রাসবিহারীর ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

রাসবিহারীবাবু খুব ভালোবাসতেন বাদলকে। বাদল হঠাৎ যেদিন থেকে এ

বাড়িতে আসা বন্ধ করে, তখন রাসবিহারী কি ভেবেছিলেন কে জানে, কোনোদিন তিনিও অবশ্য বাদলের খোঁজ করেননি আর। কে জানে তাঁকে কি বলা হয়েছিল। ঘরের যে দিকেই তুমি যাও, মনে হবে ছবির চোখ তোমার দিকেই তাকিয়ে আছে। রাসবিহারীও দেখছেন বাদলকে—ছবির মধ্যে চিরস্থায়ী হাসিমাখা চোখে।

বাড়িটা যেন আগের থেকে অনেক নিঝুম। কোনো শব্দ নেই, অনেকক্ষণ সময় লাগছে তো! কে আসবে বল্লরী, না মল্লিকা? বাদল মনে মনে বেশ উত্তেজনা বোধ করতে লাগলো। হঠাৎ তার রূপনারায়ণ নদীর পারে সেই রাত্রির খেলার কথা মনে পড়লো। বাদল যেন আজও সেইরকম নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, বল্লরী আর মল্লিকা দুজনেই লুকিয়েছে আবছা অন্ধকারে। বাদল খুঁজতে খুঁজতে একজনকে ছুঁয়ে দেবে। কে?

সিঁড়িতে হাল্কা পায়ের শব্দ। নেমে আসছে একজন। বাদলের উত্তেজনা অধীর হয়ে উঠলো, বহুদিন এমন আবেগ অনুভব করেনি, আর দু-এক মুহূর্ত—

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লরী বাদলকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো, পর মুহূর্তেই হাসিমুখে সে বললো, একি বাদলদা আপনি! সত্যি এলেন তাহলে এ বাড়িতে?

উত্তেজনার চূড়ান্ত মুহূর্ত পার হয়ে গেছে,বাদল এবার শান্ত। শান্ত ভাবেই বললো, কেন, আসতে নেই!

বল্লরীর ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি। ঝুপ করে বাদলের সামনের সোফায় বসে পড়ে বললো, না আসতে নেই। কেন এলেন? দিদি আপনাকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করেছে না।

বাদলও শুকনো ভাবে হেসে বললো, তোমার দিদি বারণ করেছে, তুমি তো বারণ করোনি। এখন তুমিও অ্যাডাল্ট হয়েছো, তোমারও একটা নিজস্ব মতামত আছে। শুধু চেনা হিসেবেও তো আসতে পারি।

—আপনি কি আসবার আগে আমার মতামত নিয়েছেন। এতদিন তো একবারও আসেননি। আপনার অফিসে আমি গান গাইতে গিয়েছিলুম, আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেননি সেদিন।

—তুমি সেদিন আমাকে দেখতে পেয়েছিলে?

—কেন দেখতে পাবো না, আমি কি অন্ধ নাকি? আপনি পেছন দিকে বসেছিলেন। সেদিন যা রাগ হয়েছিল আমার—

—ঠিক আছে, এখনও যদি রাগ থেকে থাকে—আমি চলে যাচ্ছি।

বল্লরী এবার জোরে হাসল। বললো, তার আগে সত্যি করে বলুন তো, আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

—সত্যি কথা বলবো? আসবার সময়েও ঠিক ভাবিনি। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ভাবিনি যে এখানে আসবো—হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম। তবে, অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছিল, তুমি তো আজকাল দারুণ ব্যস্ত, তুমি হয়তো বাড়িতে থাকবে না। আবার মল্লিকার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে ভেবে খানিকটা ভয়-ভয়ও করছিল।

—আজ কিন্তু উল্টো হলো। আজ দিদিই বাড়িতে নেই, আমি আছি।

—তোমার দিদি এখনো ফেরেনি? সোওয়া আটটা বাজে।

—দিদি তো ইউনিভার্সিটি থেকে প্রায়ই দেরী করে ফেরে। যাকগে, শুনুন, দিদির সঙ্গে যখন আজ দেখা হবে, তখন বলবেন আপনি দিদির সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছেন!

—কেন?

—দিদি ঐ কথা শুনলে খুশী হবে। মেয়েদের কখন কি বলতে হয়, আপনি তো তা এখনো শিখলেন না? তাই শিখিয়ে দিচ্ছি।

—সেই হিসাবে, তোমাকে আমার বলা উচিত ছিল যে আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি?

বল্লরী আবার ঝরঝর করে হেসে ফেলে বললো, হ্যাঁ—কিন্তু এখন তো আর শোধরাবার উপায় নেই। আগেই বলে ফেলেছেন। এখন আর হাজার বললেও বিশ্বাস করবো না—আপনি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই ছুটে এসেছেন।

শেষ যখন এ বাড়িতে বল্লরীকে দেখেছিল বাদল, তখন বল্লরী স্কার্ট কিংবা ফ্রক পরতো। ওর বয়েসী মেয়ের তুলনায় বল্লরীর একটু অন্যরকম রুচি ছিল, রঙিনের বদলে সাদা পোশাকই পরতে ভালোবাসতো। সাদা কিন্তু সাদামাটা নয়, সাদা সিল্ক, তাফেতা কিংবা নাইলন ছাড়া আর অন্য কিছু তার পছন্দ হতো না। বল্লরীর ফর্সা ঝকঝকে শরীরে ঐ সাদা মসৃণ পোশাক...তাকে একটা হাঁসের মতনই মনে হতো।

আজ বল্লরী পরেছে একটা গাঢ় নীল রঙের শাড়ি, সেই রঙেরই ব্লাউজ। বাদল আজই প্রথম লক্ষ্য করলো, নীল রঙের শাড়িতে ফর্সা মেয়েদের আরও ফর্সা দেখায়। বল্লরী সত্যিই খুব সুন্দরী, বাদল ভাবলো, এই ধরনের মেয়েদের ওপর কেউ সহজে রাগ করতে পারে না। গৌতম রায়ের মুখে বল্লরী সম্পর্কে কথাবার্তা শুনে বেশ বিরক্ত বোধ করেছিল বাদল। ভেবেছিল, বল্লরীকে সে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলবে, বল্লরীর খারাপ ভালো কোনো রকম কীর্তিকলাপ সম্পর্কেই আগ্রহ রাখবে না। কিন্তু বল্লরীকে চোখের সামনে দেখে সে কিছুতেই উদাসীন হতে পারলো না। ঐ সরল সুন্দর মুখখানা, ছেলেমানুষী দুষ্টুমিতে ভরা ঝকঝকে চোখ—ওর দিকে

তাকালে মনে হয় না পৃথিবীতে কোনো অন্যায় বা পাপ আছে।

শাড়ি পরলেও বল্লরী সেই আগের মতনই ছটফটে। বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। একবার ঝুপ করে বসে পড়লো সোফায়, আবার কথা বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল জানলার কাছে, তারপরই এসে দাঁড়ালো বাদলের গা ঘেঁষে, আবার গিয়ে সোফার হাতলের ওপর বসে পা দোলাচ্ছে। শাড়িটাও পরেছে এলোমেলো ভাবে, যেন এখনও সে ভালো করে শাড়ি পরতে শেখেনি, যখন সে চুল ঠিক করার জন্য মাথার কাছে হাত তুলেছে, তখন তার পেটের কাছে অনেকখানি দেখা যায়, মাখনের রং, আর ক্ষীণ চাঁদ নাভি।

বাদল বললো, যাই বলো, তোমাকে বাড়িতে পাবো, আশাই করিনি।

—কেন, আমি বুঝি প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলাই টই-টই করে ঘুরে বেড়াই? আমার পড়াশুনো নেই?

—পড়াশুনো এখনও করছো তা হলে?

—বাঃ, পড়াশুনো করবো না কেন?

—সিনেমার নায়িকাদের আর পড়াশুনো করার কি দরকার? তাছাড়া পড়াশুনো করার সময়ই বা পাওয়া যাবে কি করে?

বল্লরী হাসতে হাসতে বললো, নায়িকা হতে পারলে অবশ্য পড়াশুনো ছেড়ে দিতুম ঠিকই, কিন্তু এখনও চান্স পাচ্ছি না যে। সবে মাত্র একটা বইতে নায়িকার বান্ধবীর পার্ট পেয়েছি, মোটে তিনদিনের শুটিং।

—সে বইতেই সুজাতা সরকার প্রথম আত্মপ্রকাশ করবে?

—আপনি জানলেন কি করে? আপনি কি করে জানলেন আমি ঐ নামটা নিচ্ছি?

—সিনেমার খবর কি আর কিছু চাপা থাকে? সবাই তো জেনে যায়।

—না, আপনি কি করে জানলেন বলুন? দিদি বলেছে বুঝি?

—না, না, নিশ্চয়ই কোনো ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিনে পড়েছি। তোমার দিদির সঙ্গে আমার দেখা হলো কখন!

—নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে। আপনি দিদির কাছে আমার নামে নালিশ করেছেন।

—সে কি, নালিশ করবো কেন?

—তা হলে কেন বললেন, দিদির সঙ্গে দেখা হয়নি? বাদলদা, আপনি মিথ্যুক হয়েছেন আজকাল। আগে তো এরকম ছিলেন না?

—আগে তো সবাই অন্যরকম ছিল।

বল্লরী সোফার হাতলে বসে পা দোলাচ্ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে তার বাবার ছবিটার সামনে দাঁড়ালো। তারপর অপ্রত্যাশিত রূঢ়তার সঙ্গে বললো, আপনি ভাববেন না,

আমি কারুর কথা মতন চলবো। আমার জন্য কারুকে ভাবতে হবে না। আমার যা খুশী তাই করবো।

বাদল খানিকটা থতমত খেয়ে গেল। তবুও গলার স্বর গম্ভীর করে ডাকলো, বল্লরী শোনো—

বল্লরী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, কি?

—তোমার বাবা বেঁচে নেই, তাই তুমি ভাবছো, তোমাকে শাসন করার কেউ নেই। আমিও তোমাকে শাসন করতে চাই না—শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, সিনেমায় নামার উৎকট খেয়াল তোমার হলো কেন?

—আমি ওসব ক্যানো-ট্যানো নিয়ে মাথা ঘামাই না। এমনি ইচ্ছে হয়েছে তাই।

—কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারো না, তোমার মতন একটা কমবয়েসী মেয়ে আত্মসম্মান নিয়ে ওখানে টিকতে পারবে না। তোমাকে অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হবে। আমি নিজে সিনেমা লাইনের খবর কিছু তেমন জানি না, কিন্তু ওখানকারই একজন লোকের মুখে শুনেছি, তুমি সার্থক হতে পারবে কি না তার কোনোই ঠিক নেই, কিন্তু তার আগেই তোমারা সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে!

—ওখানকার কোন লোক? আমাকে চেনেন? কে?

—সেটা জরুরী ব্যাপার নয়, কথা হচ্ছে, তোমার নিজেরও তো এটা বুঝতে পারা উচিত।

—বাদলদা, হঠাৎ আপনি আমার ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলুন তো! কি ব্যাপার?

—বল্লরী, তোমার কোনো কিছু খারাপ হলে আমাদের সকলেরই খুব কষ্ট হবে। তুমি এত সুন্দর—

—সকলের কথা বাদ দিন। আপনি হঠাৎ এতদিন বাদে ফিরে এসে আমার জন্য মাথা ঘামাতে শুরু করলেন কেন? সেইটাই খুব অবাক লাগছে।

বাদল একটুক্ষণ চুপ করে থাকে গাঢ় গলায় বললো, বল্লরী, তোমার ভালোমন্দ সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো অধিকার আমার নেই?

এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে, এক ধরনের যুক্তিহীন অভিমান মেশানো নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বল্লরী বললো, না, আমার কথা নিয়ে কারুর মাথা ঘামাতে হবে না।

বাদল উঠে দাঁড়ালো, সামান্য এগিয়ে বল্লরীর বাহু ছুঁয়ে দুর্বলভাবে হেসে বললো, বল্লরী, আমার ওপর অত রেগে গেলে কেন? আমি তো তোমার—

বল্লরী এক ঝট্‌কায় বাদলের হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, ছাড়ুন! আপনি কি সোজা করে একটা কথাও বলতে পারেন না? দিনের পর দিন আপনি বড্ড বেশী ন্যাকা

হচ্ছেন, সব সময় সব কথা পাকিয়ে, ঘুরিয়ে, পেঁচিয়ে—সোজাসুজি কিছু বলতে পারেন না?

বাদল এবার চটে উঠলো। একটু চেঁচিয়ে বললো, সোজাসুজি আবার কি বলবো? যা বলার ছিল, তাই-ই বলেছি।

—মোটেই না। আপনি কি বলতে চান, আমি তা ভালো ভাবেই জানি। অনেক কথাই আপনার পেটে থাকে, মুখে আসে না। আমি সে রকম মেয়ে নই, আমি খোলাখুলি সব কথা পছন্দ করি।

—বল্লরী, তুমি ভেবো না, তুমি সবজান্তা হয়ে গেছো এই বয়সেই। আমি তোমাকে অনেকদিন ধরে চিনি, তাই তুমি যদি কোনো ভুল করতে যাও, তা হলে একটু সাবধান করে দেওয়া—

—কিন্তু, আপনি সাবধান করে দিলেই বা তা আমি শুনবো কেন? আপনি কে? আমার দিদির বয়ফ্রেণ্ড ছিলেন একসময়, তাও এখন নন্—

—বয়ফ্রেণ্ড?

—তা ছাড়া কি? বাংলা করে প্রেমিকও বলা যায়—কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

—কিন্তু একদিন তোমার সঙ্গেও আমার অন্য সম্পর্ক ছিল—

—ওসব একদিন ফ্যাকদিনের কথা বাদ দিন্! ওসব আপনিও মনে রাখেননি, আমিও মনে রাখিনি।

বাদল সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে জোরে ঠেসে নিভিয়ে বললো, তুমি যদি মনে করে থাকো, আমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তোমাকে এ সব কথা বলতে এসেছি তা হলে খুব ভুল করছো! তুমি কি করবে না করবে, তাতে আমার সত্যিই কিছু যায় আসে না। আমি এমনি সাধারণ ভাবে মানুষ যে ভাবে সাহায্য করতে চায়, শুধু সেইটুকুই—

—আপনি বুঝি বিনোবা ভাবের শিষ্য হয়েছেন?

বাদল বল্লবীর মুখের দিকে না তাকিয়ে ঠাণ্ডা ভাবে বললো, জীবনটা যখন তোমার নিজের, তখন সেটা তুমি নষ্ট করবে না কি করবে, সেটা তুমিই ভালো বুঝবে। তোমার বাবা বেঁচে নেই, তোমার মা বিছানায় শুয়ে থাকেন, দিদির সঙ্গেও বোধহয় বনিবনা নেই, সুতরাং তোমাকে শাসন করবার কিংবা পরামর্শ দেবার কেউ নেই—তুমি নিজেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবু, তোমার যদি সত্যিই কখনো খারাপ কিছু হয়, আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখ বোধ করবো।

বল্লরী লঘু কৌতুকের সুরে বললো, সমবেদনার জন্য ধন্যবাদ।

—চলি, বল্লরী, আর তোমাকে কখনো উপদেশ দিতে আসবো না।

—সেকি, দিদির সঙ্গে দেখা করে যাবেন না? দিদির সঙ্গেই তো দেখা করতে এসেছিলেন।

—আজ না হয়, অন্য একদিন দেখা হবে। আজ আর বসবো না।

—দিদিকে কিছু বলতে হবে?

—না, দেখা হলে যা বলার আমিই বলবো।

বাইরে বেরিয়ে এসে রাগে বাদলের শরীর ঝাঁঝাঁ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ আগেই সে ভেবেছিল, বল্লরীর মতন মেয়ের উপরে কিছুতেই রাগ করা যায় না। অথচ এখন বল্লরীর প্রতিটি কথা জলবিছুটির মতন জ্বালা ধরিয়েছে। কতই বা ছোট হবে তার থেকে, সাত আট বছর, কিন্তু তবু মনে হয় যেন বল্লরীরা অন্য জেনারেশন, ওদের ব্যবহার বাদল বুঝতে পারে না। মানুষের মনে আঘাত দিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে কথা বলতে ওদের একটুও বাধে না। বল্লরী বাদলকে ইচ্ছে করে খেলাচ্ছলে অপমান করছিল। পৃথিবীর সব কিছুই যেন ওদের কাছে হালকা ব্যাপার, হেসে উড়িয়ে দেবার মতন।

বল্লরী ভেবেছিল, বাদল তাকে অন্য কোনো কথা বলতে এসেছে, সেটা গোপন করে আছে। কি সেই কথা? কি ভেবেছিল বল্লরী? হাসি ঠাট্টা করতে করতে হঠাৎ ও রেগে উঠলো। বাদল একবার যেন সেটা বুঝতে পারলো, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। না, না, ভুল, তা হতে পারে না।

বিবেকানন্দ রোড ধরে হেঁটে যাচ্ছিল বাদল, একটা চলন্ত গাড়িতে সে যেন মল্লিকাকে দেখতে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলো, সাদা রঙের গাড়িটা থামলো মল্লিকাদের বাড়ির সামনে, মল্লিকা নামলো সেটা থেকে। আর একটি ছেলেও আছে সঙ্গে। বাদল একবার ভাবলো ফিরে গিয়ে মল্লিকার সঙ্গে আজই দেখা করে। তবুও একটু দ্বিধা করলো। একবার ওদিকে চলতে শুরু করেও থমকে দাঁড়ালো। যাক্, আজ আর নয়, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। মল্লিকা নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে, এখন বিশ্রাম করা দরকার। বাদল একটা ভুল রাস্তা ধরে অনেকক্ষণ হাঁটতে লাগলো।

॥ আট ॥

—জীবন সম্পর্কে এতদিন আমার কোনো অভিজ্ঞতাই হয়নি। আমি যেন এতদিন ঘুমিয়েছিলাম, ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখলাম, এই পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর, বড় ভয়ংকর। এখন আমি কি করবো বলো তো?

—মল্লিকা, তবুও ঘুম ভেঙে জেগে ওঠাই তো ভালো। এ পৃথিবীটা যে রকম

তাকে ঠিক সেই রকম ভাবেই চিনে নিয়ে, তারপর যতটা সম্ভব সৎ ভাবে বেঁচে থাকা যায়—

—কিন্তু আমি পারছি না। প্রতি মুহূর্তে আমার গা ঘিন ঘিন করছে, আমি যেন একটা নোংরা নর্দমার মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেছি পা পিছলে, হাজারবার স্নান করলেও আমার গা থেকে সেই দুর্গন্ধ যাচ্ছে না।

—ওটা তো নেহাত মনের বিকার। মনটাকে যদি শান্ত করতে পারো—

—কি করে শান্ত করবো?

—আমার ওপর সে ভার ছেড়ে দেবে?

—বাদল, তুমি সত্যিই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?

বাদল উত্তর না দিয়ে স্মিত হয়ে চেয়ে রইলো আউটরাম ঘাটের জেটি থেকে খানিকটা দূরে, একটু নির্জনে একেবারে রেলিং-এর ধার ঘেঁষে বসেছে ওরা। সেই রূপনারায়ণের পারের দিনগুলোর পর এতদিন বাদে আবার মল্লিকার মুখোমুখি বসেছে বাদল, আর এক নদীর পারে।

কিন্তু এ নদী অন্য রকম। বর্ষার রূপনারায়ণের সেই তেজ, কলকাতায় শীতের গঙ্গায় একটুও নেই। কেমন যেন মন্থর, ক্লান্ত, বিষণ্ণ এই নদী। কিছুদিন আগেই তো কাশীতে এই গঙ্গাকে দেখে এসেছে বাদল। সেখানে এই নদীর চেহারা অন্যরকম, সেখানে জলে অনেক স্বাদ, নদী অনেক প্রাণময়ী। হরিদ্বার লছমনঝোলায় ডুবন্ত পাথরে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠছে তীব্র স্রোত, টলটলে কাকচক্ষু জল, এত ঠাণ্ডা যেন ছুরির মতন ধারালো। সেই একই নদী কত বদলে গেছে এতদূর এসে। বাদলের হঠাৎ ইচ্ছে হলো, মল্লিকাকে নিয়ে সে একবার লছমনঝোলায় যাবে, সেখানে এই বিষণ্ণ নদীর বদলে এক দুরন্ত বন্য তেজস্বিনী নদীকে দেখে হয়তো আবার মল্লিকার জীবনটা বদলে যেতে পারে।

মল্লিকা বাদলের কাছে ক্ষমা করার কথা বলতেই বাদল একটু হাসলো। আগে যখন বাদল শুধু নিজের অপরাধের বেলায় বিমর্ষ ছিল, যখন মল্লিকা ছিল সকালের শিশির ধোয়া ফুলের মতন পবিত্র, তখনও বাদলের মাঝে মাঝে মনে হতো, পুরুষ মানুষের ক্ষমা চাওয়া মানায় না। মল্লিকারই উচিত তার কাছে ক্ষমা চাওয়া। কি জন্য মল্লিকা ক্ষমা চাইবে তা সে জানত না—কিন্তু তবু সে প্রবলভাবে আশা করতো, মল্লিকা তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইবে—নইলে তার পৌরুষ তৃপ্ত হবে না। তারপর অপেক্ষা করতে করতে সহ্যের শেষ সীমায় এসে বাদল যখন নিজেই মল্লিকার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল, সেই সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমিকায় মল্লিকা এসে তাকে বলছে, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?

বল্লরীর সঙ্গে বাদলের সেই ঘটনা দেখে ফেলার পর মল্লিকা আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, কারণ আঘাত পেয়ে মল্লিকার মুখখানা সেদিন যে রকম বিবর্ণ এবং ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, আজ মল্লিকাকে তার চেয়ে বেশী ক্লান্ত মনে হয়।

বাদল আলতো ভাবে মল্লিকার হাত ছুঁয়ে বললো, তুমি আজও বুঝতে পারোনি, আমরা দুজনে যতদূরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, যতই ভুল করি, কিন্তু আমাদের নিয়তি একসঙ্গে বাঁধা? আমাদের কেউ কারুকে ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না।

মল্লিকার চোখে দু' ফোঁটা জল টলটল করে উঠলো। বাদল রুমাল বার করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে খুব নিচু গলায় বললো, জানো, একবার একটা মনস্তত্ত্বের বইতে পড়েছিলাম, মানুষ কি তার নিজের জীবনের কোনো দুঃখের কথা, কিংবা ভুল করা অপরাধের কথা যদি বারবার মুখে উচ্চারণ করে, বারবার বর্ণনা করে, তাহলে, সে দুঃখ কিংবা অপরাধের বোঝা অনেক হালকা হয়ে যায়। তুমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা মনে মনে অনেকবার বলছো, আমাকে আর একবার বলবে?

—না, সে কথা বলে আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না।

—মল্লিকা, আজ আমারা দুঃখ পাবার দিন নয়, আজ আমার দারুণ আনন্দের দিন।

—কেন?

—সে কথা পরে বলবো। তুমি বলো, ভাস্কর কি তোমাকে কখনো অন্যায়ভাবে জোর করেছিল?

মল্লিকা দারুণ চমকে উঠে বললো, ভাস্করবাবু? না, না, এর মধ্যে ভাস্করবাবুর কথা আসছে কি করে?

বাদলও অবাক হয়ে গেল। সে তো ঐ রকমই ভেবেছিল। হাসপাতালে ভাস্করের বেডের পাশেই মল্লিকার সঙ্গে তার আবার দেখা। খাটের পাশে একটিই বসার চেয়ার, সেখানে বসেছিলেন ভাস্করের বাবা। ভাস্করের বাবা চোখে একদম দেখতে পান না, তবু তিনি ছেলেকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁর ঘোলাটে চোখ দুটো মেলে চুপ করে বসেছিলেন, একটা কথাও বলেননি।

একটা চোখ ঢেকে মাথা জোড়া বিরাট ব্যান্ডেজ বাঁধা ভাস্করের, কিন্তু তবুও নিস্তেজ হয়ে পড়েনি, বালিশে ভর দিয়ে বসে অনেক কথা বলছিল। মল্লিকা বসেছিল ভাস্করের শিয়রের কাছে, খাটের চার পাশে অনেক লোক, ভাস্করের পার্টির এবং অফিসের লোক, সবার সঙ্গেই কথা বলছিল ভাস্কর, বাদলকেও ডেকেছে কাছে, কিন্তু মল্লিকার দিকে একবার ফিরেও চায়নি। তাতেই খটকা লেগেছিল বাদলের, মল্লিকার দেখতে আসাও যেমন একটু অস্বাভাবিক তার চেয়েও অস্বাভাবিক মল্লিকাকে দেখেও ভাস্করের একটিও কথা না বলো।

একটা মিছিল নিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছিল ভাস্কর, রাজভবনের কাছে পুলিশ এক শো চুয়াল্লিশ ধারার এলাকা বলে ওদের আটকে দেয়। কিন্তু ওরা মানেনি, ওরা আইন অমান্য করে ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিল। তারপর যথারীতি টিয়ার গ্যাস এবং লাঠি চার্জ হয়। সাঁইত্রিশজন আহতের মধ্যে ছ'জনের অবস্থা বেশ গুরুতর, ভাস্কর ছিল তাদের মধ্যে একজন। খবরের কাগজের রিপোর্টে ভাস্করের নাম দেখেই বাদল গিয়েছিল হাসপাতালে।

ভাস্করের সম্পর্কে আবার ধারণা পাল্টেছিল বাদলের। বাদলের ধারণা ছিল, একদল লোক যেমন মুখে খুব বড় বড় কথা বলে, রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে, দু' একটা মিছিল টিছিলেও যায়—কিন্তু তাদের মন থাকে আত্মোন্নতির দিকে, সত্যিকারের কাজ কিংবা বিপদের সম্ভাবনা থেকে দূরে থাকে, ভাস্করও সেই দলেরই একজন। কিন্তু তার ভুল ভাঙলো। সবাই ভাস্করের সাহস ও দৃঢ়তার প্রশংসা করছিল। বাদল বুঝতে পেরেছিল, ভাস্করের চরিত্রে দু' একটা দোষ থাকলেও তার রাজনৈতিক নিষ্ঠা সত্যিই খাঁটি। ভাস্করের প্রতি শ্রদ্ধা হয়েছিল তার।

কিন্তু মল্লিকার সঙ্গে ভাস্করকে একটাও কথা না বলতে দেখে সে ভেবেছিল, নিশ্চয়ই মল্লিকার প্রতি কোনো কারণে তীব্র অভিমান জমা হয়েছে ভাস্করের। মল্লিকার প্রতি ওর যে দুর্বলতা জন্মেছিল তা তো ওর স্ত্রীই বলেছে।

সেই আগের বারের মতনই, হাসপাতাল থেকেও মল্লিকার সঙ্গে একসঙ্গে বেরিয়েছিল বাদল। এবার মল্লিকাকে দেখেই সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল, আজ আর সে মল্লিকাকে ট্রাম বাসের ভিড়ে হারিয়ে যেতে দেবে না। আজ সে মল্লিকাকে অনুরোধ করে নিয়ে যাবে কোনো নির্জন জায়গায়। সেখানে সে বুক খালি করে সব কথা বলে মল্লিকার কাছে ক্ষমা চাইবে। এরকমভাবে আর সে পারছে না। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

পি. জি. হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেটের বাইরে আসা পর্যন্ত দুজনেই নিঃশব্দ ছিল। তারপর, বাদল মৃদুস্বরে মল্লিকাকে বলেছিল, মল্লিকা, তুমি আমার সঙ্গে কোথাও গিয়ে একটু বসবে? তোমাকে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই, না বলে আমার আর উপায় নেই, তুমি আজ আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

সেই সামান্য কথাতেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে মল্লিকা কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, বাদল, তুমি আমাকে আর কি বলবে? আমাকে আর বলার কিছু নেই। আমি তোমার যোগ্য নই। আমি নষ্ট হয়ে গেছি। আমি শেষ হয়ে গেছি। আমার আর কিছুই নেই—হাসপাতালের সামনে কারুকে কাঁদতে দেখলে লোকে অবাক হয় না। বাদল অবাক হয়নি। একটা ট্যাক্সি ডেকে মল্লিকাকে নিয়ে এসেছে এই আউটরাম

ঘাটে।

মল্লিকা বললো, না, না, ভাস্করবাবু নয়! উনি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করে পাগলের মতন কি সব বলতেন, কিন্তু তাতে আমি বিচলিত হইনি। এরকম মানুষ আমি আগেও দেখেছি, ওসব এক ধরনের খামখেয়ালীপনা—কিন্তু, আমার পাপ আমারই সম্পূর্ণ নিজস্ব।

—মল্লিকা, পাপ কথাটা অত সহজে উচ্চারণ কোরো না! মানুষের ছোটখাটো দোষ মাত্রই পাপ নয়।

—কিন্তু যে-কাজে মানুষ মুক্তি হারিয়ে ফেলে, তাকে পাপ ছাড়া আর কি বলবো। আমাদেরই কলেজের একটা ছেলে, অভিজিৎ তার নাম—

অভিজিৎ নামটা ভাস্করের স্ত্রী মণিকার মুখে শুনেছিল, বাদলের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো। একথাও বাদলের একবার মনে হলো, মল্লিকা তাকে কোনো পাপের কাহিনী শোনাতে পারবে না, মল্লিকার পক্ষে কোনো পাপ করা সম্ভবই নয়।

বাদল বললো, সে তো তোমার ছাত্র। ছাত্ররা আজকাল অনেক রকম অসভ্যতা করেই।

—কিন্তু দোষ ওর যতখানি তার চেয়ে আমার অনেক বেশী। আমি নিজে যে কি করছি, আমি নিজেই তা বুঝতে পারিনি। অভিজিৎ সেদিন আমাকে ডায়মণ্ড হারবারে নিয়ে যেতে চাইলো জোর করে, সেদিন কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম। আমার মনে কোনো জড়তা ছিল না।

—গোড়া থেকে বলো।

—আর কি গোড়া থেকে বলবো?

—অভিজিৎ তোমাকে ডায়মণ্ড হারবারে নিয়ে যাবার কথা বলতে সাহস পেল কি করে? একা ও গিয়েছিল তোমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ। সাহসের প্রশ্ন নয়, এটা একেবারে পাগলামি। অভিজিৎ বড় লোকের দুরন্ত ছেলে, ক্লাসে বসে নানারকম ফাজলামি করে, লেখাপড়ায় যেমন মন নেই, মেয়েদের খুব জ্বালাতন করে—এরকম অনেক ছেলেই থাকে, এ পর্যন্ত চিনতে কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু একটা আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল, ও আমাকে খুব ভয় করতো, আমি কিছু বললেই চুপ করে মাথা নিচু করে থাকতো। এটা খুব অদ্ভুত, না? আমাকে যে ক্লাসের সব ছাত্র-ছাত্রীরাই খুব মানে তা নয়, এখানকার ছেলেমেয়েরা অন্যরকম, পারমিশন না নিয়ে যখন তখন ওরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে যায়, যখন তখন ঢোকে। কিছুদিন ধরে শুনেছিলুম, ছেলেরা মাঝে মাঝে ধলেশ্বরী বলে চেঁচায়, প্রথমে মানে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝতে পারলুম—ওরা আমাকেই ঠাট্টা করে ঐ নামে ডাকে,

আমার রংটা একটু ফর্সা বলে—আমাদের ডিপার্টমেন্টে আর একজন মেয়ে লেকচারার আছে—তার নাম যমুনা সান্যাল, তার গায়ের রঙটা একটু কালো তাই—

—কত বয়স অভিজিতের?

—কত আর, বল্লরীর বয়েসীই হবে, একুশ বাইশ। দেখতে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারা, ক্রিকেট খেলে, নিজের গাড়ি নিয়ে আসে কলেজে—একদিন বললো আমাকে ঠিক ওর দিদির মতন দেখতে।

—দিদি? আজকালকার ছেলেরা তো কোনো মহিলাকে একথা বলে না!

—আমাকেও অনেকে সে কথা বলেছিল। আমার ডিপার্টমেন্টের দু'একজন কলিগ বলেছিল, মিস সরকার, আপনি শেষকালে ছাত্রদের দিদি হয়ে গেলেন। দিদি শুনলেই কি রকম করপোরেশন ইস্কুলের দিদিমণি দিদিমণি মনে হয়। আমার কিন্তু খারাপ লাগেনি, ছেলেদের মুখে দিদি ডাক শুনতে আমার খারাপ লাগে না!

—প্রেসিডেন্সি কলেজেও অনেক নীচের ইয়ারের ছেলে তোমায় মল্লিকাদি বলে ডাকতো।

—হ্যাঁ, তোমার মনে আছে? কিন্তু অভিজিৎ যখন বলেছিল আমাকে ঠিক ওর দিদির মতন দেখতে, আমি ঠিক বিশ্বাস করিনি। ছেলেটার মুখে কি রকম যেন একটা হাল্‌কা ভাব আছে। তারপর একদিন ও আমাকে জোর করে ওর বাড়িতে নিয়ে গেল।

—তুমি বুঝি ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িতে খুব যাও?

—যেতাম অন্তত। আমি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইনি। ক্লাসে ঢুকে শুকনো লেকচার দিয়ে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে আসতে আমার ভালো লাগে না। আমি ওদের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশতে চেয়েছিলাম। আমার ঘরে ডেকে এনে ওদের অনেককে চা খাইয়েছি, ওদের সঙ্গে গেছি কফি হাউসে আড্ডা দিতে। অভিজিৎ জোর করে আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, গিয়ে আমি প্রায় স্তম্ভিত।

—সত্যিই দেখলে তোমার মতন একজন দিদি আছে অভিজিতের।

—ছিল, এখন আর নেই। ফার্ন রোডে ওদের বাড়ি, দেওয়ালে ওর দিদির ছবি টাঙানো, আমার মনে হয়েছিল আমি যেন প্রায় আয়নায় আমার মুখ দেখছি। অভিজিতের মা-ও আমাকে দেখে প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য অভিজিতের দিদি মারা গেছেন সাত বছর আগে, বেঁচে থাকলে বয়েস আমার চেয়ে অনেক বেশী হতো, কিন্তু তার ছবির যা চেহারা। ঠিক এখনকার আমারই মতন। শিরদাঁড়ায় টি-বি হয়ে মারা গেছেন উনি—অনেক চিকিৎসা হয়েছিল। অভিজিতের বাড়িতে আমাকে নিয়ে একটা ধুম পড়ে গেল, সবাই এসে এসে দেখে যেতে লাগলো আমাকে—অভিজিৎকেও দেখলাম বাড়িতে একেবারে অন্য রকম। ইউনিভার্সিটিতে ওরকম দুর্দান্ত ধরনের, অথচ

বাড়িতে কী শান্ত আর লাজুক·····। এর পর থেকে অভিজিৎ ইউনিভার্সিটিতে ছুটির পর রোজ আমার সঙ্গে ফিরতে চাইতো—কথাবার্তা শুনে বুঝেছি, ওর দিদিকে ও খুব ভালোবাসতো। আমাকে প্রায়ই অনুরোধ করতো ওদের বাড়িতে যেতে। আমি অবশ্য আর একদিন মাত্র গেছি। আমার অস্বস্তি লাগতো খানিকটা। ডিপার্টমেন্টের দু-একজন এই নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করেছে। আমি গায়ে মাখিনি—একটা ছেলে যদি তার মৃত দিদিকে আমার মধ্যে ফিরে পায় আমি তাকে ফিরিয়ে দেবো কি করে? দু-একজন বিশ্বাস করেনি—কিন্তু আমি তো জানি এটা নিদারুণ সত্য! ইউনিভার্সিটিতে আমার নামে কথা ওঠে—আমাকে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে এখন খুব গোলমাল, চলছে, জানো তো।

—জানি।

—তুমি কি করে জানলে?

—আমাকে মণিকা বলেছে।

—মনিকা? ও আচ্ছা, কি বলেছে তোমায় মণিকা?

—সে কথা এখন থাক্। তুমি বাকিটা বলো।

—আমার ওপর সবচেয়ে বেশী রেগেছিল আমার ছাত্রীরা।

মণিকাও আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে না। কারণ অভিজিতের মতন একটা ছেলে—সে আর অন্য ছাত্রীদের প্রতি মনোযোগী কিন্তু দেয় না, শুধু একজন অধ্যাপিকার সঙ্গে সময় কাটায় এটা অন্য মেয়েদের পছন্দ হতো না। কিন্তু আমি ওসব কিছু ভাবিনি, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত জানি কোনো কিছু খারাপ ব্যাপার হচ্ছে না—ততক্ষর কে কি ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবো কেন?

—আমিও তো এর মধ্যে খারাপ কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—কিন্তু অভিজিতের ব্যবহার শেষ পর্যন্ত প্রায় পাগলামিতে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজের দিদিকে নিয়েও আজকাল কেউ এরকম বাড়াবাড়ি করে না। ছুটি হবার পর প্রত্যেকদিন আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে গাড়ি নিয়ে, ছুটির দিনেও আসবে আমার বাড়িতে—আর সর্বক্ষণ কি কথা বলতো জানো, ওর দিদি পড়াশুনোয় কেমন ভালো ছিল, কি রকম ভাবে হাসতো, কি রকম ভাবে কথা বলতো এইসব, আর তার সঙ্গে আমার কতটা মিল—এ একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা, আমারও বেশ ভালো লাগতো। মাঝে মাঝে অভিজিৎ আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেত কাছাকাছি কোথাও—ওর বয়েসী ছেলের এখন বান্ধবীকে নিয়ে ঘোরার কথা—তা ছাড়া ও লক্ষ্য করছিল, আমারও কোনো বন্ধু নেই—

হঠাৎ কথা বলা থামিয়ে মল্লিকা এক দৃষ্টিতে তাকালো বাদলের দিকে। বাদলও

স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলো, একবারও চোখের পলক ফেললো না, সেই অবস্থায় ধীরস্বরে বললো, তুমি কি বিশ্বাস করতে, তোমার কোনো বন্ধু নেই?

মল্লিকা হাহাকার করে উঠলো। শুকনো কান্নায় বললো, না, না, বিশ্বাস করিনি, আমি জানতাম আমার একজন বন্ধু আছে, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম; মাঝখানে ভুলে গিয়েছিলাম। বাদল, আমার এ রকম ভুল হলো কেন?

—সবারই ভুল হয়। মল্লিকা, ও নিয়ে বেশী ভেবো না। তারপর কি হলো বলো।

—মানুষের চরিত্র যে কতরকমের হয়, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমি কিছু জানতাম না আগে। কখনো কোনো বইতেও তো এ রকম ঘটনা পড়িনি। পরে এ সব কথা আমি যমুনাকে বলেছিলাম। যমুনা বলেছিল, তুইও যেমন বোকা মেয়ে, দ্যাখ গে, অভিজিৎ নিশ্চয়ই তার বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে তোর সঙ্গে ভাব জমাতে চেয়েছে। আমি চেঁচিয়ে না না বলে উঠেছি। আমি জানি তা সত্যি হতে পারে না। আমি যে অভিজিৎদের বাড়িতে গেছি, দেখেছি ওর দিদির ছবি, ওর মায়ের ব্যবহার! অভিজিৎ ও মাসের পর মাস আমার সঙ্গে যে রকম ভাবে মিশেছে—

—ডায়মণ্ড হারবারে কি হলো?

—হ্যাঁ, ডায়মণ্ড হারবারে, দুবার গিয়েছিলাম, সেখানে আমি·····বাদল আমার ভয় করছে, আমার ভীষণ ভয় করছে—

—ভয় কি, আমি তো রয়েছি তোমার সামনে।

—তুমি রয়েছো বলেই তো ভয়— এতদিন আমি নিজের মনের কাছে নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তার মধ্যে অনেক মিথ্যে মেশানো ছিল—কিন্তু তোমার সামনে আমি মিথ্যে বলতে পারবো না। সেই কঠিন সত্যি কথাতেই যে আমার ভয়—

—ভয় নেই, আমি বলছি ভয় নেই। মল্লিকা তোমার থেকে এই পৃথিবীকে তো আমি বেশী দেখছি, আমি অনেক বেশী চিনি। আমি তোমার মতন অত সহজে আঘাত পাবো না।

—অভিজিৎ বলতো ওর দিদির খুব ঘুরে বেড়ানোর শখ ছিল, কতদিন বাড়ির ড্রাইভারকে নিয়ে ও আর দিদি বেড়াতে যেত কত জায়গায়—মৃত্যুর আগে শেষ চারদিন ওর দিদি বিছানায় শুয়ে ছিল, উঠে দাঁড়াতেও পারতো না, শিরদাঁড়ায় জোর ছিল না— তাই অভিজিৎ আমাকেও ডায়মণ্ড হারবার নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

—ওখানে গিয়ে ওর রূপ বদলে গেল? বেরিয়ে এলো আপন রূপ?

—না, না, অত সরল নয় ব্যাপারটা, মানুষের চরিত্র আরও বিচিত্র। এক দিনেই ও মানব থেকে দানব হয়ে যায়নি। কিংবা কোনোদিনই ও মানব থেকে দানব হয়ে

যায়নি। কিংবা কোনোদিনই দানব হয়নি। গাড়িতে আমি অভিজিতের পাশে বসেছিলাম। মাঝে মাঝে স্টিয়ারিং-এ এক হাত রেখে এক হাতে ও আমার চুল নিয়ে খেলা করেছে, আমি কিছু মনে করেনি, তারপর ও আমার কাঁধে হাত রাখে—তখন, আমার সামান্য একটু অস্বস্তি লেগেছিল শুধু—কিন্তু ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক কিনা আমি বুঝতে পারিনি—আমার তো কোনো ভাই নেই—সেটাই অভিজিৎ সম্পর্কে আমার প্রধান দুর্বলতা! অভিজিৎ তখনও ওর দিদির কথা বলছিল—বলতে বলতেই, অভিজিৎ আমার গালে ওর গাল ছোঁয়ালো, আমার খুবই অস্বস্তি লাগলো তখন, আমি বললাম, একি, একি করছো? অভিজিৎ বললো, আপনার গালটা কি ঠাণ্ডা মল্লিকাদি, খুব ঠাণ্ডা। আমি বললাম, ছি অভিজিৎ!—ওর হাত সরিয়ে সরে বসলাম।

অভিজিৎ অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। যেন আমিই কোনো একটা বিসদৃশ কাজ করে ফেলেছি। শিশুর মতন ওর চোখ। ও জিজ্ঞেস করলো, কি? ছিঃ বললেন কেন? আমি উত্তর দিলাম, কিছু নয়, ভালো করে গাড়ি চালাও। তারপর সারা রাস্তায় অভিজিৎ আর একবারও কিছু করেনি। তুমিই বলো, এতে তুমি কি ভাববে? এর পর আমার নিজেকেই অপরাধী মনে হবে না? হয়তো ওর মনে কোনো পাপ ছিল না। ডায়মণ্ড হারবার পৌঁছে অনেকক্ষণ একসঙ্গে ঘুরলাম, নুতন সরকার রেস্ট হাউসে চা খেলাম নিরালায় বসে—আর একবারের জন্যও অভিজিৎ আমাকে ছোঁবারও চেষ্টা করেনি। আমার তখন মনে হয়েছিল, আমারই মনটা বিশ্রী, আমি একটা সাধারণ ব্যাপারকে— । ফেরার পথে আমি আবার বসেছি অভিজিতের পাশে—গত চার মাসে অভিজিৎ একবারও আমার সঙ্গে দিদির মতন ছাড়া অন্য কোনো রকম ব্যবহার করেনি, এখনও তাই। শুধু ওর হাতটা আবার আমার কাঁধে রাখলো—যেন ওর অজান্তেই হাতটা উঠে এসেছে, আমি এবার কিছু বলিনি, ক্রমশ ও গালে গাল ছোঁয়ালো। আমাকে দৃঢ়ভাবে ধরে আছে এক হাতে—অন্ধকার রাস্তা, গাড়ির স্পীড চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল, তারপর অভিজিৎ আমার ঠোঁটে ঠোঁটে ছোঁয়াতেই আমি স্প্রীং-এর মতন ছিট্‌কে সরে এলাম।

বাদল মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিল। এবার মুখ নিচু করলো, মাটির দিকে তাকিয়েও সে ছবিটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, অন্ধকার রাস্তার গাড়ি ছুটছে, তার মধ্যে, মল্লিকার ঠোঁটের কাছে আর একটি— । বাদল এক মুঠো ঘাস টেনে ছিঁড়ে ফেলে, একটা বড় নিশ্বাস খুব নিঃশব্দে ছাড়লো।

মল্লিকা আচ্ছন্নের মতন বলে যাচ্ছে। এবার অভিজিৎ প্রথমটা সেই রকম অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই বললো, একি, ও আমি কি করলাম!—আমার তখন আর কোনো জ্ঞান নেই, শুধু রাগে শরীর জ্বলছে, ওরকম রাগ আমার জীবনে

কখনো হয়নি।

আমি বললাম, অভিজিৎ, তুমি এই রকম, আমকে এক্ষুনি নামিয়ে দাও, আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। বেশী রাগে আমার চোখ দিয়ে জল এসে যায়—আমি আর থাকতে পারিনি।

অভিজিৎ ও লজ্জায় অনুশোচনায় নুয়ে পড়লো। ওর কথা শুনলে মনে হয়, ও যেন ঘুমের মধ্যে এরকম একটা কাজ করে ফেলেছে। ও হাত জোড় করে, আমার পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইলো বারবার। তখন আমার একবার মনে হয়েছিল, ছেলেটা হয়তো সত্যিই পাগল, এমনিতে বেশ ভালো থাকে—হঠাৎ এক এক সময় পাগলামি বেরিয়ে পড়ে। সারা রাস্তা শুধু ক্ষমা চাইতে চাইতে এলো, আমার বাড়িতে নামিয়ে দেবার সময় বললো, আমি যদি ওকে ক্ষমা না করি, ও আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

তারপর আট ন'দিন ও আর ক্লাসে আসেনি। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ওর জ্বর হয়ে গেছে। পরে যেদিন ক্লাসে এলো সেদিন ওর শুকনো মুখ, সারাক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, কারুর সঙ্গে একটি কথাও বললো না। যেন দারুণ অনুতাপে জ্বলে যাচ্ছে। বলো বদমাইশ বকাটে ছেলেরা কি এমন হয়? আমার ক্লাসে ছেলের চেয়ে মেয়ে বেশী, কত সুন্দর তারা। সে রকম কোনো মতলবই যদি ওর থাকতো, অন্য কোনো মেয়ের সম্পর্কে ও তো উৎসাহী হতে পারতো। দু'তিনদিন ও ঐ রকম রইলো। প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে একটা কথা বললাম, আনন্দে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ওর মুখ চোখ। আমি ওকে ক্ষমা না করে পারিনি।

বাদল মাটির দিকে চেয়েই বললো, তুমি ঠিকই করেছো।

মল্লিকা বললো, অভিজিৎকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবে কে? কেউ না! আজ তোমাকে আমি সত্যি কথা বলছি, আমিই যেন তখন অভিজিৎকে ক্ষমা করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। অভিজিতের সঙ্গে রোজ দেখা হওয়াটা আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি, কয়েকদিন পর অভিজিতের সঙ্গে সম্পর্কটা যখন স্বাভাবিক হয়ে এলো, অভিজিৎ যখন আবার আমাকে ডায়মণ্ড হারবার নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলো, সেদিন আমি তক্ষুনি রাজী হয়ে গিয়েছিলাম। সেবারও ঘুমের ঘোরে মানুষ যেমন পাশের লোককে জড়িয়ে ধরে, সেইরকম ভাবে অভিজিৎ আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল, আমি আপত্তি করিনি, গভর্ণমেন্ট রেস্ট হাউসে সেদিন—

বাদল চিৎকার করে উঠলো, কি? সেদিন কি?

আকাশ বাতাস জল স্থল অন্তরীক্ষ কাঁপিয়ে গম গম করে উঠলো বাদলের চিৎকার! অথবা বাদল হয়তো অত জোরে বলেনি, তার সাধারণ কণ্ঠস্বরই তার কানে অত

তীব্র শোনালো। বাদল আবার জিজ্ঞেস করলো, কি, সেদিন কি?

—অভিজিৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে মুখখানা চেপে ধরে—বাদল সেই মুহূর্তে আমি তোমাকেও ভুলে গিয়েছিলাম—যারা পাপ করে, এখন বুঝতে পারি, কি করে তারা ঈশ্বরকেও ভুলে যায়। আমার সারা শরীর তখন জ্বরের মতন আচ্ছন্ন, বুকের ভেতরটা তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে, অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল আমার, তবু আমি অভিজিৎকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারিনি, বরং আমার একটা হাত ওর পিঠে রেখেছিলাম—ও কিন্তু আমাকে একটাও খারাপ কথা বলেনি, শুধু বলেছিল, মল্লিকাদি, মল্লিকাদি, আমি কি অন্যায় করছি? কিন্তু আমি যে আর পারছি না। তারপর ও যখন আমার ব্লাউজের বোতামে হাত দেয়—

—মল্লিকা, আর থাক্, আর দরকার নেই।

—না, আমাকে বলতেই হবে—ও আমার তিনটে বোতাম খুলেছিল। বাইরে তখন দারুণ বৃষ্টি। আমিও সেই রকম ভাবেই কেঁদে উঠেছিলাম, আমি বলেছিলাম, অভিজিৎ, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।

অভিজিৎ তক্ষুনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আবার সেই রকম আগের বারের মতন ক্ষমা চাইতে থাকে। তখন ওর ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে কৃত্রিমতা কিংবা ভান ছিল না। ও ঠিক স্বাভাবিক ধরনের ছেলে নয়। অভিজিৎকে আমি ক্ষমা করেছি, কিন্তু নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি। তারপর থেকেই আমার নিজেকে সব সময় মনে হয় অশুচি। আমি সারা গায়ে নোংরা মেখে আছি—আমি ওকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম, আমি নিজেই চেয়েছিলাম।

বাদল তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মল্লিকা, চলো, আর একটাও কথা নয়। এখন সওয়া দশটা বাজে—এর পর কি করে বাড়ি ফিরবে?

মল্লিকা উঠলো না, বললো, বাজুক গে। আমার আর বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না।

—না, উঠে পড়ো। এখানে আর নয়। এসো, ধরো আমার হাত-ধরো।

মল্লিকা বাদলের বাড়ানো হাতটা আলতো করে ছুঁতেই বাদল সেটা চেপে ধরলো। টেনে তুললো মল্লিকাকে মাটি থেকে। বাদলের সমস্ত শরীরটা যেন হালকা তুলোর মতন—মল্লিকার কাহিনী শুনে তার রাগ হয়নি, অভিমান হয়নি, দুঃখ হয়নি। এ সব কিছু ছাড়িয়ে সে যেন কোথায় চলে গেছে।

কয়েক পা নিঃশব্দে হেঁটে বাদল আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। মল্লিকার হাতে চাপ দিয়ে খুব আবেগময় গলায় বললো, মল্লিকা, তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে তো?

মল্লিকা বিস্মিত ভাবে বললো, আমি? তুমি আমাকে—

—মল্লিকা, এসো, আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আমরা কেউই আর পুরনো কথা মনে রাখবো না। মুখ একবারও উচ্চারণ করবো না। মল্লিকা, তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তুমি আমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে?

—না।

—তাহলে এইটাই শেষ কথা। এসো।

আরও কয়েক গা এগিয়ে বাদল আবার বললো, মনে আছে, যীশুখ্রীষ্ট এক জায়গায় বলেছেন, দি ফ্লেস ইজ উইক। কথাটা আজও সত্যি। মানুষের শরীর বড় দুর্বল। মানুষের মাথা থেকে জন্ম হয়েছে এই যে সভ্যতার, এতসব নিয়ম নীতি শৃঙ্খলার—মানুষের শরীরই এক এক সময় এ সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তুমি এই শরীরের রহস্য একদিন জানতে না। এখন জেনেছো, আর তোমার ভুল হবে না।

আবার দু'চার পা গিয়ে বাদল জিজ্ঞেস করলো, বল্লরী এ কথা জানে?

মল্লিকা ক্লান্তভাবে বললো, হয়তো জানে, হয়তো আন্দাজ করেছে। সেই জন্যই বোধ হয় খুকু এখন আর আমার কোনো কথা শুনতে চায় না। আমাকে মানে না। ইউনিভার্সিটিতেও এসব কথা আমি নিজেই বলেছি আমার গ্লানিতে। হয়তো আমার আর চাকরি থাকবে না।

না থাকুক। তোমাকে ও চাকরি আর করতে হবে না।

হাত তুলে বাদল একটা ট্যাক্সি ডাকলো। ট্যাক্সি চলতে শুরু করার একটুক্ষণ পরে বাদল বিনাদ্বিধায় মল্লিকার উরুতে একটা হাত রাখলো, আর একটা হাত ওর কোমর বেষ্টন করলো। মল্লিকা বাদলের দিকে তাকাতেই বাদল মুখ এগিয়ে নিয়ে এলো চুমু খাবার জন্যে, কি ভেবে আবার পিছিয়ে এলো, তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, মল্লিকা, তুমি এত সুন্দর, তোমাকে ছাড়া আমার কিছুতেই চলবে না।

।। নয় ।।

এই ক'দিন আগেও বাদল যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতো একা একা, তার ভ্রূ দুটো কুঁচকে থাকতো প্রায় সব সময়, চোখের নিচে একটা ভাঁজ পড়াতো—সব সময়ই কোনো একটা চিন্তা যেন আচ্ছন্ন করে রাখতো তাকে। এখন বাদলের মুখটা সহজ সমুজ্জ্বল। এখন বাদল যেন তার জীবনের একটা উদ্দেশ্য পেয়ে গেছে। একটি মেয়ের ভালোবাসা পাওয়া জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু একটি মেয়ের ভালোবাসাও না পেলে মানুষের জীবনের অন্য সব উদ্দেশ্যই বিস্বাদ হয়ে যায়।

মল্লিকা ইউনিভার্সিটি থেকে দু'মাসের ছুটি নিয়েছে। অফিস ছুটি হবার পর বাদল

এখন নিয়মিত মল্লিকাদের বাড়ি যায়। এখন আর শুধু একতলার বসবার ঘরে বসে থাকে না, সোজা উঠে যায় ওপরে, মল্লিকার রুগ্না মায়ের সঙ্গে গল্প করে, নতুন করে তার জন্যে ডাক্তার ওষুধপত্তরেরও ব্যবস্থা করে। এ বাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষ নেই, এক পিসেমশাই থাকতেন আগে তিনি ও মারা গেছেন, বাদল এখন পুরুষ অভিভাবকের ভূমিকা নিয়েছে। মল্লিকার মা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না, কথাও বলেন খুব আস্তে আস্তে, কিন্তু বাদলকে ফিরে পেয়ে তার মুখ এখন অনেক সুস্থ দেখায়। শুধু রেজিস্ট্রি বিয়ে হবে, না বাড়িতে পুরুত ডেকে উৎসব হবে সেই নিয়ে এখন আলোচনা হয়। মল্লিকার মায়ের ইচ্ছে পুরোপুরি শাস্ত্রমতে এবং বাড়িতে ম্যারাপ বেঁধে সানাই বাজিয়ে বিয়ে হোক। তাঁর বড় মেয়ের বিয়ের সময় ওসব কিছু হতে পারেনি—তাই এবার তিনি আশা মিটিয়ে নেবেন। কিন্তু সে সব ব্যবস্থা কে করবে—তাছাড়া অত হৈ চৈ তাঁর সহ্য হবে কি না—এই সব হচ্ছে সমস্যা।

বল্লরীর সঙ্গে দেখা হয় খুব কম। সন্ধ্যের দিকে বল্লরী প্রায়ই বাড়ি থাকে না, থাকলেও ওদের সঙ্গে এসে বসে না। আসা যাওয়ার পথে বাদল মাঝে মাঝে দেখতে পায় বল্লরীকে, সে সিল্কের শাড়ি পরে অতিরিক্ত সাজগোজ করে দুপ দাপ করে নামছে বা উঠছে সিঁড়ি দিয়ে। প্রথম বল্লরীকে দেখে বাদল কথা বলতে একটু ইতস্তত করেছিল, তারপর থেকে দুজনে কেউ কারুর সঙ্গেই আর কথা বলে না। বল্লরী বাদলকে দেখলে স্পষ্টই মুখ ঘুরিয়ে নেয়—তার ঠোঁটের বাঁকানো রেখায় একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে ওঠে।

বাদল আর মল্লিকা একসঙ্গে দু'তিনবার ভাস্করকে দেখতে গিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ভাস্করকে বাড়িতে এনে রাখা হয়েছে। সেরে উঠতে উঠতে সেপটিক হয়ে ভাস্কর আবার শয্যাশায়ী। ভাস্কর এখনও মল্লিকার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না, শুকনো ভাবে 'ভালো আছেন তো' বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মল্লিকা সেটা গায়ে মাখে না, খুব আন্তরিকভাবে সে ভাস্করের স্বাস্থ্যের খবর নেয় মণিকার কাছে।

সবচেয়ে বেশী অবাক হয়েছে মণিকা। সে বিমূঢ়ভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এক সময় সে নিজে চেষ্টা করেছিল ওদের দুজনের মিলন ঘটিয়ে দিতে—তখন কিছু হয়নি। আর এখন, এই দেমাকী মহিলাকে দেখে তার স্বামী মাথা ঘুরিয়েছিল — সে কথা সে নিজের মুখে বলেছে বাদলকে, তারপর ইউনিভার্সিটিতে একটা ছেলের সঙ্গে ওর কেলেঙ্কারীর কথা সবাই জানে—এই অবস্থাতেও বাদল কি করে—। মণিকা বুঝতে পারে না, কি করে ওরা এক সঙ্গে হাসি মুখে এখানে আসে, আবার হাসি মুখে চলে যায়।

পাথর ফেটে ঝর্ণা বেরিয়ে পড়েছে, আর সে কোনো বাধা মানবে না। বাদল আর মল্লিকা মাঝে মাঝে লোকাল ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে চড়ে বসে, চলে যায় চন্দননগর বা রাণাঘাট পর্যন্ত, আবার ফিরে আসে পরে ট্রেনে। জানলার কাছে মুখোমুখি বসে ওরা ওদের দু'বছরের জমে থাকা গল্প সব বুক খালি করে দেয়। পাশ দিয়ে চলে যায় বাংলাদেশের নদী জলাভূমি ধানের ক্ষেত নারকোল গাছের সারি—ওরা সেদিকে আলাদা ভাবে তাকিয়ে দেখে না—ঐসব কিছু মিলিয়ে যে রূপের বিকাশ তা ওরা সর্বাঙ্গে পেয়ে গেছে।

কখনো ওরা সিটের তলায় পরস্পরের পায়ের আঙুল ছুঁয়ে খেলা করে। কখনো কখনো কম্পার্টমেন্ট একেবারে ফাঁকা হয়ে গেলে ওরা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে—লোকাল ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের কামরা প্রায়ই এরকম ফাঁকা হয়—তখন দুই স্টেশনের মাঝখানে আট-দশটা মিনিট ওরা গোটা কামরার মধ্যে একেবারে একা, তখন বাদল চুমুতে চুমুতে মল্লিকার সর্বাঙ্গ ছেয়ে দেয়। মল্লিকা তার পঁচিশ বছরের তৃষ্ণায় ছটফট করে, তবু কৃত্রিম কোপে বাদলের হাত ছাড়িয়ে পালাতে চায়—কামরার মধ্যে ছুটোছুটি পড়ে যায় দুজনের। কখনো বাদল মল্লিকাকে ধরে ফেলে, আঁচল সরিয়ে মুখ গুঁজে দেয় ওর বুকে, ঘন ঘন নিশ্বাসে মল্লিকার স্তন দুটি ওঠে আর নামে। স্টেশন এসে গেলেই ওরা আবার শান্ত হয়ে বসে।

এক এক সময় মল্লিকা বলে, তুমি ওরকম করো না আমার ভয় করে।

বাদল জিজ্ঞেস করে, কেন, ভয় করে কেন। তোমার ভালো লাগে না?

—ভালো লাগে না? প্রচণ্ড ভালো লাগে, শরীরটাকে একেবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে নষ্ট করে দিতে ইচ্ছে হয়। সেই জন্যই তো ভয়! তোমার সে ভয় করে না?

বাদল আর কিছু উত্তর দেয় না। মুখ টিপে টিপে হাসে। একটা দমকা হাওয়া এসে মল্লিকার চুলগুলো উড়িয়ে দিলে সে গুন গুন করে সুর ধরে, 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।'

রূপনারায়ণের পারে দেউলটিতে মল্লিকাদের সেই বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাবে। বাড়িটা এমনিতেই আর কোনো কাজে লাগে না, কেউ যায়ও না, সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া মল্লিকার বাবার এক জ্যাঠতুতো ভাইয়েরও কিছু অংশ আছে এ সম্পত্তিতে, তিনি থাকেন কানপুরে—বাংলাদেশে আর ফিরবেন না, তিনি অনেকদিন থেকেই তাঁর অংশটা বিক্রি করে টাকা নিতে চাইছেন। সে টাকা দেবার ক্ষমতা মল্লিকাদের নেই। ওখানে একটা নতুন চুনের কারখানা তৈরী হচ্ছে, তারাও কিনতে চাইছে বাড়িটা তাই বিক্রি করে দেওয়াই ঠিক হয়েছে। হস্তান্তরের আগে শেষবারের মতন ও বাড়ি থেকে আর একবার ঘুরে আসবার ইচ্ছে মল্লিকার আর তার মায়ের। কিন্তু মায়ের

ওরকম অসুস্থ শরীর—যাওয়া আসার ধকল আছে, তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন বাদলকে যেতে। বাদলও সঙ্গে রাজী। সেই নদীর পারে, তার জীবনের সেই সন্ধিক্ষণের পরিবেশটি আর একবার দেখার ইচ্ছে তার ও ছিল।

ব্যবস্থা সব প্রায় ঠিক! যাবার দু'দিন আগে বল্লরী হঠাৎ জানালো, সে যেতে পারবে না। সেদিন রবিবারের সকাল দশটা, মল্লিকার মা'র ঘরে বসে কথা হচ্ছিল, বাদল এসে পৌঁছেচে একটু আগে, বল্লরী ঘরে ঢুকে বললো, মা, আমার হঠাৎ কাজ পড়ে গেছে, আমি তো যেতে পারছি না, তোমরা ঘুরে এসো।

মা বললেন, সে কি, তুই যাবি না কি? কেন যাবি না!

—আমার কাজ পড়ে গেছে।

—কি কাজ?

মায়ের কাছে কোনো কৈফিয়ত দেবার ধার ধারে না বল্লরী, ঝঙ্কার দিয়ে বললো, সে তুমি বুঝবে না। জরুরী কাজ, তা নষ্ট করে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়!

—বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তোর একবার যেতে ইচ্ছে করে না?

—না! ঐ পুরনো লঝঝড়ে বাড়ি, ওখানে আমার একটুও ভালো লাগে না।

—তুই না গেলে আমরা যাবো কি করে? তুই এখানে একা থাকবি নাকি?

—কেন, আমি কচি খুকি নাকি? একা থাকতে পারি না? বাড়িতে ঠাকুর চাকর রয়েছে, একা থাকার অসুবিধে কি?

মল্লিকা বললো, খুকু তোর কি কাজ, তুই আমাদেরও বলতে পারিস না?

একটু দ্বিধা করলো না বল্লরী। অহঙ্কারে ঘাড় সোজা করে বল্লরী বললো, বলতে পারবো না কেন? আমার শুটিং-এর ডেট পড়েছে, আমাকে থাকতে হবে।

মা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, শুটিং কি? শুটিং কি রে?

মল্লিকা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্য বলে উঠলো, ও ওদের কলেজের একটা ব্যাপার। কিন্তু খুকু না গেলে, আমাদের যাওয়া—

বল্লরী অদ্ভুত ভাবে হাসলো। মায়ের কাছে শুটিং-এর ব্যাপারটা গোপন করায় তার যে কিছু আসে যায় না সেটা বুঝিয়ে দিল। সেই রকম হাসি ঠোঁটে রেখেই বল্লরী বললো, কেন, আমি না গেলে তোমাদের অসুবিধে কি! বাদলদাই তো তোমাদের দেখাশুনো করতে পারবে।

বাদল চোখ তুলে বল্লরীর দিকে তাকাতেই আবার সে একটা অবজ্ঞার হাসি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটুক্ষণ ঘরের সবাই চুপ। তারপর মল্লিকা বললো, খুকুটা যেরকম জেদী, ও একবার না বললে কেউ ওকে রাজী করাতে পারবে না। তা হলে কি আর আমাদের

যাওয়া হবে?

মা বললেন, তোরা না যাস, আমাকে একাই ঘুরিয়ে আনুক বাদল।

পরদিন অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি পেতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। ট্যাক্সি খুঁজতে খুঁজতে বাদল চলে এলো গ্রেটইস্টার্ণ হোটেলের কাছে। ওখানে কয়েকটা ছেলে ছুটে ছুটে ট্যাক্সি ধরে আনে। বাদলের জন্য যে ট্যাক্সিটা আনলো, সেটাতে যাত্রী ছিল, তারা হোটেলেই নামবে।

তাদের নামার জন্য অপেক্ষা করছে বাদল, একজন প্রৌঢ় লোকের হাত জড়িয়ে বাদলের সামনে নেমে দাঁড়ালো বল্লরী। চোখাচোখি না হয়ে উপায় নেই, কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চেয়ে রইলো, এখন বল্লরীর দৃষ্টিতে অবহেলা নেই, যেন খানিকটা কাতর খানিকটা ভীরু ভীরু ভাব—যেন বাদল এক ধমক দিলেই সে এক্ষুনি ঐ প্রৌঢ় লোকটির হাত ছেড়ে দিয়ে তার পাশে ছুটে আসবে।

কিন্তু বল্লরীকে ওখানে দেখে বাদল এমন আঘাত পেয়েছিল যে কিছুই বলতে পারলো না, চুপ করে রইলো—সামান্য একটু সময়—তারপর বল্লরী গটগট করে হেঁটে উঠে গেল হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে।

বাদল ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখলো, যতক্ষণ দেখা যায়। একবার সে ভাবলো, এ প্রৌঢ় লোকটির গালে দুই থাপ্পড় দিয়ে বল্লরীকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে—কিন্তু পরক্ষণেই এক ধরনের উদাসীনতা তাকে ভর করলো। না, সে আর বল্লরীর সম্পর্কে মাথা ঘামাবে না, বল্লরী যা ইচ্ছে হোক, যা খুশী করুক; তার কিছু আসে যায় না। বল্লরী শুনবেও না কারুর কথা, সে আগুনে পাখা পোড়াবেই ঠিক করেছে।

।। দশ ।।

দাদা কোনোদিন বাদলের গতিবিধি বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করেন না। সাধারণত কলকাতার বাইরে কোথাও যখন যায় বাদল, দাদাকে কিছু বলে না, বৌদিকে জানিয়ে রাখে শুধু। দাদার সঙ্গে তার দেখা হয়ই খুব কম—দাদা বরাবরই ঘুম থেকে ওঠেন খুব দেরীতে। বাদল সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে জলখাবার খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যায়, দাদা তখনও মুখ ধুয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়েন। দাদা এদিকে রাত্রে বাড়ি ফেরেন দেরী করে, ততক্ষণে বাদলের খাওয়া হয়ে যায়। সপ্তাহে দু'একবারের বেশী মুখ দেখাদেখি হয় না দাদার সঙ্গে। দাদার ব্যবসায়ে বাদলেরও কিছুটা অংশ আছে, কম্পানির মিটিং-এ আগে দু'একবার দাদা তাকে যেতে বলেছিলেন, বাদল যায়নি। সে ওসব ব্যবসায় খুঁটিনাটি ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চায় না।

বাবা যখন মারা যান, বাদল তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। দাদাকে সে পেয়েছে একমাত্র

অভিভাবক হিসেবে। মা যতদিন ছিলেন এ বাড়িতে তখন রাত্তির বেলা অন্তত সবাইকে একসঙ্গে খেতো হতো, দাদা তখন অনেক রকম মজার মজার গল্প বলতেন। দাদার সঙ্গে তার বয়সের অনেক তফাত হলেও, দাদা কোনোদিনও তার সঙ্গে গুরুজনের মত ব্যবহার করেননি। বাদলকে কোনোদিন শাসন করারও দরকার হয়নি, ছেলেবেলা থেকেই বাদল একটু লাজুক ও শান্ত ধরনের। আজ কাল দাদা আর সে রকম হাসি খুশী নেই। একমাত্র বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলার সময়ই দাদার প্রাণখোলা হাসির আওয়াজ শোনা যায় মাঝে মাঝে।

মায়ের ব্যবহারে দারুণ আঘাত পেয়েছেন দাদা। মা কাশীতে বেড়াতে যাবার পর, সেখানেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন যখন, দাদা ছুটে গিয়েছিলেন মাকে ফিরিয়ে আনতে। মায়ের পুজো আচ্চার বাতিকের কথা শুনে দাদাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মা যখন কিছুতেই ফিরে আসতে রাজী হলেন না, তখন দারুণ অভিমান হয়েছিল দাদার। তারপর থেকে আর একবারও মায়ের খোঁজ করেন নি দাদা।

মায়ের সঙ্গে সেবার কাশীতে কি কথাবার্তা হয়েছিল দাদার, বাদল তা আজও জানতে পারেনি। দাদা অবশ্য বৌদিকে ঐ ব্যাপার নিয়ে কখনো বকাবকি করেননি। তারপর থেকেই দাদা কেমন যেন উদাসীন ধরনের হয়ে গেছেন, কথাবার্তাও কম বলেন। বছরে একবার করে বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হয় দাদার—বৌদির বাইরে বেড়ানোর স্বভাবের যখন বড্ড বাড়াবাড়ি হয়। কিন্তু তখনও দাদাকে কোনোদিন ঝগড়ার মাঝখানে একটা খারাপ কথা উচ্চারণ করতে শোনেনি।

এবারেও যে বাদল কাশী থেকে ঘুরে এলো, দাদা একবারও তাকে জিজ্ঞেস করেনি, মা কেমন আছে। বৌদিই বরং অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। বৌদি তার হাত দিয়ে মা-কে একটা গরদের থান পাঠিয়েছিলেন, বারবার বাদলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মা'র সেই থানটা পছন্দ হয়েছে কিনা। মা অবশ্য থানটা দেখে বলেছিলেন, এত দামী কেনার কি দরকার ছিল বৌমার? আমি সাদা থান ছাড়া কিছু পরি না! এই টাকা দিয়ে কত গরীব দুঃখীর উপকার করা যেত।

বাদল অবশ্য বৌদিকে সে কথা বলেনি। বরং মিথ্যে কথাই বলেছিল, বৌদি তোমরা তো কাশীতে একবার গেলেও পারো। মা খুব দেখতে চাইছিলেন তোমাদের— তোমার ছেলেকে তো মা দেখলেনই না! বৌদি সে কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন, কেন তুমি মাকে আর একটা নাতির মুখ দেখাতে পারো না? বিয়ে তা করবে না, না কি ডুবে ডুবেই জল খাবে ঠিক করেছো?

বাদল সকৌতুকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি বুঝি?

—খাচ্ছো না? সত্যি করে বলো তো? মেয়েরা ওসব দেখলেই বুঝতে পারে,

চোখের চাউনি কি রকম উড়ু উড়ু, কথা বলতে বলতে কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে যাও—

—তাই নাকি? আমি এরকম করি বুঝি? এরকম তো থিয়েটারের প্রেমিকারা করে।

—সত্যি বলো না, মেয়েটি কে? তুমি কি কোনো বিবাহিতা মেয়ের প্রেমে পড়েছো নাকি?

বৌদি বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়তে খুব ভালোবাসেন। উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের যদি শেষ পর্যন্ত বিয়ে না হয়, তা হলেই বৌদি একেবারে কেঁদে ভাসান। কোথাও চেনাশুনা কারুর প্রেম করে বিয়ে হচ্ছে শুনলে বৌদি সবিস্তারে সে গল্প বলতে ভালোবাসেন। প্রেমের চিন্তায় বৌদি একেবারে মশগুল। বৌদির নিজেরও বোধহয় ও সম্পর্কে অতৃপ্তি আছে—প্রত্যেক মাসে দুটো তিনটে নতুন শাড়ি কেনা তারই অন্তর্গত। ফিগার ঠিক রাখার জন্য বৌদি একটি সন্তান হবার পর আর মা হতে রাজী হননি। দাদা বৌদিকে ভালোবাসেন নিশ্চয়ই, কিন্তু উপন্যাসের নায়কদের মতন দাদা বৌদির কাছে গদগদ ভাষায় প্রেমের কথা বলছেন, এটা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু বৌদি যে তাই-ই চান। বৌদির কাছে প্রেমিক মানেই চোখ উড়ু উড়ু, আর ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা!

বাদল বললো, বিবাহিতা মেয়ে? এটা আবার তোমার মাথায় ঢুকলো কি করে?

—টের পাই, বুঝলে? সবই টের পাই! কিন্তু ভাই, বিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করলে শুধু কষ্টই পাবে!

—তুমি কি করে বুঝলে? তোমার বুঝি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে?

—ধ্যাৎ! আমি তো বুড়ী হয়ে গেছি। কিন্তু তোমাদের ঐ যে কবি-টবিরা পরকীয়া প্রেমের কথা লেখেন—এ যুগে আর সেটা চলে না। ওতে শুধু যন্ত্রণা আর দুশ্চিন্তা।

মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে ভালো পারে না বাদল। বৌদির সঙ্গেও কোনোদিনই খুব বন্ধুর মতন মিশতে পারেনি। বৌদির রুচি যে অন্যরকম। বাংলা গল্প-উপন্যাস বাদল একেবারেই পড়ে না প্রায়, বৌদির প্রিয় লেখকদের বই সে একটাও পড়েনি—সুতরাং আলোচনা করবে কি নিয়ে। শাড়ি-গয়নার দোকানে বৌদির সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বাদল বললো, কি সব আজেবাজে ভাবছো। আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

—প্রেমে পড়লে তো মাথা খারাপ হয়। আচ্ছা বিবাহিতা না হোক, কুমারীই, নাম বলো না তার। বলো—

—কার নাম বলবো? আমাকে কেউ পাত্তাই দেয় না।

—লুকোবার চেষ্টা করলে কি হবে? আমি জানি। নাম বলবো? ম দিয়ে আরম্ভ

তার নাম।

—এসব কে বললো?

বৌদি মুচকি হেসে রহস্যময় ভাব করে বললেন, বলো, ঠিক বলেছি কিনা? ধরা পড়ে গেছ তো? তোমার সেই বন্ধুর বউ মণিকা, তার সঙ্গে আমার আবার দু'দিন দেখা হয়েছিল নিউ মার্কেটে।

—মণিকার স্বামী অসুস্থ, সে এখন মার্কেটে কেন যায়?

—আহা-হা, তুমি জানো না বুঝি? তোমার যদি তোমার দাদাকে বলতে লজ্জা করে, আমি বলে দিতে পারি তোমার হয়ে?

—দাদাকে কি বলবো?

—বলবে না? তা হলে তাই।

মণিকার নাম বলে বৌদি অত হাসছিলেন কেন খিলখিল করে? বৌদি কি ভেবেছেন নাকি ভাস্করের বৌ মণিকার সঙ্গে তার প্রেম? মেয়েদের মাথায় যে কত উদ্ভট ব্যাপার ঢোকে। কিংবা মণিকা বৌদিকে কিছু বলেছেন? মেয়েদের এইসব রহস্য বাদল কোনোদিন বুঝতে পারবে না। বুঝতেও চায় না।

কিন্তু দাদাকে সেদিন তার ঘরে ঢুকতে দেখে বাদল সত্যিই অবাক হয়েছিল। আরও অবাক হলো, দাদার কথা শুনে। বাদলের প্রথমেই মনে হয়েছিল, বৌদি নিশ্চয়ই দাদার কাছে তার সম্পর্কে একটা মনগড়া গল্প শুনিয়েছে।

বাদল তার সুটকেশ গোছগাছ করছিল। দাদা হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললেন, তুই কোথায় যাচ্ছিস রে দুলু? অফিসের কাজে?

বাদল মুখ থেকে বিস্ময় না লুকিয়ে উত্তর দিল না, না দাদা, আমি এমনই একটু কলকাতার বাইরে যাচ্ছি।

—কোথায়?

—বেশী দূরে নয়, দেউলটি বলে একটা গ্রাম আছে—

—খুব বেশী দরকার? না গেলে হয় না?

—হ্যাঁ, আমাকে যেতে হবে।

—কেন কোনো কাজ-টাজ আছে?

—না, কাজ নয়! এমনি আমি একজনের সঙ্গে যাবো।

—না, বলছিলাম, তোর এখন....

বাদল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দাদার মুখের ভাব বোঝার চেষ্টা করছিল। দাদা চেয়ারটা টেনে বসে পড়েছেন, অর্থাৎ অনেক কিছু বলার আছে তাঁর। কিন্তু একটু যেন দ্বিধা করছেন। বাদল উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে রইলো।

আমি বলছিলাম, ইয়ে, ঐ মেয়েটির সঙ্গে তো তোর বিয়ে হয়নি—তার সঙ্গে বাইরে যাওয়া—এটা ঠিক ভালো দেখায় না!

বাদল স্তম্ভিত হয়ে গেল। দাদা এসব জানলো কি করে? কোথায় কার সঙ্গে যাচ্ছে, তা তো বৌদির ও জানার কথা নয়। বৌদিকে সে শুধু বলেছিল কলকাতার বাইরে যাচ্ছে, দিন সাতেক বাড়িতে থাকবে না। তা ছাড়া দাদা কোনোদিনই নীতিবাগিশ লোক নন, বৌদি একা একা বাইরে ঘুরে বেড়ান তা নিয়েও দাদা খুব একটা আপত্তি করেন না, ছোট ভাইয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যেস তো দাদার একেবারেই নেই!

হঠাৎ বাদলের মনে হলো, তার আর এ বাড়িতে থাকা হবে না। দেউলটি থেকে ফিরেই সে নিজের জন্য আলাদা বাড়ি খুঁজবে। দাদাকে সে এখনও ভালোবাসে, কিন্তু দাদা কোনো কারণে তাকে শাসন করবে—এটা সে সইতে পারবে না। ভেতরের রাগটা চাপা দিয়ে বাদল যথাসম্ভব শান্ত ভাবেই বললো, আমার ট্রেন বেলা সাড়ে এগারোটায়। আমার হাতে আর বেশি সময় নেই।

—তুই যাবিই ঠিক করেছিস?

—হ্যাঁ।

—তুই রাগ কচ্ছিস আমার কথা শুনে?

—যে মেয়েটির সঙ্গে আমি যাচ্ছি, তার মা-ও সঙ্গে যাচ্ছেন।

—কিন্তু তিনি তো খুবই অসুস্থ।

—দাদা, তুমি আমার সম্পর্কে কি ধারণা করেছো? কে বলেছে তোমায় এসব কথা?

—আমার চুরুটটা নিবে গেছে। তোর কাছে দেশলাই আছে?

দেশলাই নিয়ে দু'তিনটে কাঠি পুড়িয়ে চুরুটটা জ্বাললেন নিশানাথ। মুখখানা তাঁর দু'এক মুহূর্তের জন্য বিপন্ন হয়ে উঠলো। বাদলের একবার মনে হলো, দাদা উদাসীন ভালোমানুষ ধরনের—এসব বিষয় নিয়ে বলার তাঁর খুব উৎসাহ নেই, কেউ যেন জোর তাঁকে দিয়ে বলাচ্ছে।

চুরুটে অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে দাদা বললেন, কাল নাণ্টুকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। ন' পিসেমশাই ফোন করেছিলেন।

—নাণ্টু কে?

—ন' পিসীমার ছেলে! তুই দেখিসনি তাকে?

—অনেক ছেলেবেলায় দু' একবার দেখেছি। কি হয়েছে তার?

—আটটা স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। ভাগ্যিস মাঝ রাতেই

টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠিয়ে স্টমাক পাম্প করানো হয়েছিল।

বাদল তখনও কিছুই বুঝতে পারেনি, ন' পিসীমার ছেলের আত্মহত্যা করার চেষ্টার সঙ্গে তার দেউলটি যাবার কি সম্পর্ক! আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগই নেই। আত্মীয়-স্বজনদের বিয়ে কিংবা শ্রাদ্ধে ও বাদল নেমন্তন্ন খাওয়া এড়িয়ে যায়। ন' পিসীমাদের ফার্ণ রোডের বাড়িতে বাদল দু'একবার গিয়েছিল খুব ছেলেবেলায়, তখনই অনুভব করেছিল, ও বাড়িতে বড্ড বেশী বড়লোকি চাল। ন' পিসেমশাইদের কোনো বনেদীআনা নেই, যুদ্ধের সময় কন্ট্রাকটরি করে হঠাৎ বড়লোক হয়েছেন! মাঝখানে সাত আট বছর তো ওঁরা কলকাতাতেই থাকতেন না—আসামেই ওঁদের প্রধান ব্যবসা।

দাদা বললেন—নাণ্টুর বরাবরই একটু মাথায় গোলমাল। কোনোদিনই খুব সুস্থ নয়। তবে আত্মহত্যার চেষ্টা কখনো করেনি। এমনিতে বেশ ভালোই ছিল, যাদবপুরে এম. এ. পড়ছে—কিন্তু ঐ আত্মহত্যার ব্যাপারে ন' পিসীমা, আর পিসেমশাই তো দারুণ ঘাবড়ে গেছেন। সব খোঁজ খবর নিয়েছেন। ওঁদের ছেলেমেয়ের ভাগ্য তো ভালো নয়। মেয়েটা মারা গেল—এখন ঐ এক ছেলে—

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে বাদল বললে, নাণ্টুর ভালো নাম কি? অভিজিৎ—

—হ্যাঁ।

আশ্চর্য, বাদলের একথাটা একবারও মনে পড়েনি কেন? অভিজিৎ তারই পিসতুতো ভাই!

মল্লিকার সঙ্গে দাদা গাড়িতে সেদিন এক পলকের জন্য অভিজিৎকে দেখে তাই একটু চেনা মনে হয়েছিল! মল্লিকার মুখে ফার্ণ রোডে অভিজিৎদের বাড়ির কথা শুনেও বাদল কিছুই বুঝতে পারেনি। হ্যাঁ, অভিজিদের দিদি অনেকদিন আগে কি একটা শক্ত অসুখে ভুগে যেন মারা গেছে! কিন্তু তার সঙ্গে মল্লিকার মুখের মিল? বাদল তো কোনোদিনই লক্ষ্য করেনি! অবশ্য অভিজিতের দিদি পূরবীকে বাদল দেখেছে আট ন' বছর আগে!

বাদলের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো, চোখের দৃষ্টি স্থির। একটু রুক্ষ ভাবে বললো, এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক?

—ন' পিসেমশাই আমকে বললেন, নাণ্টু তার ইউনিভার্সিটির কোন এক মেয়ে অধ্যাপিকার জন্য পাগল! সেই মেয়েটি আবার তোর বন্ধু!

—ঐটুকু ছেলের এসব পাগলামিতে প্রশ্রয় না দেওয়াই তো উচিত!

—ঠিকই তো! কিন্তু ছেলে যদি আত্মহত্যা করতে চায়—ঐ একটি মাত্র ছেলে তো, ওঁরা একেবারে স্নেহে অন্ধ! ন' পিসেমাশই সব খোঁজ খবর নিয়েছেন, উনি

বললেন, ছেলে যদি সেই বিয়ে করে খুশি হতে চায়, তিনি তাতেই রাজী আছেন। তোর কাছে জিজ্ঞেস করতে বললেন—

—দাদা, কি অদ্ভুত কথা বলছো! একটা বাচ্চা ছেলে পাগলামি করছে বলে আর সবাই তার সঙ্গে পাগল হবে! আমি খুব ভালো করে জানি, মল্লিকার পক্ষে ঐ ছেলেকে বিয়ে করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না! অভিজিতের থেকে পাঁচ ছ বছরের বয়েসে বড়।

—আজকাল তো বয়েসে বড় মেয়েকে বিয়ে করা খুব অস্বাভাবিক নয়!

বাদলের যেন দম বন্ধ হয়ে এলো। সমস্ত বিষয়টাই এমন অদ্ভুত অযৌক্তিক অবাস্তব যে, এ নিয়ে আলোচনা করতেই সে হাঁপিয়ে উঠছে। জোরে সুটকেসের ডালাটা বন্ধ করে বললো, আর মাত্র আধঘণ্টা সময় আছে। আমাকে এক্ষুনি ট্যাক্সি ধরতে হবে। আমি এখন আর এ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে পারছি না।

—তুই যাবিই তা হলে?

—কথা দেওয়া আছে, ওরা অপেক্ষা করছে আমার জন্য। যেতে আমাকে হবেই। দাদা, তুমি জানো, মাসী-পিসী মামা-কাকাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিনি। তারা কে কি ভাবলো না ভাবলো, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি নিজের বিবেকের বিচার অনুযায়ী চলি। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?

দাদা উঠে দাঁড়ালেন, বড় ক্লান্ত আর আহত তাঁর মুখ। চলে এলেন দরজার কাছে, দরজার একটা কব্জা আলগা হয়ে গেছে, দু'চার বার নেড়ে চেড়ে দেখলেন সেটা। তারপর খুব নিচু গলায় বললেন, তুই কি ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করবি ঠিক করেছিস?

—হ্যাঁ।

বাদল যখন 'হ্যাঁ' শব্দটা উচ্চারণ করলো, তখন তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল, যেন সমস্ত পৃথিবী তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও সে মল্লিকাকে ছাড়বে না। এজন্য সে দাদাকে এবং আত্মীয় স্বজনকে শুধু নয়—দেশও ছাড়তে রাজী আছে। এমনকি, প্রয়োজন হলে সে মল্লিকাকে খুন করে ফেলবে, তবু সে তাকে অন্য কারুর হাতে তুলে দেবে না। সে অনেক ভুল করেছে, আর ভুল করবে না।

—কিন্তু মেয়েটি নান্টুর সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবার গিয়েছিল।

বাদলের হঠাৎ কান্না এসে গেল। অতিরিক্ত রাগ চেপে রাখলে যে-রকম কান্না আসে। অন্য কেউ এখন তার সামনে মল্লিকার কুৎসা করতে এলে বাদল লাফিয়ে উঠে তার টুঁটি চেপে ধরতে পারতো। কিন্তু দাদা, দাদাকে সে জানে সত্যিকারের ভালো মানুষ, দাদা অবুঝের মতন এসব বলছেন। বাদল ধরাগলায় বললো, দাদা, আমি, আমি তোমাকে বলছি, সেই মেয়েটি এ সব কিছুর উর্ধ্বে। সে কোথায় কার সঙ্গে গেল, তাতে কিছু যায় আসে না। সে সত্যিকারের সরল ভালো মেয়ে, আমি বলছি তোমাকে,

বিশ্বাস করো—

—তুই কিসে যাচ্ছিস? ট্রেনে না গাড়িতে?

—ট্রেনে।

—ট্রেনের হয়তো দেরী হয়ে গেছে। আমি অফিসের গাড়িটা বলে দিচ্ছি, সেটা নিয়ে যা। চার পাঁচ দিনের বেশী লাগবে না তো?

—না, আমার গাড়ির দরকার নেই। এর পর আরও ট্রেন আছে।

—আমার অসুবিধে হবে না, তুই গাড়িটা নিয়ে যা। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি—আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই, ঐ মেয়েটিকে তোর বিয়ে করা ঠিক হবে না।

—কেন? একথা বলছো কেন?

—যে মেয়ের জন্য কোনো ছেলে পাগল হয়, তাকে বিয়ে করে সুখী হওয়া যায় না। মনের মধ্যে যদি একবার একটু অবিশ্বাস দেখা দেয়—

—আমার মনে কোনো অবিশ্বাসই আসেনি মল্লিকা সম্পর্কে।

—এখন আসেনি পরে আসতে পারে। একদিন না একদিন নাণ্টুর কথা তোর মনে পড়বেই।

—নাণ্টুর পাগলামি দু'চার মাসের মধ্যেই থেমে যাবে। ওর কম বয়েস, আবার অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হলেই—

—হয়তো ঐ মেয়েটির মনে পড়বে নাণ্টুর কথা। একবার না একবার ও নিশ্চয়ই ভাববে, তোর বদলে নাণ্টুর সঙ্গে বিয়ে হলে ও বেশী সুখী হতো কি না! যাকে পাওয়া যায় না তার প্রতিই মানুষের টান বেশী থাকে।

—কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে না হবে, তাই ভেবে আমি এখন আমার নিজের জীবনটা নষ্ট করবো?

—তা অবশ্য ঠিক। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানের আনন্দটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া, ঠিক কোন মেয়েকে বিয়ে করলে সারা জীবন সুখে থাকা যাবে, তা কোনো পুরুষই বলতে পারে না।

।। এগারো ।।

যাবার পথে মল্লিকাকে অভিজিৎ সম্পর্কে একটা কথাও জিজ্ঞেস করেনি বাদল। মল্লিকার মা বেড়াতে যাওয়ার আনন্দে আজ অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বাদল গাড়ি নিয়ে আসায় শিশুর মতন খুশী হয়ে উঠলেন তিনি। সারা রাস্তা তাঁদের বাড়ির অতীত জাঁকজমকের গল্প শোনাতে লাগলেন। রাসবিহারী মারা যাওয়ার পর ওদের বাড়ির গাড়িটা বিক্রি করে দিতে হয়। শ্বশুরের আমলে ওঁদের তিনখানা গাড়ি ছিল।

তার মধ্যে একটা ছিল রোলস্ রয়েস। পাথুরেঘাটার প্রদ্যুম্ন মল্লিকের রয়েসগুলো যখন বিক্রি হয়ে যায়—তখন তার একখানা কেনা হয়েছিল, ওঁদের বাড়ি থেকে। রাসবিহারী অবশ্য সে গাড়িখানা রেড ক্রসকে দান করে দিয়েছিলেন অ্যাম্বুলেন্স করার জন্য। স্বামীর পরোপকারের কীর্তিকগুলো নিয়ে তেমন কোনো ক্ষোভ নেই মল্লিকার মায়ের, সকৌতুকেই সব গল্প শোনাচ্ছেন।

দেউলটির বাড়ি নিয়ে মায়ের গল্প আর ফুরোয় না। বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বলে তার মুখে প্রচ্ছন্ন বেদনা। বাদল বুঝতে পারলো, বাড়ির প্রতি টান মেয়েদের কত সাঙ্ঘাতিক হয়! মেয়েরাই নিশ্চয় প্রাগৈতিহাসিক কালের যাযাবর মানুষদের আস্তে আস্তে ঘর বাঁধতে শিখিয়েছে।

দেউলটির বাড়িটা তাঁদের সত্যি কোনো কাজে লাগে না। কলকাতার বাড়িটাই এত বড় যে অনেকগুলো ঘর ব্যবহার করাই হয় না, দেউলটির বাড়িটা তো নিতান্ত অকেজো। বিক্রি করা ছাড়া আর উপায় কি! তবু মা ভুলতে পারবেন না, ঐ বাড়িতে তিনি নতুন বৌ হয়ে এসেছিলেন, ঐ বাড়িতে জন্মেছে তাঁর মেয়েরা, গ্রামের মানুষদের কত ভালোবাসতেন তাঁর স্বামী!

বাড়িটার চেহারা দেখে বাদলও দুঃখিত হয়ে পড়লো। ঠিক সাড়ে ছ বছর আগে বাদল এখানে এসেছিল, তখন যা দেখেছিল, তার থেকে বাড়িটার অবস্থা এখন আরও অনেক খারাপ হয়ে গেছে, ভেঙে-চুরে পড়েছে ছন্দ। মল্লিকাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় পরিবার থাকে এ বাড়িতে, তারা বোধ হয় উনুনে কয়লার অভাব হলে এ বাড়িরই দরজা জানলা ভেঙে আগুন ধরায়।

শুধু বাড়িটা ভেঙে পড়ছে না, বাদল অনুভব করলো, রাসবিহারী সরকারের পরিবারটাই ভেঙে যাচ্ছে। চায়ের রপ্তানির ব্যবসা করে মল্লিকার ঠাকুর্দা প্রচুর পয়সা করেছিলেন, মল্লিকার বাবা খামখেয়ালীপনা করে তার অনেক টাকাই খরচ করে গেছেন। একটা ছেলে জন্মালো না তাঁর। এক মেয়ে বিয়ে করে অভিমান নিয়ে চলে গেছে দূর দেশে। এক মেয়ে সিনেমার লোকদের কুসঙ্গে পড়েছে। এসব বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করার মতন মনোবৃত্তি নয় মল্লিকার! মল্লিকা ঠিক করেছে, এ বাড়ি বিক্রির টাকায় মেডিক্যাল কলেজে বাবার নামে দুটো বেড খুলে দেবে।

বাদল ঠিক করেছিল, এখানে এসে বল্লরীর কথা কিছুতেই মনে করতে চাইবে না। তবু মনে পড়লোই। সেই ভাঙা দালানটার পাশে খিলানটা দেখতেই মনে পড়ে গেল, ঐখানে পা ভাঙা অবস্থায় বই হাতে নিয়ে বসেছিল বল্লরী। সাদা ফ্রক পরা তার সেই কিশোরী মূর্তিটা এখনও যেন দেখা যায়। অথচ সেই বল্লরী এখন কত দূরে সরে গেছে।

শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আসতে রাজী হলো না বল্লরী। ওরা আসবার সময় সে নিচে নেমে গাড়িতে ওদের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়েছিল। সেদিন বেশ ভালো মেজাজেই ছিল বল্লরী, বেশ হেসে হেসেই কথা বলছিল। বাদলকেও একবার বলেছিল, আপনি রাস্তা থেকে ডজনখানেক কমলালেবু কিনে নিয়ে যাবেন কিন্তু! মার রোজ সকালেই কমলার রস খাওয়ার কথা। ওখানে বোধ হয় পাওয়া যাবে না!

বাদলও হালকা মনে বলেছিল, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে! এক একা থেকে কি করবে! আমরা তিন চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসবো!

সে কথার উত্তরে বল্লরী আবার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে শুধু 'না' বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বাদলের তখন মনে হয়েছিল, কোনো কাজ কিংবা শুটিং- এর জন্যই যে বল্লরী আসছে না, তা নয়। সে যেন কোনো প্রবল অভিমান থেকে না বলছে। কিসের অভিমান তার? তার তরুণী হৃদয়ে এত নিষ্ঠুরতাই বা এলো কি করে?

সেবার রাস্তাঘাট ছিল কাদায় ছপছপে। এখন শুকনো খটখটে রাস্তা। নদীরও সেই বিশাল রূপ নেই। সন্ধ্যেবেলা মল্লিকার হাত ধরাধরি করে বাদল গেল রূপনারায়ণের কূলে। বসলো গিয়ে সেই পুরনো জায়গায়। মল্লিকাই প্রথম বললো অভিজিতের কথা!

যেন খুব ভয় পেয়েছে, মল্লিকা শক্ত করে বাদলের হাতটা চেপে ধরে বললো, জানো, পরশুদিন সন্ধ্যেবেলা অভিজিৎ আবার এসেছিল বাড়িতে।

বাদল নির্লিপ্তভাবে বললো, তাই নাকি?

—তুমি চলে যাবার একটু পরেই। ভাগ্যিস দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে।

—কেন, দেখা হলে কি হতো!

—না, না, ছেলেটা কি রকম পাগলের মতন ব্যবহার করছিল! তোমার নাম জানে, বারবার বলছিল, বাদলদার চেয়ে আমার দাবি বেশী!

—দাবি? কিসের দবি?

—তা কে জানে? সেদিনই প্রথম বুঝতে পারলুম, ছেলেটা ঠিক সুস্থ নয়, চোখ মুখ অস্বাভাবিক। পাগল নাকি ছেলেটা? অথচ আমি আগে কিছু বুঝতে পারিনি। বাদল, আমার ভয় করছে।

—পাগলকে আবার ভয় কি? পাগলদের করুণা করতে হয়।

—কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ যদি এরকম বাড়িতে চলে আসে? আমি তাড়িয়ে দেবো কি করে? মুখের কথা শোনে না। কতবার বললুম তুমি চলে যাও, চলে যাও— কিছুতে যেতে চায় না। ঐ ছেলে ক্লাসে থাকলে যাবদপুরে আমার পক্ষে আর পড়ানো অসম্ভব।

—তোমাকে ওখানে আর পড়াতে হবে না।

—কিন্তু যদি এরকম বাড়িতে আসে? ওকে পরশুদিন দেখে, নিজের ওপর ঘৃণা আমার বেড়ে গেল আরও। আমি কি এতদিন অন্ধ হয়েছিলাম? আমি ওর পাগলামি বুঝতে পারিনি, ওর ব্যবহারকে ভেবেছিলাম স্নেহ—ওর সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার গিয়েছিলাম, সেখানে যদি ওর পাগলামি আরও বেড়ে যেত, ও যদি সেদিন শেষ পর্যন্ত আমার অনুনয় না শুনতো—

বাদল হঠাৎ টের পেল, অভিজিৎ-এর কথা শোনার মতন তেমন উৎসাহ তার নেই। বারবার বল্লবীর কথাই মনে পড়ছে তার, এখানে এসে। এখানে সেই লুকোচুরি খেলা হয়েছিল, তিনজনে মিলে ছুটোছুটি করেছিল এই অন্ধকার আকাশের নিচে। এখনও যেন মনে হয়, বল্লরী এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে, হঠাৎ নদীর জলে ঢিল ছুঁড়ে দেবে। সেদিন গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের সামনে বল্লরীর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার ঘটনাটা মনে পড়লো। সেদিনই সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছিল বাদল। কি কুৎসিত ছিল বল্লবীর পোশাক সেদিন, নির্লজ্জ রুচিহীন একটা লোভী গোরিলার মতন চেহারার প্রৌঢ় লোকের সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল। একটাও কথা হয়নি বল্লরীর সঙ্গে, চোখাচোখি হয়েছিল শুধু। বল্লরী থমকে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন কিন্তু বল্লরীর চোখে রাগ অথবা অবজ্ঞা ছিল না। তা হলে কি ছিল সেই দৃষ্টিতে?

বাদলের—হঠাৎ যেন মনে পড়লো, সেদিন ছিল বল্লরীর চোখে মিনতি কিংবা প্রতীক্ষা—তখনও যদি বাদল তাকে নিষেধ করে, তা হলে সে হোটেলে ঢুকবে না ঐ লোকটির সঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেছিল বল্লরী, বাদল কিছুই বলেনি। কোন ভরসায় বলবে? বল্লরী কি কয়েকদিন আগে বৈঠকখানায় বসে তাকে অপমান করেনি? সেদিনও তো হোটেলের গাড়ি বারান্দার নিচে অত মানুষজনের মধ্যে বল্লরী বলে উঠতে পারতো, আমার জন্যে আপনার এত মাথাব্যথা কেন? আমার যা খুশী আমি করবো। আপনি বলার কে?

বাদল ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, থাক্ অভিজিতের কথা। মল্লিকা তুমি ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। আমি বলছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। মল্লিকা, তোমার মনে পড়ে, সেবার এসে আমরা এখানে ছুঁই ছুঁই খেলা খেলেছিলাম?

—তুমি বলছো, সব ঠিক হয়ে যাবে?

—আবার ঐ কথা! মনে আছে, সেই খেলার কথা?

—হ্যাঁ।

—এসো, আজ আবার সেইরকম খেলি।

—দুজনে কি সেই খেলা হয় নাকি? খুকু এলো না—তাছাড়া আর খেলার দরকার নেই। তোমার পাশাপাশি বসতেই ভালো লাগছে।

—ঠিক বলেছো, দুজনে মিলে ও খেলা ভালো লাগে না।

বাদলের মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চঞ্চলতা চাপা দেবার জন্য সে একটা কিছু চাইছিল। হঠাৎ সে মল্লিকাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার ঘাড়ের কাছে মুখ রাখলো। মল্লিকা ত্রস্তে বলে উঠলো, এই, এই, কি করছো, কেউ দেখে ফেলবে।

—এখানে আর কে দেখবে? এদিকে তো কেউ আসে না—

—তবু যদি কেউ এসে হঠাৎ দেখে—

—কেউ দেখবে না। দেখার মধ্যে দেখবে মাথার ওপরের এই আকাশ, এই নদী, এই অন্ধকার—ওরা আপত্তি করবে না। হয়তো ওদের ভালোই লাগবে।

দুজনের ঠোঁটে অনেক তৃষ্ণা, শরীরে উত্তাপ পাবার আকুলতা। দুজনের শরীর খেলায় মেতে উঠলো, বাদল তার মনের চঞ্চলতা ঢেকে দিতে চাইলো দেহের চঞ্চলতায়। মল্লিকার বুকে মুখ ডুবিয়ে বাদল উন্মত্তের মতো ঘষতে লাগলো ঠোঁট দুটো। মল্লিকা অস্ফুটভাবে বললো, আঃ, আঃ—

সরল, বড় সরল মল্লিকা, সেই সময় যে-কথাটা উচ্চারণ করা একেবারেই উচিত নয়, সেই কথাটাই বলে ফেললো। বললো, বাদল, আমাকে তোমার ঘেন্না হয় না?

—ঘেন্না? কেন? এরকম অদ্ভুত কথা বলছো কেন! জীবনে এত আনন্দ কখনো পাইনি।

—অভিজিৎ আমার ঠোঁটে—

বাদল মুখ তুলে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসলো। সে বুঝতে পারলো, এ কথা মল্লিকা ছাড়া আর কোনো মেয়েই বলতে পারবে না। ঐ কথাটা মনকে কষ্ট দিচ্ছে বলে সে না বলে পারেনি। বাদল বললো, মিলু, শরীর হচ্ছে অমৃত, তা কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ বোম—এই পঞ্চভূত কখনো অপবিত্র হয় না। মল্লিকা, আমি যে তোমাকে পেয়েই পৃথিবীর সব কিছু পেয়ে গেছি!

আবার অমৃতের স্বাদ নেবার জন্যই মল্লিকার ঠোঁটে বাদল তার ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। মল্লিকা শুয়ে পড়লো বাদলের বুকে।

ঠিক কানের কাছেই প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করে উঠলো, এই! এই! দারুণ চমকে দুজনে ছিটকে সরে গেল! মল্লিকা চেঁচিয়ে উঠলো, উঃ মাগো! বাদল সিধে হয়ে উঠে দাঁড়ালো। প্রথমটা দেখলে ভয়ই করে, মনে হয় কোনো প্রেতাত্মা। একটা রোগা দাড়িওয়ালা লোক, ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক পরা—তাদের খুব কাছে এসেই দাঁড়িয়েছে। উৎসুক ভাবে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। লোকটার ভাব ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় পাগল। বাদল ধমক দিয়ে বললো, এই এখানে কি চাস!

পাগলটা আবার চেঁচিয়ে উঠলো, এই, এই!

বাদল হাত তুলে মারার ভঙ্গি করে বললো, যাও, যাও।

লোকটা এক পা এক পা করে পিছোতে লাগলো! বাদল আবার তাকে ভয় দেখাতে সে অনেক দূরে চলে গেল।

বাদল মল্লিকার কাছে ফিরে এসে হাসতে হাসতে বললো, দেখছি যত পাগলরাই আমাদের জ্বালাতন করছে।

মল্লিকা বললো, ছি ছি, আমাদের ওখানে ওরকমভাবে বসা উচিত হয়নি। যদি অন্য কেউ আসতো। পাগলটা দেখে আমি এত ভয় পেয়েছিলুম—

—পাগলদের দেখে ভয় পাবার কি আছে?

—ওরা অনেক সময় পাথর-টাথর ছুঁড়ে মারে না?

—তখন উল্টে ওদেরও ভয় দেখাতে হয়। পাগলরাও ভয় পায়।

—যাই বলো, এখনো আমার বুক টিপটিপ করছে।

—ভয় কি, আমি তো তোমার পাশে আছি।

—তুমি সারা জীবন এরকম আমার পাশে থাকবে তো?

—হ্যাঁ থাকবো। সারা জীবন।

।। বারো ।।

কলকাতায় ফেরার পরই মল্লিকার মায়ের অসুখ আবার বেড়ে গেল। পুরনো হাঁপানি রোগ, সেই অবস্থাতেই তিনি প্রস্তাব দিলেন, এবার ওদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জন্য। আর দেরী করার কোনো মানে হয় না। ডাক্তার বলেছেন, কোনো শুকনো জায়গায় গিয়ে থাকলে ওঁর স্বাস্থ্যের উপকার হবে। তাই ঠিক হলো মল্লিকার বিয়ে হবার পর উনি এলাহাবাদে ওঁর ছোট ভাইয়ের কাছে কিছুদিন থাকবেন।

কিন্তু দেড় মাসের মধ্যে বিয়ের কোনো তারিখ নেই। রেজেস্ট্রী বিয়ে যে কোনো সময়েই হতে পারে, কিন্তু ওঁর ইচ্ছে পুরুত ডেকে শাস্ত্রমতেই বিয়ে হোক। অত অসুখের মধ্যেও ক্ষীণভাবে হেসে বললেন, এতকাল যখন থাকতে পেরেছি, তখন আর দেড় মাসও কলকাতায় থাকতে পারব। তারপরেই না হয় যাবো এলাহাবাদ।

বিয়ের তারিখ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেল এবং তার চারদিন পরেই উনি মারা গেলেন। এলাহাবাদ আর যাওয়া হল না, মেয়ের বিয়েও দেখা হল না—বহু দিনের ঝাঁঝরা ফুসফুসটা চিতার আগুনে পুড়ে গিয়ে বোধহয় শান্তি পেল।

মার মৃত্যুতে খুবই ভেঙে পড়লো মল্লিকা। বল্লরীর বিশেষ কোনো ভাবান্তর হলো না। বল্লরীকে কেউ কাঁদতেও দেখেনি। দিন সাতেক চুপচাপ বসে রইলো বাড়িতে, তারপর আবার আগের মতই বেরিয়ে যেতে লাগলো। মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে

মল্লিকাদের বহু আত্মীয়-স্বজন কোথা থেকে এসে উদয় হলো, অনেকে থেকে গেলও বাড়িতে। এবং অনাথা মেয়ে দুটিকে বহু অযাচিত উপদেশও দিতে লাগলো। বল্লরী অবশ্য তাদের গ্রাহ্য করে না। বাদল আসে মল্লিকার কাছে, তাতে তারা বাঁকা বাঁকা কথা বলে।

শ্রাদ্ধের পর বল্লরী নেমন্তন্ন করলো তার একদল নিজস্ব বন্ধু-বান্ধবদের। তাদের মধ্যে অধিকাংশই সিনেমার লোক, এমনকি গৌতম রায় পর্যন্ত। বাড়ির সামনে বহু উৎসুক জনতার ভিড় হলো তাদের দেখার জন্য। গৌতম রায় অবশ্য বাদলকে চিনতে পারলো না। সেই ট্রেনে দেখা হওয়ার কথা তার মনেও নেই।

মায়ের মৃত্যুর জন্য বিয়েটা আর কয়েক মাস পিছিয়ে দেওয়াই ঠিক হলো। যাদবপুরের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে মল্লিকা, একটু রোগা হয়ে গেছে ক'দিনে। বাদল রোজ আসে তার কাছে, দুজনে মাঝে মাঝে একটু বেড়াতে যায়। মল্লিকার মনটা বড্ড নরম হয়ে গেছে—সে কিছুতেই এ কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারছে না যে, বাদলকে বাদ দিলে পৃথিবীতে সে এখন সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজন সে-রকম কেউ নেই, আর বল্লরীও ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, সে আর ফিরবে না। বল্লরী ইতিমধ্যেই প্রস্তাব দিয়েছে, তাদের এ বাড়িটাও বিক্রি করে দেওয়া হোক। তার নিজের অংশের টাকা নিয়ে সে দক্ষিণ কলকাতায় একটা ছোট ফ্লাট দেখে উঠে যাবে। এই জবরজং বাড়িতে এত আজেবাজে লোকের সঙ্গে থাকতে তার ভালো লাগে না।

প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত ভাবে মল্লিকা বলেছিল, তুই বলছিস কি? আমাদের এ বাড়ি বিক্রি করে দেবো? ঠাকুরদার আমলের বাড়ি?

—হ্যাঁ, এ পাড়ায় থাকতে আমার ইচ্ছে করে না। আমি আর এখানে থাকবো না।

বল্লরী এমন ভাবে কথা বলছে, যেন মল্লিকা তার দিদি নয়। নিছক এক সম্পত্তির অংশীদার। ভীষণ তাড়াতাড়ি সে বদলে যাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, মায়ের বন্ধন ছিঁড়ে যাবার পর, সে মল্লিকা আর বাদলের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখতে চায় না। পৃথিবীতে সে একা হতেই চায়। বাদলের সঙ্গে কথা বলা সে একদম বন্ধ করে দিয়েছে।

মল্লিকা শেষ পর্যন্ত বলেছিল, কিন্তু বাড়ি বিক্রি করতে গেলে তো দিদিকে ক্যানাডায় চিঠি লিখতে হবে। দিদি এখন কোথায় আছে, তাও জানি না।

—কেন, দিদিকে চিঠি লিখতে হবে কেন?

—বাড়ি তো আমাদের তিনজনেরই। দিদির অনুমতি ছাড়া বাড়ি বিক্রি হবে কি করে? দেউলটি'র বাড়িটা ছিল মায়ের নামে।

—না, দিদির অনুমতি লাগবে না। বাবা উইল করে শুধু আমাদের দুজনকেই দিয়ে

গেছেন, আমি জানি।

—তুই তাও জানিস্? তুই সে খবর পেলি কোথা থেকে?

—খবরটা কি করে জানি, সেটা বড় কথা নয়। খবরটা যে সত্যি সেটাই বড় কথা।

বল্লরীর কথা বলতে বলতে মল্লিকা কেঁদে ফেলেছিল বাদলের সামনে। বল্লরী কি এ কথাও ভাবতে শুরু করেছে যে মল্লিকা তাকে সম্পত্তির অংশ থেকে ঠকাবে? কে তাকে এসব বুদ্ধি দেয়? কিন্তু বল্লরী নিজের বাড়ির কারুর কথাই আর শুনবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। কথায় কথায় সে বলে, আমার একুশ বছর বয়েস পেরিয়ে গেছে, নিজের কথা বোঝবার মতন যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।

একদিন বল্লরী ফিরলো রাত দুটোর সময়। বাড়ির গেট বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু মল্লিকা জেগে বসে ছিল দোতলার জানলার কাছে। দুখানা মোটার গাড়ি এসে থামলো বাড়ির সামনে, গাড়ি ভর্তি লোকগুলো নিশ্চয়ই মাতাল, অত রাত্রে হর্ন বাজিয়ে হল্লা করতে লাগলো সেখানে। গাড়ি থেমে নেমে এলো বল্লরী, তার পদক্ষেপও অসংযত, হি-হি করে হেসে যেন কাকে কি বললো।

জানলা থেকে দেখে লজ্জায় মরমে মরে গেল মল্লিকা! এই তার বোন! সে আর কিছুই মানবে না। দোতলায় উঠে এসে চটি দুটো ছুড়ে দিল বারান্দার কোণায়, বাইরের শাড়ি জামা না ছেড়েই ধপ করে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

মল্লিকা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় গিয়েছিলি খুকু? কোনো উত্তর নেই। মল্লিকা আবার জিজ্ঞেস করলো, কোথায় ছিলি এত রাত পর্যন্ত? তবু উত্তর নেই।

উঠে এসে মল্লিকা ওর পিঠে হাত রাখতে গিয়ে টের পেল, বল্লরী ফুলে ফুলে কাঁদছে। হাজার প্রশ্নেও সে উত্তর দিল না। পরের দিন সকালেও তার মুখ থেকে একটা কথাও বার করা গেল না।

বাদল সব শুনে বললো, ওরা অন্য জেনারেশান। ওদের কথা আমরা বুঝতে পারবো না। এতকাল যা কিছু ভালো বা মন্দ বলে মনে করা হতো, ওদের কাছে তার সব কিছুরই মানে বদলে গেছে। বল্লরী যা করছে, তা শুনলে নিশ্চয়ই খারাপ মনে হবে—কিন্তু তবুও বল্লরীকে কি খারাপ নষ্ট মেয়ে হিসেবে ভাবা যায়? কিছুতেই ভাবা যায় না।

—কিন্তু ওকে নিয়ে এখন কি করবো! ওর কথা ভেবে রাতে আমার ঘুম হয় না।

—কিন্তু কিছু বললে তো ও শুনবে না। দারুণ জেদী মেয়ে। মা মারা যাবার পর ও একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে। যে-কারণেই হোক ও আমাকে পছন্দ করে না একেবারে। আগে তোমাকে ভালোবাসতো, এখন তোমাকেও আর সম্মান করে না।

এখন ওকে কে কি বলবে?

—তা বলে ওকে এই রকম ভাবে চলতে দেবো?

—আমার তো মনে হয়, বল্লরীর কাছ থেকে আমাদের এখন দূরে থাকাই ভালো। ওকে ফেরাবার কোনো উপায় আমার জানা নেই। সারা পৃথিবীতে কেউ আজকাল ওদের সামলাবার উপায় জানে না।

—কিন্তু খুকু আমার চেয়ে মোট সাড়ে পাঁচ বছরের ছোট—তাকে তুমি অন্য জেনারেশান বলছ কি করে? ওকি আমাদের চেয়ে আলাদা?

—হ্যাঁ, আলাদা। এখন একটা দুটো বছরেই অনেক কিছু মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে। তুমি আমি ভাবছি, একটি কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ের পক্ষে অতগুলো সন্দেহজনক লোকের সঙ্গে মেশা উচিত নয়, অত রাত্রে বাড়ি ফেরা খুবই আতঙ্কের। কিন্তু বল্লরীও কি এটা বোঝে না? হাবা-গোবা মেয়ে তো নয় যে কেউ তাকে ভোলাবে। বয়স কম হলেও বল্লরী ছেলেমানুষ নয়—এম.এ. পড়ছে, তার বুদ্ধি আছে যথেষ্ট। সুনীতি-কুনীতি কাকে বলে, তাও সে বোঝে। কিন্তু ঐ যে বললুম, মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। একটা কথা তুমিও নিশ্চয়ই বোঝো—মেয়েদের সতীত্বের আদর্শের পেছনে অনেকটাই ছিল ভয়, আজকাল বিজ্ঞান সেই ভয় ভেঙে দিয়েছে।

—কিন্তু খুকু কারুর ভালোবাসা পাবে না? কারুকে ভালোবাসতে পারবে না?

—অনেকে সারাজীবন শুধু নিজেকেই ভালোবাসে, আর কারুকে ভালোবাসতে পারে না। বল্লরী আমাকে বলেছিল, ও চায় অনেক মানুষ ওকে ঘিরে স্তুতি করবে, ওর মুখের কথায় সবাই উঠবে বসবে—সেইরকম জায়গায় উঠবার জন্য বল্লরী একটা সিঁড়ি খুজছে।

মল্লিকা আবার সেইরকম শূন্যচোখে তাকালো, আবার তার মুখে বিচ্ছেদের বেদনা। বাবাকে হারিয়েছে, মাকে হারিয়েছে, এখন বল্লরীকেও হারাতে হবে। এত বিচ্ছেদ তার সয় না।

দোতলায় মল্লিকার শোবার ঘরে ইজি চেয়ারে বসে কথা বলছে বাদল! বিশাল ঘরখানা, দেয়ালে পুরনো কালের ছবি, এমনকি রানী ভিক্টোরিয়ার একটা ছবিও ঝুলছে। আগে দু'বোনেই শুতো এই ঘরে। মায়ের মৃত্যুর পর, বল্লরী এখন মায়ের ঘরটা নিয়েছে। কথা বলতে বলতে মল্লিকা এসে দাঁড়িয়েছে বাদলের চেয়ারের পাশে, কিছু না ভেবেই বাদল সোজা হয়ে বসে একহাতে জড়িয়ে ধরেছে তার কোমর—।

মল্লিকা বললো, কিন্তু খুকুর যদি ঐ সবই ভালো লাগবে, তা হলে সেদিন রাত্রে কেঁদেছিল কেন?

—কেঁদেছিল? কবে?

—এই তো দিন তিনেক আগে। যে রাত্রে ও দুটোর সময় ফিরলো—

—কান্নার কারণ খুজে পাওয়া খুব মুশকিল। বল্লরী কখনো কাঁদছে, এটা আমি যেন কল্পনাই করতে পারি না। ও নতুন যে বইটায় নামছে, সেটায় বোধ হয় খুব কান্নার পার্ট আছে?

—ছিঃ, তুমি এমন নিষ্ঠুরের মতন কথা বলতে পারো?

বাদল যেন বল্লরীর প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে আর উৎসাহ পাচ্ছে না। উত্তর না দিয়ে একটু হাসলো। মল্লিকার কোমর ধরে তাকে আরও কাছে টেনে আনতে চাইলো। মল্লিকার সেদিকে মনোযোগ নেই, সে আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এই সময়, পাতলা কাপড় ভেদ করে বাদলের চোখে পড়লো মল্লিকার ফর্সা পেটে ছোট্ট নাভি। বাদল ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো, মিলু, তোমার নাভিতে একটু চুমু খেতে ইচ্ছে করছে।

মল্লিকা এবার সচেতন হয়ে বললো, এই যা, কি ছেলেমানুষী করছো। ছাড়ো!

—না, ছাড়বো না। ভীষণ ইচ্ছে করছে—

—পাগলামি কোরো না। আর ক'দিন বাদেই তো

—আমি আর পারছি না—

বাদল জোর করে মল্লিকাকে দু'হাতে ধরে তার পেটের কাছে মুখ গুঁজলো। শাড়ি সরিয়ে জিভ দিয়ে ছুঁতে লাগলো মল্লিকার নাভি। জোর করে ছাড়িয়ে নেবার বদলে, সুড়সুড়ি লাগায় মল্লিকা হাসতে হাসতে বলতে লাগলো, এ-ই-ই, এ-ই-ই, কি হচ্ছে—

—দিদি!

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকেই বল্লরী থমকে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে চলে যেতে যেতে বললো, ও। আই অ্যাম সরি।

তৎক্ষণাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে সামলে নিয়ে মল্লিকা বললো, খুকু দাঁড়া, শোন্।

বল্লরী থমকে দাঁড়ালো একটু পাশ ফিরে, যাতে বাদলের সঙ্গে চোখাচোখি না হয়। মল্লিকা অপ্রস্তুত অবস্থাটা সামলে নেবার চেষ্টা করছে।

সেই একই রকম, অথচ এক নয়। সেদিন মল্লিকা এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে, আর বল্লরী ছিল তার পাশে। কিন্তু আজ বাদল সে রকম লজ্জিত, মর্মাহত বা অপ্রস্তুত বোধ করলো না। বরং রসিকতার মতন মুখ করে তাকিয়ে রইলো, যদি বল্লরীর চোখে চোখ পড়ে।

বল্লরী লজ্জিত নম্রস্বরে বললো, আজ আমার ফিরতে একটু দেরী হবে।

মল্লিকা জিজ্ঞেস করলো, কেন, কোথায় যাবি?

এক মুহূর্তের জন্য যেন মনে হলো আগেকার সেই সম্পর্ক ফিরে এসেছে। বল্লরী

বহুদিন পর নিজের গতিবিধির কথা জানাতে এসেছে দিদিকে। তার স্বরের মধ্যে মিশে আছে খানিকটা অনুমতি প্রার্থনা। আর মল্লিকা সন্দেহ উৎকণ্ঠায় তাকে প্রশ্ন করছে, কেন? কোথায় যাবি?

কিন্তু এক মুহূর্তই। পরক্ষণেই বল্লরীর গলার আওয়াজ অবধি রুক্ষ হয়ে গেল, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে ফিরে এলো তেজী ভাব—বললো, আমি হয়তো বেশী দেরী হলে আর নাও ফিরতে পারি। দরজা খোলা রাখার দরকার নেই।

—কেন, দেরী হবে কেন? থাকবি কোথায়?

—থেকে যাবো কোনো বন্ধুর সঙ্গে—ঝর্ণা কিংবা স্বপ্নার বাড়িতে।

—দেরী হবে কেন?

—আমার কাজ আছে।

—কিসের কাজ, এত রাত পর্যন্ত—

—শুনতে যখন চাইছো, তখন বলছি। আমি আর একটা ছবিতে গানের কণ্ট্রাক্ট পেয়েছি—আজ রাত্তিরেই আমাকে তিনটে গান তুলতে হবে। কাল দুপুরেই ছবির নায়িকা লিপ্ মেলাবে।

মল্লিকা রাগলো না, বিস্ময় দেখালো না, বরং খুব শান্ত হয়ে এলো। খানিকটা মিনতির মতনই বললো, খুকু, আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে চল্ না।

—তুমি? তুমি গিয়ে কি করবে?

—আমি তো কখনো সিনেমার ওসব ব্যাপার-ট্যাপার দেখিনি। আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

—আজ তোমার দেখার কিছু নেই। আজ শুধু গানের ব্যাপার—তোমার ভালো লাগবে না।

—হ্যাঁ, ভালো লাগবে। চল্ না!

—না, তোমাকে যেতে হবে না।

আবহাওয়া হাল্কা করার জন্য বাদল একটু বেশী ছেলেমানুষীর ভাব দেখিয়ে বললো, বল্লরী, আমাদের নিয়ে চলো না। অনেক সিনেমার নায়ক-নায়িকা আসবে নিশ্চয়ই! ওদের তো কখনো সামনে থেকে দেখিনি—

বল্লরী বাদলের দিকে তাকালো না। শুধু উত্তরটা ছুঁড়ে দিল, না, গানের রিহার্সালে নায়ক-নায়িকারা আসে না!

মল্লিকা আবার জিজ্ঞেস করলো, কত রাত পর্যন্ত রিহার্সাল চলবে তোদের?

—দরকার হলে সারারাত!

আর কথা বাড়ালো না বল্লরী, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে

শোনা গেল তার জুতোর আওয়াজ। মল্লিকা বাদলের দিকে ফিরে ভাঙা গলায় বললো, ছি, ছি, তুমি কি যে করো না। খুকু কি ভাবল বল তো?

বাদল ব্যাপারটা গায় মাখলো না। সকৌতুকে বললো, তুমি বল্লরীর সঙ্গে যেতে চাইছিলে কেন?

—এমনি, আমার ইচ্ছে।

—তুমি কি ভাবছিলে, তুমি ওর সঙ্গে সঙ্গে থেকে ওকে পাহারা দেবে? ওটা একদম ভুল। ওভাবে কিছুই আটকানো যায় না।

॥ তেরো ॥

খেয়ে উঠে নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল বাদল। পাশের বস্তিতে আজও একটা ঝগড়া লেগেছে। সেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রিটাই আজও এই ঝগড়ার নায়ক, তবে নায়িকা বদলে গেছে।

বাদল ওদের ঝগড়ার দৃশ্য দেখছিল, হঠাৎ ওর মনে হলো, কি একটা দারুণ কাজ যেন ভুল হয়ে গেছে তার। কি কাজ কিছুতেই মনে করতে পারলো না। অফিসের কিছু না, মল্লিকাদের বাড়িরও কিছু না, তবে কি? দারুণ অস্বস্তিতে বাদল ছটফট করতে লাগল। এ রকম তো তার কখনো হয় না, সাধারণত সমস্ত কাজই সুশৃঙ্খল ভাবে করা তার স্বভাব—কিন্তু আজ এ রকম হচ্ছে কেন?

বস্তির ঝগড়ার দৃশ্য দেখতে ভালো লাগলো না, শুয়ে পড়তে ভালো লাগলো না। সিগারেট খাওয়ার কথা মনে পড়লো না। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সে প্রাণপণে ভাবার চেষ্টা করলো, কোন মারাত্মক দরকারি কাজটা সে আজ ভুলে গেছে!

প্রায় মিনিট দশেক এই রকম ব্যাকুলভাবে পায়চারি করার পর, হঠাৎ তার মনে পড়লো, বল্লরী আজ রাত্রে বাড়ি ফিরবে না শুনেও সে একবারও জিজ্ঞেস করেনি, বল্লরী ঠিক কোথায় যাচ্ছে। গানের রিহার্সালের ব্যাপার, কিন্তু কোথায়? রাত দুটো পর্যন্ত গানের রিহার্সাল হওয়া সম্ভব কলকাতা শহরে?

সেই অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে বাদলের হঠাৎ মনে হলো, বল্লরী আজ সন্ধ্যায় কোথায় গেছে, এটা জানতে না পারলে তার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মানুষ যে রকম অন্ধকারের মধ্যে পা ঘষে ঘষে হাঁটে, সেই রকম ভাবেই তাকে বাঁচতে হবে। আজ এখন এই মুহূর্তে বল্লরী কোথায় আছে, তা তার একান্ত জানা দরকার।

বাদল তরতর করে নিচে বৈঠকখানায় নেমে এলো। টেলিফোন গাইডটা ওখানেই থাকে। গৌতম রায়ের কথাই মনে পড়ছে তার—বল্লরী গানের জন্য নতুন কোনো

কন্ট্রাক্ট পেলে সেটা গৌতম রায়ের সূত্রেই আসা স্বাভাবিক। গৌতম রায়ের ওপর তার কোনো রাগ নেই—ট্রেনে আলাপ হবার পর তার মনে হয়েছিল, গৌতম রায় বল্লরীর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।

জি. রায় দিয়ে অনেক নাম, শুধু গৌতম রায় দুজন। একজনের ঠিকানা গরচা রোড, একজনের টালিগঞ্জ। গরচা হওয়াই সম্ভব, কেননা তাদের অফিসের প্রেমনাথবাবু বলেছিলেন গৌতম রায় তাঁর পাড়ার লোক। সেই নম্বরে ফোন করতে ফোন বেজেই চললো, কেউ ধরলো না। দ্বিতীয় জায়গায় নম্বর ঘারানোর পর একজন মহিলা বললেন, গৌতম রায় তো এখন কলকাতায় নেই। বহুদিন এখানে থাকেন না। আপনি কে?

তা হলে এর পরের কর্তব্য? বাদল এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে এক্ষুনি বল্লরী কোথায় আছে, সেটা জানা ছাড়া তার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্যই নেই। একটুক্ষণের মধ্যেই মনস্থির করে, বাদল ওপরে গিয়ে জামা গলিয়ে আবার নেমে এলো, বেরিয়ে এলো রাস্তায়। একটা ট্যাক্সি ধরে চলল গরচার ঠিকানায় গৌতম রায়ের বাড়ি।

রাত এগারোটা বাজে, সারা বাড়ি অন্ধকার। বাদল ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এমনও হতে পারে, গৌতম রায় বাড়িতেই আছে, ইচ্ছে করে ফোন ধরছে না। কিন্তু এ বাড়িতে গান রিহার্সালের তো কোনো চিহ্ন নেই? তা হলে কি স্টুডিওতে? টালিগঞ্জের গৌতম রায়ই কি তাহলে আসল? যে মহিলাটি কথা বললো, সে হয়তো মিথ্যে কথা বলেছে। ওটা বল্লরী গলা হতে যে পারে না তা নয়, টেলিফোনে অনেকেরই গলা বদলে যায়। সে তো বল্লরীর গলার আওয়াজ টেলিফোনে আগে কখনো শোনেনি। টালিগঞ্জের বাড়িটা একবার দেখতে হবে।

আবার ট্যাক্সিতে উঠে একটু দূর যাবার পর বাদলের মনে হলো, একি পাগলামি করছে সে! এত রাতে ট্যাক্সি নিয়ে ছোটাছুটি করে বল্লরীকে খুঁজছে কেন? বল্লরী যেখানেই থাকুক না, তাতে তার কি আসে যায়? সে নিজেই তো মল্লিকাকে বুঝিয়েছে যে, বল্লরীর যথেষ্ট বুদ্ধি আছে নিজের ভালো মন্দ সে ঠিক বুঝতে পারে! তা ছাড়া, বল্লরী যদি বাড়ির বাইরে থাকতে চায়, বাদল তাকে কি করে আটকাবে?

তবুও বাদল ফিরতে পারলো না, বল্লরী কোথায় আছে, এটা তাকে জানতেই হবে! অনবরত তার মনে হচ্ছে, আজ রাতেই একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাবে। বল্লরী, এই বল্লরীকে সে কত ছোট দেখেছিল, একটা সরল প্রাণবন্ত মেয়ে—তার সেই সরল সৌন্দর্য বাদল কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারবে না।

সেই মুহূর্তেই বাদলের মনে পড়লো ল্যান্সডাউন রোডের সেই ফাঁকা বাড়িটার কথা, যেখানে সে প্রথম বল্লরীকে পৌঁছে দিয়েছিল। বাদল ঠিক করলো, টালিগঞ্জ যাবার আগে সে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িটাও ঘুরে যাবে। একথা তার একবারও

মনে পড়লো না যে, হয়তো গানের রিহার্সাল এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, বল্লরী তার বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজের বিছানায় ঘুমোচ্ছে। বাদল শুধু শুধু বোকার মতন এতদূর ঘুরছে? এ কথা তার মনে পড়লো না, কারণ, বল্লরী এখন কোথায় আছে, এটা যেন তার জীবন মরণের প্রশ্ন।

ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে আলো জ্বলছে। সদর দরজাও খোলা। বাদল কারুকে ডাকলো না, কারুর অনুমতি নিল না, বল্লরী সেখানে আছে কিনা সে কথাও জানার চেষ্টা করলো না, ঘোরলাগা মানুষের মতন বাদল সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো।

সেই প্রথম দিন বল্লরীকে এ বাড়িতে পৌঁছে দেবার সময় বাদল সামনের পার্কে বসে যখন অপেক্ষা করছিল, তখন মনে মনে কতকগুলো দৃশ্য কল্পনা করেছিল। আজ প্রায় অবিকল সেই দৃশ্যই দেখতে পেল চোখের সামনে। বাড়িটার একতলায় কতকগুলো দোকান, দোতলাতেও স্থায়ী কোনো বাসিন্দা নেই। সম্ভবত দোতলায় কোনো নাচ-গানের ইস্কুল বসে। এত রাত্রেও এখানে লোক আছে!

সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথম ঘরখানার দরজা খোলা, তিনটি মেয়ে ও সাত আটজন পুরুষ সেখানে, কোঁচাকানো সতরঞ্জির ওপর হার্মোনিয়াম, মেঝেতে গড়াচ্ছে কটা সোডার বোতল, ওদের প্রত্যেকের হাতে রঙিন গ্লাস। ওখানে বল্লরী নেই, ওদের কারুকে চেনে না বাদল।

বারান্দা দিয়ে চলে এলো পাশের ঘরে দিকে, সে ঘরের দরজার একটা পাল্লা ভেজানো, ভেতরে একটা মেয়ের গলা শোনা গেল, আপনার তো কোনো কথাই মনে থাকে না। কতবার তো বললেন...স্পষ্ট চেনা যায়, বল্লরীর কণ্ঠস্বর।

বাদল দরজার বাইরে থমকে দাঁড়ালো। দু'এক মুহূর্তের জন্য তার ঘোর কেটে গেল। বিষণ্ণভাবে ভাবলো, আমি এখানে বোকার মতন কেন ছুটে এসেছি? বল্লরীকে ফেরানোর কোনো সাধ্য নেই আমার। তাছাড়া যাচ্ছিই বা কেন, বল্লরী তো নিজের ব্যাপার নিজেই ভালো বোঝে। আমি তার কে? পরক্ষণেই বাদল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উঠলো, না, না, আমার উপায় নেই, বল্লরী শুনুক বা না শুনুক, আমাকে যেতেই হবে।

ভেতর থেকে একটি পুরুষের জড়িত গলা শোনা গেল—না, না, মাইরি বলছি, দ্যাখো না এবার কি করি। যে বইতে আমি কাণ্ট্রক্ট পাবো, সেই বইতেই যদি তোমায় না নেয়—কাননদেবীর পর তুমিই হবে প্রথম একসঙ্গে গায়িকা আর নায়িকা—

বাদল 'সাবধান' বললো না, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেললো। গৌতম রায় বল্লরীকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতন তার বুকে মুখ ঘষছে। বাদল ডাকলো, বল্লরী!

গৌতম রায় আলিঙ্গন ছাড়ালো না, বললো, কে রে, এ ঘরে এখন আসতে বারণ

করেছি না!

বাদল আবার ডাকলো, বল্লরী!

বাদলের গলার আওয়াজে ক্রোধ নেই, শূন্য হাহাকারের মতন। বল্লরী বাদলকে প্রথমেই দেখেছে, তবু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেনি—চমকায়নি পর্যন্ত। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

—আঃ! কেন জ্বালাচ্ছিস? বারণ করেছি না এখানে আসতে? ওর সঙ্গে প্রাইভেট টক করছি এখানে।

গৌতম রায় চিনতে পারেনি বাদলকে। কাশী থেকে ফেরার সময় ট্রেনে গৌতম রায়ের মুখে যে এক ধরনের কাতর সততা দেখেছিল বাদল, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই, বরং অত্যন্ত লোলুপ কুটিল ছায়া। অতিরিক্ত নেশায় চোখ দুটো টক্‌টকে লাল, মাথার চুলগুলো খাড়া—এই অবস্থায় মানুষ অমানুষ হয়ে যায়।

গৌতম রায় ফিরে তাকিয়ে বললো, আরে, এ মক্কেল আবার কে? যাও ভাই যাও, এখানে চাকরি খালি নেই।

বাদল বললো, বল্লরী, চলে এসো—

বল্লরী মৃদু স্বরে বললো, আপনি এখানে এসেছেন কেন?

গৌতম রায় বললো, আবার ওর সঙ্গে কথা? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

বল্লরী বললো, আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?

—কেউ পাঠায়নি! আমি নিজে এসেছি! বল্লরী, একি করছো তুমি? এসব তোমায় মানায় না।

—তা নিয়ে আপনি এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?

গৌতম রায় বললো, মাথা থাকলে তো মাথা ঘামাবে? বল্লরী, এই উটকো মানিকটা কে? আর একজন ব্যর্থ প্রেমিক? দিচ্ছি শালাকে বার করে—

গৌতম রায় বাদলের গায়ে হাত ছোঁয়াতেই বাদল দপ্ করে জ্বলে উঠলো। জীবনে কোনোদিন সে কারুর সঙ্গে মারামারি করেনি, কিন্তু আজ প্রচণ্ড শক্তিতে একটা ঘুষি মারলো গৌতম রায়ের নাকে। পায়ে জোর ছিল না লোকটার, ঐ এক আঘাতেই ঘুরে পড়লো মাটিতে। তারপরেও বাদল তার থুতনিতে মারলো একটা লাথি। তারপর বল্লরীর ডাত হাত দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে বললো, চলো—

—না ছাড়ুন, আপনার সঙ্গে কেন যাবো?

—এখানে তুমি কি করছো? তোমাকে যেতে হবে—

বল্লরী হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, পারলো না। চোখ ধারালো করে বললো, আপনি ছাড়বেন না, পাশের ঘর থেকে লোক ডাকবো।

—বল্লরী, তুমি আমার কথা শুনবে না?

—না।

—এই সব বিশ্রী ব্যাপার তোমার ভালো লাগে কি করে? আমি ভাবতেই পারি না।

—ভাবতে পারেন না? আপনার জন্যই তো আজ আমি এখানে এসেছি।

—আমার জন্য? আমার জন্য?

—নিশ্চয়ই। হাত ছাড়ুন। বাদলদা, আপনি ভেবেছেন কি? আমার যা খুশী আমি তাই করবো। আমি তো আপনার আর দিদির ব্যাপারে মাথা গলাতে চাই না। আপনি কেন এখানে এসেছেন?

—কেন এসেছি, তা জানি না। কিন্তু অন্য কেউ তোমার গায়ে হাত দিচ্ছে, একথা ভাবলেই আমার মাথার গরম হয়ে ওঠে।

—ইস্। লজ্জা করে না আপনার একথা বলতে?

—না। বল্লরী, আমি তোমাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না।

—আপনি কি এখানে নাটক করতে এসেছেন? ছেড়ে দিন আমাকে! আমি আপনার আর দিদির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না।

—বল্লরী, তুমি কি তোমার দিদিকে আর একটুও ভালোবাসো না?

—ভালোবাসি বলেই দিদির কাছ থেকে আমি দূরে থাকতে চাই—

—তার মানে?

—তার মানে আপনি বুঝবেন না। কিংবা বুঝেও বুঝতে চাইবেন না। আমি বুঝি একটা মানুষ নই? আমার বুঝি কোনো রকম নিজস্ব ভালো-লাগা মন্দ-লাগা নেই? আমার মন বলে কিছু নেই! আপনি আমাকে—

—বল্লরী, আমি ক্ষমা চাইছি।

—আপনি ছাড়বেন কিনা? না হলে আমি পাশের ঘর থেকে লোক ডাকবো। আপনাকে ক্ষমা করবো না কোনোদিন।

—তুমি সত্যিই লোক ডেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবে?

প্রায় এক মিনিট দুজনে চোখাচোখি করে রইলো। বাদলের ভরসা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। মনে পড়লো, যেদিন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের নিচে বল্লরীর সঙ্গে তার ঠিক এরকম চোখাচোখি হয়েছিল, সেদিন বল্লরীর চোখে ছিল প্রতীক্ষা, কিন্তু সেদিন বাদল সাড়া দেয়নি।

বল্লরী পাগলাটে অস্বাভাবিক গলায় বললো, হ্যাঁ, আপনি হাত না ছাড়লে তাই ডাকবো। আপনি আমাকে ছোঁবেন না।

—বল্লরী, আর একবার আমার দিকে তাকাও। দ্যাখো, সত্যি তোমার জন্য—

বাদলের কথা শেষ হলো না। বল্লরী চেঁচিয়ে ডাকলো, হেমেনদা, দ্বিজেনবাবু। পাশের ঘর থেকে সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়ালো দরজার কাছে। গৌতম রায় আড়মোড়া ভেঙে বললো, এঃ, একেবারে রক্ত বার করে দিয়েছে! দিলে নেশাটা নষ্ট করে।

দরজার কাছ থেকে একজন বললো, কি হয়েছে? কি ব্যাপার? মিস সরকার, কি হলো কি? ইনি কে?

লজ্জায় অপমানে বাদলের শরীরটা আড়ষ্ট। একবার তার মনে হলো, এই লোকগুলো যদি তাকে মারধোর করা শুরু করে, তা হলেও কি বল্লরী লোকগুলোকে বারণ করবে না? তা যদি হয়, তাহলে মারুক ওরা।

দু'তিনজন ঘরের মধ্যে ঢুকে গৌতম রায়কে দেখলো। খুব বেশি অবাক হলো না। মাতাল অবস্থায় গৌতম রায়কে এরকম পড়ে থাকতে তো প্রায়ই দ্যাখে। একজন বল্লরীকে জিজ্ঞেস করলো, এই লোকটি কে? আপনার চেনা? বল্লরী নিষ্ঠুরের মতন বললো, না, আমি চিনি না!

বাদল বল্লরীর দিকে তাকিয়ে আছে, বল্লরীও চোখ সরিয়ে নেয়নি।

একজন লোক বাদলকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? আপনার এখানে কি চাই?

বাদল মুখ নীচু করে বললো, কিছু না, আমি চলে যাচ্ছি।

বাদল দরজার দিকে এগিয়ে এলো, কেউ তাকে বাধা দিল না। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ও তাড়া করে এলো না কেউ। বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে দেখলো বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বৃষ্টির মধ্যে আচ্ছন্নের মতন বাদল হাঁটতে লাগলো।

॥ চোদ্দ ॥

ভাস্কর বললো, তোকে একশো টাকা চাঁদা দিতে হবে!

সারারাত ঘুম হয়নি বাদলের, চোখ করকর করছে। উদাসীন ভাবে বললো, কিসের চাঁদা? এই সকাল বেলাতেই এসেছিস।

—জলপাইগুড়িতে ফ্লাড রিলিফে যাচ্ছি। একশো টাকার কম নেবো না কিন্তু।

—তোর মাথার ঘা তো এখনো ভালো করে শুকোয়নি।

—এর থেকে আর বেশি শুকোবে না। এখন একটা কিছু কাজ করতে না পারলে আমার মনটা ঠিক হচ্ছে না। তোদের বাড়িতে পুরনো কম্বল-টম্বল আছে?

—খুঁজে দেখছি। মণিকা কেমন আছে? সেও তোর সঙ্গে যাচ্ছে নাকি?

—মণিকা? ওঃ হো, তুই বুঝি, কোনো খবর রাখিস না? রাখবি কি করে, অনেকদিন তো যাস্ না আমার বাড়িতে।

ভাস্করের মুখে একই সঙ্গে এমন বিষাদ ও কৌতুক খেলা করে গেল যে বাদল রীতিমতন শিউরে উঠলো। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, কেন, কি হয়েছে কী?

—কিছু হয়নি, ভালোই হয়েছে। ও বাপের বাড়ি চলে গেছে, আমার নামে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা এনেছে।

—মণিকা? বলিস কি? কেন?

বাদল সেই মুহূর্তে নিজের সমস্যা ভুলে গেল। এ রকম অপ্রত্যাশিত খবর তার দূর কল্পনাতেও ছিল না। আত্মতৃপ্ত ধরনের মেয়ে মণিকা, পৃথিবীতে থেকে নিজের দাবি আদায় করে নিতে জানে—সে এরকম করবে কেন?

ভাস্কর বললো, কেন আর। মেয়েদের সেই পুরনো রোগ। মণিকার ধারণা তার স্বামী দুশ্চরিত্র। আমি নার্সের সঙ্গে প্রেম করেছি, আরও নানা মেয়ের ব্যাপারে ওর সন্দেহ।

মণিকার এ ধরনের অভিযোগের ইঙ্গিত বাদল শুনেছে একবার। সে আর কিছু বললো না, চুপ করে রইলো।

ভাস্কর আবার বললো, আসল ব্যাপার তা নয়। আসল হচ্ছে, মণিকা আমাকে অবলম্বন করে সুখী হতে চেয়েছিল। ওর সুখের আইডিয়াটাই আলাদা। ও ভেবেছিল, আমি আর পাঁচটা লোকের মতন দিনরাত শুধু চেষ্টা করবো, কি করে আরও বেশি টাকা রোজগার করা যায়। ক্রমশঃ আমাদের জিনিসপত্র বাড়বে, সম্পদ বাড়বে—সমাজের আর সব লোকের চেয়ে আমরা উঁচুতে উঠবো। কিন্তু আমার উঁচুতে উঠতে ইচ্ছে করে না রে। ক্রমশঃ আমার ইচ্ছে আরও নিচে যাওয়ার—যে-দেশের কোটি কোটি লোক খেতে পায় না, সেখানে আমার—এইসব ব্যাপার নিয়ে মন কষাকষি, তার মধ্যে আবার মণিকা একদিন আমাকে এক নার্সের সঙ্গে দেখে ফেললো—

—তুই সত্যি!

—হ্যাঁ ভাই! কিন্তু এর মধ্যে আমি দোষের তো কিছু দেখি না! একটা নার্স আসতো আমার ব্যান্ডেজ খুলে ওয়াশ করতে—বেশ ভালো মেয়েটি, যেমন কাজটা ভালো জানে, তেমন স্পোর্টিং—ক্রমে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল! বেশির ভাগ মানুষই, জানিস তো শিয়রের কাছে রোজ যদি বেশ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী নার্সকে দেখে—তাহলে কখনো কখনো ইচ্ছে হয় নার্সটির কোমর জড়িয়ে ধরতে কিংবা বুকে হাত দিতে—তবে বেশির ভাগ মানুষই ইচ্ছেটা মনে মনে পুষে রাখে, কাজে কিছু করে না—আমি হাত বাড়িয়েছিলাম।

—ভাস্কর, তুই ব্যাপারটা এত হালকাভাবে বলছিস কি করে?

—হালকা ছাড়া কি? এ জন্য আমি মণিকার কাছে অনেক ক্ষমা-টমা চাইলাম।

শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম, এটাই মণিকার রাগের আসল কারণ নয়। এই রকম সামান্য শারীরিক বিচ্যুতিকে মেয়েরা খুব বেশি গুরুত্ব দেয় না— মেয়েদের সতীত্বের ধারণাটা যেমন পুরুষদেরই তৈরি করা—মেয়েদের কাছে আসল হচ্ছে তাদের নিজস্ব সুখের ধারণা। সেই ধারণাটাই যদি না মেলে তাহলেই সব গণ্ডগোল।

—ভাস্কর তুই এখন কি করবি?

—মণিকাকে মামলায় জিতিয়ে দেবো। আমার এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। আমার হাতে এখন অনেক কাজ!

—ভাস্কর, আমি নিজেও দারুণ সমস্যায় পড়েছি। মল্লিকার সঙ্গে আমার সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির শেষ হয়েছিল—কিন্তু কাল রাত্রে আমি বল্লরীর কাছে—তুই বল্লরীকে চিনিস না, মল্লিকার ছোট বোন।

—কি হয়েছে ব্যাপারটা খুলে বল্!

যে-কথা বাদল আর কখনো কারুকে বলেনি, আজ সেটা গোড়া থেকে ভাস্করকে বললো। কিছু গোপন করলো না। কাপে চা চাণ্ডা-জল হয়ে গেল, সিগারেট পুড়তে লাগলো অ্যাসট্রেতে।

সব শুনে ভাস্করর গম্ভীরভাবে বললো, হুঁ! ব্যাপারটা তোর পক্ষে বেশ ঘোরালো। তোর পক্ষে বলছি এই জন্য যে, তুই আর আমি দুজনে দু'টাইপের মানুষ। আমি এ ধরনের হৃদয়ঘটিত ব্যাপারকে হালকা করে দেখতেই ভালেবাসি। আর তুই এর কোনো সমাধান করতে না পারলে সারাজীবন কষ্ট পাবি! তবে একটা কথা আগেই স্বীকার করি, বল্লরী মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ। যা শুনলুম, এই ধরনের মেয়েদের শ্রদ্ধা করা উচিত।

—কেন? কি জন্য বলছিস?

—ঐটুকু মেয়ের কতটা বিচারশক্তি। ও ঠিকই বুঝেছে যে, ওর সম্পর্কে তোর তীব্র দুর্বলতা আছে, কিন্তু তুই সেটা চাপা দিতে চাস। এবং সেটাই দরকার বলে— ও তোকে অপমান করে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। অবশ্য তোর প্রতিও ওর একটা অভিমান আছে, সেটা যাক্! আমার তো মনে হয়, ওর পক্ষে ফিলিম্-টিলিম্ই ঠিক লাইন।

কিন্তু ফিল্ম লাইনে!

—ন্যাকা সাজিস না। শুধু ফিল্ম লাইনে অসভ্যতা হয়, আর কোথাও হয় না? যাক্ গে, তোর ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। মল্লিকা মেয়েটি আদর্শ মেয়ে— ওই হচ্ছে তোর টাইপ—তোর সঙ্গে ওকেই মানাবে। ওর সঙ্গে যে ঐ বাচ্চা ছেলেটার, কি নাম যেন, অভিজিৎ, মাঝখানে একটা ব্যাপার হয়েছিল তার ফলে—

—ও কথা বলতে হবে না। অভিজিতের ব্যাপার আমার মনে একটু দাগ কাটেনি। মল্লিকা যা করেছিল, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—

—তা হলে তুই কেন ভাবছিস, তোর সঙ্গে বল্লরীর ব্যাপারটাও ওর কাছে স্বাভাবিক মনে হবে না? একটা কথা বলছি মন দিয়ে শুনে বিচার করে দ্যাখ্। খোঁজ নিলে দেখবি, প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এরকম ছোটখাটো দুর্বলতা কিংবা গোপন ঘটনা আছে। তাতে সমাজ সংসার ভেঙে পড়ে না। এ ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে নিলেই জীবনটা সুস্থ থাকতে পারে। শরীরের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল, ও নিয়ে বেশি না ঘাঁটানোই ভালো।

—আমাকে তা হলে এখন কি করতে বলিস?

—আমি তোকে অনেকদিন আগেই সে কথা বলেছি। একটা কোনো কাজে ভালো করে ডুবে থাকতে পারলেই—এসব ব্যাপার অনেক হালকা মনে হবে। তুইও আমার সঙ্গে জলপাইগুড়ি চল্ না। আমরা ময়নাগুলির কাছে রিলিফের ক্যাম্প বসিয়েছি। অনেক লোক দরকার—তুই চলে আয়। হাজার হাজার মানুষ সেখানে অসহায় হয়ে পড়েছে, কত লোকের সব কিছু ভেসে গেছে—সেখানে তুই যদি নিজেকে কোনো কাজে লাগাতে পারিস, তোর নিজেরই ভালো লাগবে।

বাদল দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বললো, আমি কি কোনো কাজ করতে পারবো? আগে তো কখনো এসব কিছু করিনি!

ভাস্কর প্রায় ধমকে ওঠার মতন করে বললো, নিশ্চয়ই পারবি! ওখানে প্রাণ বাঁচাবার জন্য কত বুড়ো-বুড়ি পর্যন্ত গাছে উঠে পড়েছিল, তারা কি আগে কখনো গাছে উঠেছে? সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ালে...

হঠাৎ মনস্থিত করে বাদল বললো, ঠিক আছে আমি যাবো। কবে যেতে হবে?

—আজ রাত্তিরে।

—আজই?

—হ্যাঁ। কেন, পারবি না? কাল সকালেও প্লেন যাবো।

—তুই যখন যাবি, তোর সঙ্গেই যাবো। কাল রাত্তিরে বল্লরীর সঙ্গে ওরকম ভাবে দেখা হওয়ার পর আমি আর মল্লিকার কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। আমার পক্ষে পালিয়ে যাওয়াই ভালো।

—ধ্যাৎ শালা, পালিয়ে যাবি কেন? যাচ্ছিস মানুষের উপকার করতে—সেটা পালিয়ে যাওয়া? মুখ দেখাতে পারবি না কেন মল্লিকাকে? কি হয়েছে কী? ওকেও নিয়ে চল্?

—মল্লিকাকে?

—হ্যাঁ। যদি এমনি যাওয়াটা দৃষ্টিকটু লাগে, আজই রেজেস্ট্রি বিয়ে করে ফ্যাল দুজনে।

—বিয়ে? কি আবোল-তাবোল বকছিস্।

—ঠিকই বলছি। আসলে তো মল্লিকার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়ে গেছে ছ'বছর আগেই, শুধু নাম সই করাটা বাকি। আমার সঙ্গে একজন রেজিস্ট্রারের চেনা আছে—নোটিশ-ফোটিশ লাগবে না, আজ দুপুরেই হয়ে যাবে।

বাদল বিমর্ষভাবে বললো, মল্লিকাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে। তাহলে ওকে ঠকানো হবে। আমি বল্লরীর কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। যখনই মনে হয়, বল্লরী অন্য কোথাও নষ্ট হয়ে যাচে—

—বল্লরীকে ভুলতে হবে কেন? মানুষ কখনো মানুষকে ভোলে? তাও ওরকম একটি সুন্দরী মেয়ে! দেখিস দু'এক বছর বাদে সব সহজ হবে যাবে। বল্লরী মেয়েটি যদি সত্যিই বুদ্ধিমতী হয়, তাহলে সে নষ্ট হবে না। ঠিক বেরিয়ে আসবে। এর সঙ্গে মল্লিকাকে বিয়ে না করার কোশ্চেন আসছে কি করে?

—মল্লিকা কি আমাকে ভালোবাসতে পারবে?

—ইডিয়েট, আজও বুঝতে পারলি না, মল্লিকাকে বিয়ে করাই তোর নিয়তি! মল্লিকাও তোকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না। আমি যাচাই করে দেখেছি! বুঝলি, আমি যাচাই করে দেখেছি। আর ছোট বোনের ব্যাপারে একটু-আধটু দুর্বলতা দেখলেও মেয়েরা কিছু মনে করে না! আজই আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। লোকে তো বিয়ের পর হনিমুন যায়—তোরা চল্ জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়িতে আরও কেন যেতে বলছি, জানিস? যখন দেখবি বন্যায় সব গ্রাম ভেসে গেছে, কারুর ছেলে কারুর মা—হাজার হাজার মানুষ ইস্কুল বাড়ি আর কাছারিতে এসে ভিড় করে আছে—সর্বস্বান্ত হয়েও পাগলের মতন একজন আর একজনকে খুঁজছে—তখন বুঝতে পারবি, সত্যিকারের দুঃখ-কষ্টের চেহারাটা কি রকম। তার তুলনায় বুঝতে পারবি, আমাদের শহরের লোকদের হৃদয়ঘটিত দুঃখটুঃখগুলো কত শৌখিন, কত খেলো।—যখন দেখবি একটা প্রচণ্ড নদী কি ভাবে মানুষের জীবন ভাঙতে পারে—এরকম নদীর পারে যারা থাকে তারা কত অসহায়।

—ভাস্কর, আমি বুঝতে পেরেছি—

—চল্—

—ভাস্কর তক্ষুনি বাদলকে টেনে নিয়ে বেরুলো। চলে এলো মল্লিকাদের বাড়ি।

ভাস্করের জোর-জবরদস্তিতেই, সেদিন দুপুরেই ধর্মতলার রেজেস্ট্রি অফিসে ওদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। প্যান্ট-কোট পরা রেজিস্ট্রার অনুষ্ঠান শেষ করে হাসিমুখে

বললেন, আপনাদের জীবন মঙ্গলময় হোক।

ভাস্করের এক বন্ধু বললো, সেই হৃদয় বদলা-বদলির সংস্কৃত শ্লোকটা কি যেন? সেটাও একবার বললে হতো।

ভাস্কর বললো, পাত্র-পাত্রীর অনেক দিন থেকে চেনা, হৃদয় বদলা-বদলি আগেই হয়ে গেছে।

মল্লিকা আরক্তিম মুখে হাসলো।

বাদলের এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়লো, সেই অনেকদিন আগে রূপনারায়ণ নদীর পারে লুকোচুরির খেলার দৃশ্য। তার মনে হলো, প্রবল অন্ধকারের মধ্যে সে মল্লিকাকে এবার খুজে পেয়েছে।